সাহিত্যে সমাজবাস্তববাদ

নগেন দত্ত

পরিবেশক ঃ শিক্ষাভারতী
৯।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয় কুমার দত্ত
লোকায়ণ সাহিত্য, সি. আই. টি.
বিল্ডিংস্, বেলেঘাটা, কলিকাতা-১০

প্রথম প্রকাশ
১৩৬৬

মুদ্রাকর :
শ্রীপরেশনাথ গোস্বামী
শ্রী আর্ট প্রেস
৫/১ রমানাথ মজুমদার
কলিকাতা-৯

লেখকের অন্যান্য বই

সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক নীতি, আমরা আবার বাঁচব, (উপন্যাস) অচেনা আকাশ, ইতিহাস ও সমবায় , কুমড়োপটাস্ ।

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়

শ্রীমাধব চরণ সেন

প্রণত

নগেন

প্রাক-কথন

'কল্লোল', 'কালিকলম' ও ঢাকার 'প্রগতি' সমসাময়িক সমাজ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে একদিন জন্ম নিয়েছিল। যে বিদ্রোহ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছিল তাকে, বিশেষ করে সমগ্র সমাজ-রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি হিসেবেই বিচার করা সমীচীন হবে। কেননা স্বাধিকারবোধের যে সাধনা তা মুখ্যত বিরাট ও ব্যাপক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। সাহিত্য তার ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা দেয়। কাজেই কোন অবস্থাতেই সাহিত্য, বিশেষকরে কথাসাহিত্য কোন আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে আন্দোলনের অনুগামী হয়ে চলে বা অব্যবহিত পরে সামাজিক মানুষের নতুন প্রতিভূ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কেননা আন্দোলন সাধারণ মানুষের চরিত্রের নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে, নতুন অর্থনৈতিক জীবনের স্পন্দন আনে—ফলে আশা-আকাঙ্ক্ষার নব ও বিচিত্র রূপ দেখা দেয়। যে মানব মন বাহ্য পারিপার্শ্বিক ঘটনার আবর্তে অবিরাম

আবর্তিত হচ্ছে সেই মানব মনেরই ভাব যখন সমাজশ্রেণী-শীর্ষ স্পর্শ করছে তখনই চারিত্রিক রূপান্তর ঘটছে। সাহিত্যের সামগ্রিক বিচারের পক্ষে সমাজ-পারিপার্শ্বিকের মানসিক আবর্তনের বিশ্লেষণ অপরিহার্য। সাহিত্য হলো সামাজিক মানুষের জীবনের বিচিত্র প্রসারিত সমষ্টিগত মনোভাব। এখানে সমাজ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি—তার একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশের শাসনসংস্কার পাবার জন্য একটি শ্রেণী উন্মুখ হয়ে ওঠে। এবং সেই শ্রেণীটি যে একটি অর্থনৈতিক স্থিতিবান সমাজের প্রভাবশালী অংশ ছিল সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। আন্দোলন স্থগিত হবার পর দেখা গেল কতকগুলো ক্ষেত্রে শ্রেণী-উন্নম্র ঘটেছে, আর কতকগুলো ক্ষেত্রে ঘটেছে—অবনমন। এই জাতীয় শ্রেণী উত্থান-পতন ও সংগঠনের ফলে সামাজিক মানুষের মনের সমস্যার রূপও অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করার সময় এলো। যা একদিন স্বাভাবিক গতিতে বিলম্বিত কালের মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘটত, অর্থাৎ এই শ্রেণী-উন্নম্র ও অবনমন— ' আন্দোলনের মাধ্যমে দ্রুতগতিতে উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ কর৲ . বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের প্রসাদে সমাজের একটা অংশ বেশ পাকাপোক্ত হয়ে বসল। আগে জমিদার শ্রেণী আমলাতন্ত্রকে মামলা-মোকদ্দমার মারফৎ সহযোগিতা দিয়ে আসছিল, তারা এবারে জনস্বার্থের বিরোধী ভূমিকায় পুরোপুরি নেমে এলো। শ্রেণীসত্তা স্বচ্ছ পরিস্ফুট হয়ে উঠল। চৌধুরী মশাই (প্রমথ চৌধুরী) 'রায়তের কথা'য় বেশ স্পষ্ট করে লিখলেন জমিদাররা আমার আত্মীয় কুটুম্ব কাজেই তাঁদের স্বার্থের বিরুদ্ধে আমি কিছু বলতে পারিনে। তবে প্রজাদের কিছু সুযোগ-সুবিধা থাকা উচিত। একেবারে প্রজার ভিটেতে নিজে-জন্মানো ফলকর গাছটাও কাটতে পারবে না এটা

ঠিক নয়; এ অধিকারটা প্রজার থাকা উচিত। এই হলো সেকেলে মানবিকতার নিদর্শন।

সংস্কারপন্থী স্থিতিবান সমাজের ভূস্বত্ব উপভোগী মালিকেরা আর নব উদ্ভুত আমলাতন্ত্রের পরিপোষকেরা সবাই চাইত দেশে একটা স্থিতিবান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ফিরে আসুক, এবং যা পাওয়া গেছে তাই নিয়ে শাসনসংস্কারকে কাজে লাগানো যাক। যাঁরা বিপ্লবপন্থায় এদেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদকে হঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন স্বল্প। তাঁদের কর্মসাধনা জনসাধারণের গোচর ছিল না। তার অর্থ তৎকালীন বাঙ্গালার শিক্ষিতসম্প্রদায় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বৈপ্লবিক পন্থার উগ্রতা ঠিক পছন্দ করতেন না। কিন্তু তা বলে সবাই বৈপ্লবিক পন্থা সমর্থন করতেন না তাও ঠিক নয়। কেননা, এই আন্দোলনে মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তানসন্ততিরা যোগ দিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সমাজধর্মী-প্রভাবের পর শিক্ষিত সাধারণের (মুখ্যত হিন্দু শিক্ষিত সাধারণ) মধ্যে যে ভাব দেখা দিয়েছিল তারই পরিপোষক হিসেবে বিপ্লব আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। এই ভাবধারাকে এক প্রস্থ আত্মবিকাশের ধারা বলা যেতে পারে। জাতির আত্মবিকাশের ধারার অন্তরায় হল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ।

বাঙ্গালার বিপ্লবীরা আত্মবিকাশের এক বিশেষ ধারা বেছে নিয়েছিল। তাঁরা মুখ্যত ইতালীর গ্যারীবল্ডীর দেশপ্রেম ও আইরিশ বিদ্রোহ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তখনও এদেশে রুশ বিপ্লবের কোন প্রভাব সক্রিয়ভাবে দেখা দেয় নি। কেননা রুশ বিপ্লবের প্রকৃত প্রভাব এদেশে আসতে প্রায় সম্পূর্ণ একটি দশক লেগেছে। সাম্রাজ্যবাদী প্রচারের ফলে বিপ্লবের ভয়াবহতার দিকটাই প্রচারিত হয়েছিল। এমনকি সেকালের উচ্চ শিক্ষিত, চিন্তায় ও সাহিত্যে অগ্রসরমান প্রমথ চৌধুরী মশায়ও পাছে গরীব চাষীর কথা বললে

কেউ বলশেভিক বলে—এমন আতঙ্কের ভাব তার সৃষ্ট সাহিত্যে প্রকাশ করেছেন। রুশ বিপ্লবে জনগণের তথা বিশ্বের শোষিত মানুষের সমাজ-অর্থনৈতিক মুক্তির যে একটি অধ্যায় রচিত হয়েছে তা এদেশের তথাকথিত রাজনীতিকরা বড় একটা খোঁজ রাখতেন না। আর রাখলেও সে বিপ্লবের আলোকে নিজেদের কর্মপন্থা স্থির করতেন না। তাই এদেশে অসহযোগ আন্দোলন একটি বৈপ্লবিক আন্দোলন বলে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ইতিহাসের এইটাই হল পরিহাসজনক বক্রোক্তি। ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আদালত বর্জন, বিদেশী বস্ত্রের অগ্নি সংস্কার, স্কুল কলেজ বন্ধ, আর প্রত্যক্ষভাবে দেশী বণিকদের প্রেরণা যোগানো, এইটেই হল গান্ধী নেতৃত্বের বিপ্লব (?) আন্দোলন। আমরা সামগ্রিক ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই আন্দোলনের সামাজিক আলোড়নের দিকটা বিচার করব। প্রথমতঃ, ছুঁৎমার্গ পরিহার, মাদক দ্রব্য বর্জন, বিদেশী বর্জন। ছুঁৎমার্গ পরিহার আন্দোলনের ফলে সমাজের নিম্নশ্রেণী (?) খানিকটা মানবিকতার সম্মান পেল। দ্বিতীয়তঃ, মাদকদ্রব্য বর্জনের ফলে দেশে এক ধরনের নৈতিক সত্তা ফিরে এলো। যদিও ক্ষণস্থায়ী, তবুও মোটামুটিভাবে মাদকদ্রব্য ব্যবহার নিন্দনীয় বলে সমাজ মেনে নিল। তৃতীয়তঃ, এই সামাজিক আন্দোলনের পরিধি বৃদ্ধির পর যেটা সমাজের মধ্যে গভীরভাবে শিকড় গাড়ল, তাহলো অর্থনৈতিক জাতীয়তাবোধ। এর ফলে দেশীয় পুঁজির একটি নতুন চরিত্র বিকাশ পেল। দেশী পুঁজি আন্দোলনের আঁচল ধরে উঠে দাঁড়াল। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনই জাতীয় অর্থনীতির বুনিয়াদ সৃষ্টির আন্দোলন। বিদেশী পুঁজির এখানে খানিকটা হার হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি কোন-একটি বিশেষ ঔপনিবেশিক বাজারের ওপর সব সময় নির্ভরশীল থাকে না। বাজারের একচেটিয়া সুযোগ

থাকে ঠিক-ই, কিন্তু গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে জার্মানীর ঔপনিবেশিক বাজার, লীগ অব নেশনস থেকে পাওয়া ম্যানডেটেড এলাকা, ভারতীয় বাজারের ঘাটতি পূরণে সমর্থ হয়েছে। অথবা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সম্প্রসারণ ঘটেছে। গান্ধীজী যখন দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের সময় ইংল্যাণ্ড যান তখন ম্যানচেষ্টারের মিল মালিকরা কাপড়ের কলগুলির শোচনীয় দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দেখান; তখন অবিশ্যি তিনি বলেছিলেন—ভারতীয়দের অবস্থা এর চেয়েও শোচনীয়। কিন্তু তখনও যে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক আক্রমণ অন্যান্য উপনিবেশে হচ্ছে, তা কখনও ওঁরা বলেন নি। ভারতের বাজারে যে ব্রিটিশ পণ্য preferential treatment পক্ষপাত ব্যবহারও পেত তাও কেউ বলেন নি। যাক সে কথা। একান্ত নির্ভরশীল অর্থনীতি, জাতির অন্তরে দাস মনোভাব সৃষ্টি করে। সেই দাস মনোভাবের প্রতিনিধি হচ্ছে আমলাতন্ত্র, নব্য বণিকের দল ও জমিদার শ্রেণী—সাধারণ মানুষ এদের দ্বারা নিপীড়িত হয়। এই শোষিত শ্রেণী তখনও জঙ্গীভাবাপন্ন নয়, শুধু শ্রেণী সচেতন আন্দোলনই জঙ্গীভাব সৃষ্টিতে সহায়তা করতে পারে।

বাঘা ভুঁদে জমিদারীর এক রোখা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পর যে এক নতুন ধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সমাজে ফুটে ওঠে তার পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে যৌথ কারবারের মধ্য দিয়ে। ইতিপূর্বে জনসাধারণের কাছে কোম্পানীর শেয়ার বিক্রি করে যৌথপ্রথায় যে-সব দেশীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রথম পর্যায় হল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। দ্বিতীয় পর্যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। তৃতীয় পর্যায় অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন। বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক জীবনে এ যৌথ কারবারের দিক প্রসারিত হবার পর স্বল্পবিত্তভোগী ক্রমক্ষয়-প্রাপ্ত শিক্ষিত মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্তের সৃষ্টি হয়। শ্রেণী হিসাবে এদের একমাত্র বেঁচে থাকার অবলম্বন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি, শহরে

কেরানীগিরি, দেশে স্বল্পবিত্ত, অপরিমেয় সামাজিক দায়িত্ব। এর সঙ্গে যৌথ কারবারের কেরানী নিয়োগের প্রথাটি বিশ্লেষণ করলেই কেরানী জীবনের উৎসমূল খুঁজে পাওয়া যাবে। কেরানী মনের উদারতা, সঙ্কীর্ণতা, ব্যর্থতা তাও এই যৌথ কারবারের গঠনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। আর যৌথ কারবারের অন্তরালে যে ব্যক্তি-তান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতা রয়েছে তা যে কেরানী জীবনের হতাশা সৃষ্টিতে অতি সূক্ষ্ম নির্মম ভাবে সহায়তা করে, এবং এরই ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যে কেরানী জীবন একটি বিশেষ শ্রেণী হিসেবে দেখা দিয়েছে—তা প্রেমেন্দ্র ও শৈলজানন্দর গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলেই পাওয়া যাবে। প্রেমেন্দ্র ও শৈলজানন্দ কারুর হাতেই বৃহৎ উপন্যাস সৃষ্টি হয়নি। সেদিক থেকে এরা দুজনেই তেমন কোন চেষ্টা করেনি। তবে যা উপন্যাস লেখা হয়েছে তা বড় গল্পের সম্প্রসারিত সংস্করণ। এতে অবিশ্যি প্রেমেনবাবু বা শৈলজাবাবুর সৃষ্টি ক্ষমতা পঙ্গু হয়নি। বরং বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি বিশেষ শ্রেণীর মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'কল্লোল' 'কালিকলম', ও 'প্রগতি'তে যে মানবগোষ্ঠী সমাজে মরিয়া হয়ে নিজ-নিজ অস্তিত্বের জন্য লড়াই করছিল, তারাই সাহিত্যের—বিশেষ করে কথাসাহিত্যের মধ্যে—চরিত্র হিসাবে দেখা দিয়েছিল।

এই যে মানবগোষ্ঠী সাহিত্যের মধ্যে চরিত্র হিসেবে দেখা দিল তাদের সমাজ-রাজনৈতিক এবং সবার ওপরে অর্থনৈতিক পশ্চাৎ-পটটি কি? ইংরেজ দেশ থেকে চলে না গেলে আমাদের ছেলেপুলের ভবিষ্যৎ নেই। সন্তানসন্ততিদের ভবিষ্যৎ ভাবনায়—একটি শ্রেণী ইংরেজের সহায় হয়েছিলেন। আবার কেউ ইংরেজের বিরুদ্ধে সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন। এদের মধ্যে আর একটি শ্রেণী ছিল যাঁরা নিরুপদ্রব বেআইনী আন্দোলন—অর্থাৎ সত্যাগ্রহ পছন্দ করতেন। কেননা খুব বেশী ঝুঁকিও নেই অথচ প্রতিবাদও হল।

এই শ্রেণীটি বাঙ্গালা সাহিত্যে এক সময় মেরুদণ্ডের মত কাজ করেছে। কারণ এদের ছেলেরাই স্বল্প বেতনে সওদাগরী অফিসে চাকুরী করেছে। এদের ছেলেরাই চাকুরী না পাবার জন্য বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। নিম্ন মধ্যবিত্তের সমাজ-অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের এই অংশটি 'কল্লোল,' 'কালিকলম,' ঢাকার 'প্রগতি'র সময় বাঙ্গালা সাহিত্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ আমাদের ছেলেরা সাহিত্যের নায়ক হয়ে উঠল। জমিদারনন্দন ছেড়ে আমাদের ঘরের ছেলেরা এলো। তার সঙ্গে আরো অনেকে এলো—বারবনিতা, অপরিণামদর্শী আদর্শবাদী শিক্ষিত যুবক, শহরের গ্লানি থেকে জন্ম-নেয়া ভবঘুরে অলস। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের শত দুঃখ লাঞ্ছনার ইতিহাসবাহী কুলবধূ। পল্লীর সমাজ তখনও পুরোপুরি ভাঙ্গেনি, কিন্তু যৌথ পরিবার ভাঙ্গতে শুরু করেছে। ছেলেপুলেরা চাকুরী পেয়ে শহরে চলে যাচ্ছে। ছেলের স্বাস্থ্য ভাল নেই অতএব বৌমাকে পাঠানো দরকার। এদিকে ছেলে-বৌ যে গোপন চুক্তি করেছে—হতভাগ্য বাপমা তা জানলও না। আর জানলেও ছেলে বৌয়ের যৌথবাস আটকানো যেত না। ঘরের কুলবধূ স্বামীর সঙ্গে শহরে বাস করতে এসে দেখে সমস্যার অন্ত নেই। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল যে স্বামীকে একান্ত আপনার জেনে এসেছিল সেই স্বামী একান্ত আপনার নয়। অস্থির অর্থনীতির প্রকোপে পড়ে স্বামী যখন হঠাৎ বেকার হয়ে পড়লেন তখন সমস্যা আরো তীব্র হয়ে উঠল। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের স্বাধীনচেতা যুবক যখন সাহেবের সঙ্গে চটাচটি করে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে এলো তখন সমস্যার ভয়াবহতা বিচিত্র রূপে ফুটে উঠল। তখন পুরাতন পল্লীজীবনে আর ফিরে যাওয়া যাচ্ছে না। অথচ শহরে বাসা ভাড়া টেনে আর পারা যাচ্ছে না। কেননা স্ত্রীর অলঙ্কার তখন বাঁচার কল্যাণে সবই নিঃশেষ হয়েছে। এদিকে

স্ত্রী ভবিষ্যৎ সন্তানের কামনায় অনেক স্বপ্ন দেখেছেন। সন্ধ্যেবেলায় ঠাকুর দেবতাকে ডাকছেন। এমন সময় একদিন স্বামী এসে বললেন, আর তো এখানে থাকা যায় না। এতএব গৃহবাস পরিবর্তন, বস্তীতে আগমন। প্রেমেনবাবুরা সমাজ জীবনের এই সন্ধিক্ষণে এলেন সাহিত্যের ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয়ত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাজার ক্রমশ মন্দার দিকে। বাঙ্গালার পাটশিল্প প্রধানত বৈদেশিক অর্থাগমের কারণ। সেখানেও মন্দা দেখা দিয়েছে। কৃষিপণ্যের দাম ক্রমনিম্নগামী, নতুন শিল্প প্রসারের পথ তেমন নেই। শুধু চা শিল্প আর বস্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণ ভরসা। কিন্তু বিশ্ববাণিজ্যে জাপান যেভাবে বস্ত্রের প্রসার ঘটিয়েছে তাতে স্বয়ং ইংরেজ ব্যবসায়ী চিন্তান্বিত। অর্থাৎ বিশ-তিরিশ দশকের মধ্যে এই সব ঘটনা ঘটেছে। এই সব ঘটনাবলীর প্রভাব বাঙ্গালা সাহিত্যের ওপর পরোক্ষভাবে পড়েছে। এই সব অর্থনৈতিক কারণগুলি নিম্নমধ্য-বিত্তের শ্রেণী অবনমনে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। অনেক সম্পন্ন ঘরের ছেলে অবস্থার দায়ে ভবঘুরে হয়েছে। বাড়িতে বাবার কাছ থেকে টাকা পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। এদিকে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে পৌরুষ দেখাতে গিয়ে—চাকুরী খতম।—আসল সত্য সাহেবও কারণ খুঁজছিল। ব্যবসার অবস্থা খারাপ কিছু লোককে কাজ থেকে বিদায় দিতে হবে। এই সত্যটি অপ্রকট। প্রচার ঠিক তার উল্টোটি। সে যুগে চাকুরী থেকে বরখাস্ত সমস্যাটি বিদেশী বনাম দেশী মানুষের লড়ায়ের মধ্যে পর্যবসিত হতো। ফলে দেশী মালিকদের কম পয়সায় লোক নিয়োগ করার সুযোগ ছিল। বাঙ্গালা দেশের দেশী মনিবরা তাদের কারবারে কাজ করাকে দেশসেবার অঙ্গ বলে প্রচার করত। এই প্রচার মুখ্যত সংবাদপত্র শিল্পেই বেশী চলছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্রের

প্রথম গল্প 'শুধু কেরানী' ভূস্বত্বভোগী মধ্যবিত্তের অবক্ষয়ের প্রথম সোপানের যুগে। ১৯২০-২১-শের রাজনৈতিক আন্দোলনের পরে যে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে সেই যুগে শিক্ষিত নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙ্গালী তখন একেবারে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বেরিয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ম্যালেরিয়া যজ্ঞে অজস্র জীবন নিধন হয়েছে তাতে করে শিক্ষিত বাঙ্গালী নিম্ন মধ্যবিত্তের পল্লীজীবন যাপন করার মোহ কেটে গিয়েছে। এদিকে নদীনালা হেজে-মজে যাবাব জন্য জমির সারবত্তা ধ্বংস হয়েছে। কাজেই শুধু ভূমিভিত্তিক জীবন আর চলে না। ফলে বাঙ্গালীজীবনের একটা অংশের দ্বৈত সমাজজীবন গড়ে ওঠে। নাগরিক জীবন আর পল্লীর নিঃসঙ্গ জীবন। ম্যালেরিয়া, হেজে-মজে যাওয়া নদীনালার অবশ্যম্ভাবী অর্থনৈতিক ফল ভূমি-নির্ভরশীল নিম্নমধ্যবিত্তের মাঝে হতাশা, নৈরাশ্য। এর সঙ্গে যোগ হল প্লাবন ও খরা। এর নৈরাশ্যজনক ফল চাষী সমাজের ওপর বর্তে। তৎকালীন বাঙ্গালা সাহিত্যের গল্প উপন্যাসের খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে এই নৈরাশ্য-জর্জরিত অসহায় চাষী শ্রেণীর বড় একটা সাক্ষাৎ মেলে না। এর প্রধানতম কারণ হল তখনকার কালে চাষীরা শ্রেণী-সচেতন হয়ে সংগ্রামশীল হয়ে ওঠেনি। পক্ষান্তরে নিম্ন মধ্যবিত্তরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে সংগ্রামশীল হয়ে উঠেছে। এদেরই সমাজের আনাচে-কানাচে দেখা দিয়েছে বিভিন্ন সমস্যা আর চরিত্র। এবং এরাই গল্পউপন্যাসের নায়ক ও নায়িকা হিসেবে দেখা দিয়েছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এদের অবশ্য শ্রেণী অবনমন হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যের রাজ্যে এদের শ্রেণী-উন্নয়ন হয়েছে। এই দুটি বিরোধী ধারা বাঙ্গালার গল্প সাহিত্যে যথেষ্ট স্থান জুড়ে আছে। এই দুটি বিরোধীশক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে এই যুগে লেখকেরা নায়ক-নায়িকাকে দিয়ে শ্রেণী-শত্রুর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে পারেননি, প্রতিরোধ ত সুদূরপরাহত। শিক্ষিত নিম্নমধ্যবিত্ত

শ্রেণীরা যখন অবচ্যুত ও অবনমিত হয়ে পড়ল তখন সুনির্দিষ্ট মাস মাইনের চাকুরীরজ্জুই একমাত্র সম্বল হয়ে উঠল। এই অবস্থার গভীর ভয়াবহ দুঃখ-পার্শ্বপটটি হল এই যে, ব্যবসায়ীরা কোন অবস্থাতেই এদের—এই মাস মাইনে শ্রেণীদের ক্ষমা করে না। তারা অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা দ্রব্যমূল্য বাড়িয়েই যাচ্ছে। শোষণের মাত্রা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। এখানে দেশী এবং বিদেশী একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই, অথচ মাস মাইনের সীমাবদ্ধ আয়ের মধ্যে যে শ্রেণীটি আটকা পড়ে গেছে, তাদের কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তিরও কোন পথ নেই—একমাত্র সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে-তোলা ছাড়া। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই সময়কার সাহিত্যের মধ্যে অর্থাৎ গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে অর্থনৈতিক মুক্তি বা সমাজব্যবস্থা ভাঙ্গার বৈপ্লবিক চিন্তা বড় একটা পাওয়া যাবে না। তার একমাত্র কারণ বোধ হয় নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে যে একটি গূঢ় সংরক্ষণশীলতার মনোবৃত্তি রয়েছে সেটি থেকে অনেক লেখকই হয়ত তখনও মুক্ত হতে পারেননি। তার ফলে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে হতাশা ও অর্থনৈতিক পীড়নের চিত্র এসেছে। কিন্তু সে চিত্রের অন্তর থেকে ভবিষ্যৎ সমাজ বিপ্লবের বা বিবর্তনের কোন আভাস পাওয়া যাচ্ছে না।

বরং যাঁরা বিপ্লবপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁদের প্রতি সাহিত্যে কটাক্ষ আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় একটা ভারতব্যাপী ব্যাপক বিপ্লব প্রচেষ্টা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিণতির কালেই 'ঘরে বাইরে' লিখলেন। সেখানেও বিপ্লবীদের প্রতি কটাক্ষ আছে। আবার তিরিশের যুগে লিখলেন 'চার অধ্যায়'। কটাক্ষ শ্লেষ সবই এর ভেতরে আছে। ঠিক বিপ্লবপন্থায় কোন শাসকসম্প্রদায়কে দেশ থেকে বিতাড়ন, বা বিপ্লবপন্থায় সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নতুন সমাজের সংগঠন, এ যেন বাঙ্গালা সাহিত্যে

আমল পাচ্ছে না। শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'—এতেই আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্য একবারে থরহরি কম্পমান। রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের যুগে বিশ দশকের অসহযোগ আন্দোলনের পর বাঙ্গালা সাহিত্যের লেখকরা একক না হয়ে গোষ্ঠী সত্তা নিয়ে দেখা দিলেন। এই গোষ্ঠী সত্তা ঐতিহাসিক কারণে ঘটেছে। রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের মুখে দাঁড়িয়ে যাঁরা সাহিত্যে নতুন জোয়ার আনার চেষ্টা করছিলেন তাঁরা সমাজ শক্তি চিনে ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র কাঠামোর চরম গৌরবের দিনে ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব এক অসম্ভব মর্য্যাদার উৎস ছিল। সেক্ষেত্রে অবসরভোগী সমাজের মধ্যেই, বিশেষ করে জমিদার শ্রেণীর মধ্যেই 'রাশভারি' লোকের আবির্ভাব হতো। অবসরভোগী সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই সব সংস্কৃতির উৎস ও আধার, এই আধারে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ছিলেন। শরৎচন্দ্র যদি ভবঘুরেপনা না করতেন তবে হয়ত তিনিও থাকতেন ঐ শ্রেণীতে। একটা স্থিতিবান সামাজিক পরিবেশ (এখানে স্থিতিবান সামাজিক পরিবেশ অর্থে স্থিতিবান বৈষয়িক ব্যবস্থা, নিটোল আর্থিক ক্ষমতা। কেননা সমাজে এই শক্তিটি সব কিছু সুস্থির করে রাখে।) থেকে সাহিত্যের ইন্ধন সংগ্রহ করা ছিল সেকালের সাহিত্যের রেওয়াজ। এটি একটি বিশেষ মনোভাব, এই মনোভাবের গুরুঠাকুর হলেন চৌধুরী মশাই। অপরিসীম জ্ঞানের অধিকারী হয়েও সমাজ-সংস্পর্শবর্জিত প্রায় নিঃসঙ্গ-আভিজাত্য পালন করে গেছেন তিনি। কলম ধরে 'চার ইয়ারীর কথা' লিখলেন তিনি। এ সব গল্পের গঠন নৈপুণ্য, বাচন ভঙ্গী, যতই সুষ্ঠু হোক না কেন, গভীর মানবিক সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এটি সৃষ্টিশীল নয়। একটা বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী মানসিকতার অলস ও অ-মানবিক রঙীন কল্পনা—'eternal feminine'—কোন একটি হোটেলে বসেই সম্ভব। এবং

সে হোটেলে আর যাই হোক, ভোজ্য ও পানীয় বস্তুর কোন অসদ্ভাব নেই বরং অপরিমিত প্রাচুর্য আছে। প্রয়োজনের অধিক প্রাচুর্য যেখানে মানসিক গঠনে সেখানে একটি বিরাট আত্মকেন্দ্রিক অ-মানবিক অহং সৃষ্টি হবেই। সেই অহংটা যে কত বড় অবাস্তব ভণ্ডামী তা কোন ব্যক্তিকে যদি প্রাচুর্য থেকে ঠেলে আত্ম-অবমাননাকারী দুঃসহ দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলে দেয়া যায়, তখনই তা বুঝতে পারা যায়। সেই হোটেলের গল্পবাজ একই মানুষ ভিন্ন সুরে কথা বলতে শুরু করবে। এই একই লোকের বিভিন্ন বৈষয়িক পারিপার্শ্বিকে, বিভিন্ন চরিত্র-বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে-ওঠাতেই মার্কসের এই কথাটি প্রমাণ করে: "The mode of production of material life determines the general character of the social, political and intellectual processes of life." চরিত্রের গভীরে এটা খুব বাস্তব সত্য। এখানে মানব-চরিত্রেব বাস্তব উপাদান কি, আরো একটু বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। 'Mode of production' বলতে আমরা বুঝি জমিদারী প্রথার সূত্রে পাওয়ানা অজস্র আয়, প্রজা শোষণেব উদ্বৃত্ত পয়সার বাহাদুরী। কাজেই আত্মকেন্দ্রিক হতে বাধা কোথায়? কেননা, 'কারুর ধাব ধারিনে', অর্থনৈতিক স্বেচ্ছা-চারিতার পূর্ণ সুযোগ এর মধ্যে রয়েছে যে! রাজপুরুষেরা যেখানে সৌধ নির্মাণ করেছেন, সেখানে সৌধ নির্মিত হল। ছেলেকে সংস্কৃতিবান করতে হবে, শাসকগোষ্ঠীব ভাষা, ভাব, সামাজিক আচার-বিচার নকল করা হল। ছেলে বিলেত গেল শাসক গোষ্ঠীর ভাবকে হজম করার জন্য। সেখানেও উদ্বৃত্ত অর্থের ওপর ভর করে ব্যারিষ্টারী পাশ করা হল। উদ্দেশ্য, উচ্চবিত্ত সমাজে ছেলেকে প্রতিষ্ঠিত কবা, আর এই উচ্চবিত্ত সমাজই শাসক গোষ্ঠীর আঁচল-ধরা। কাজেই সবার সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে কেরানীগিরি

করতে হবে না। এইভাবে তথাকথিত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। এরা সমাজের ওপর, সাহিত্যের ওপর, রাষ্ট্রের ওপর দখল নিয়ে থাকে। মার্কসের কথায়, 'social, political, and intellectual processes of life' উচ্চ শ্রেণীদের মধ্যে গঠিত হয়ে থাকে। এর পরই ধরুন সাহিত্যের নামে, সংস্কৃতির নামে অবাস্তব মালের আমদানী হয়। এই আমদানীতে বিশুদ্ধ সাহিত্যের সেরা ওস্তাদ চৌধুরী মশায় একেবারে সবার অগ্রণী। গেটে নাকি কোথায় উক্তি করেছেন, "In every epoch, the ruling ideas have been the ideas of ruling class." এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন মার্কস "In every epoch, the ruling ideas have been the ideas of the ruling class."

এখানে বিচার করতে হবে ruling ideas-ইবা কি? এবং ruling class-ই বা কারা, যাঁদের idea সব সময় প্রাধান্য পাচ্ছে? যেহেতু ভারতবর্ষ এককালে উপনিবেশ ছিল সেইহেতু এর ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ছিল। তাই কাঁচা মালের অর্থনীতিতে ব্রিটিশযুগে ভারতবর্ষের নব্য:শিক্ষা সাহিত্যের ও চিন্তাশীলতার জন্ম হয়েছে। উপনিবেশ দেশগুলিতে এই ruling class-এর সংজ্ঞা একটু বিশদ ও বিস্তৃততর করতে হবে। একদিকে হৃতসর্ব্বস্ব মুসলমান ভূস্বামী, অন্যদিকে গোঁড়া হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক ভূস্বামী, এই দুই শাসকশ্রেণীর মাঝে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন্ নতুন চিন্তার গুরুঠাকুর হয়ে এলেন। এই হিন্দু এবং মুসলমানের প্রতিদ্বন্দ্বা সংস্কৃতি ও সাহিত্য তখন সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করত, পরস্পর ভেদাভেদকে জীইয়ে রাখত। এই সাংস্কৃতিক লড়াই বাদে এরা শোষক শ্রেণী হিসেবে একই ছিল। এদের আমরা ভূস্বত্বভোগী শাসকশ্রেণী বলব। তখনকার কালের শাসক শ্রেণীর এটেই বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রকৃত সংজ্ঞা হল সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রবাদী শাসক-

শ্রেণী। এদের ধর্ম্ম আছে, ব্যভিচার আছে, শোষণ আছে—নেই কেবল সমাজ গঠনের বৈপ্লবিক স্পৃহা। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন যে-শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ে আসে এবং সাংস্কৃতিক বিজয়ের জন্য অশেষ চেষ্টা করে, তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখানে আলোচনা সম্ভব নয়। তবু ruling class সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এটুকু বলা যেতে পারে যে, এখানকার ভারত উপনিবেশের স্থিতিবান উচ্চশ্রেণীর একটি অংশের কাছ থেকে প্রথমে নব্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বাধা আসে। তবে চেষ্টা যতই হোক না কেন, তৎকালীন সমাজের একটা অংশ রাজকুলের ভাষা, ভাব, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানতত্ত্ব গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ হয়েছিল। রাষ্ট্রযন্ত্র যার হাতে তাদের সহায়তা করাই তাদের ধর্ম্ম ছিল। তাছাড়া পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাবও এদের ওপর এসে পড়েছিল। রাজকুলেরা যখনই যে-ভাষা, ভাব বা সাহিত্য নিয়ে আসে সমাজের—বিশেষ করে উচ্চবিত্তেরা—তারা তা মেনে নেবেই। কেননা সেটা তাদের শ্রেণীর স্থিতস্বার্থের পরিপন্থী নয়। হিন্দু সমাজের উচ্চবিত্তেরা প্রায় সবাই ফারসী ভাষা জানতেন। তার কারণ ওটা ছিল রাজভাষা। এদেশের সংস্কৃতির একটা পর্যায়ে সংস্কৃত ও ফারসীর সংমিশ্রণ হয়েছিল, তখন এক ধরণের মিশ্রসত্তা সংস্কৃতির মধ্যে ফুটে উঠেছিল। এই মিশ্রসত্তার অতীব উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল রাজা রামমোহন নিজে। সংস্কৃত-ফারসী মিশ্র সত্তা থেকে আর একটা নব পত্র বিকশিত হল সেটি হচ্ছে ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতি। এই বিকাশ ধারায় রামমোহনই ছিলেন অসম সাহসিক ব্যক্তিত্বপূর্ণ গোটা মানুষ। তিনি উপনিবেশবাদের সকল তথ্য তাঁর মত করে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। নতুন চেতনার দরজাকে—অর্থাৎ স্থিতিবান উচ্চশ্রেণীর নতুন চেতনার দরজাকে, উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ইস্‌লামীয় সংস্কৃতির প্রবল প্রতাপে, খৃষ্ট ধর্মের ও সংস্কৃতির আক্রমণে হিন্দু সংস্কৃতি যখন

জীবনমরণ দ্বন্দ্বে নিমগ্ন, তখন রামমোহন এক নব্য সংমিশ্রণবাদ নিয়ে এলেন। ফলে স্থিতিবান উচ্চবিত্তেরা প্রতিবাদ করতে-করতে শাসক সমাজের সংস্কৃতি ও সাহিত্য গ্রহণ করতে লাগলেন। শাসক শ্রেণীর ideas গ্রহণে রামমোহন যে তৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন তা একটু বিস্ময়কর বটে। তবে রামমোহনের শ্রেণীসংস্থান, পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ঐ অবদমিত পরিস্থিতিতে রামমোহনের মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরাই জেগে ওঠেন। নিজে স্থিতিবান অর্থনীতির পরিপোষক সমাজের লোক হয়েও তাঁর নতুন সংস্কৃতিকে গ্রহণ না করে গত্যন্তর ছিল না। তাঁর সমস্ত প্রতিভাকে নব্য শাসক সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি বিস্তৃতির কাজে নিয়োগ করেছিলেন। বাঙ্গালা দেশে এমন একটা কাল ছিল যখন ইংরেজের উচ্চ রাজকার্যে ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরা বেশী সহায়তা করেছেন। হিন্দু সমাজের গোঁড়ামী ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা এর একটা বড় কারণ। কিন্তু ইংরেজের সংস্কৃতি গ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গে জাতীয়তাবাদের নতুন সুর সৃষ্টি করাও ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলনের দান।

শাসক সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির ideas যখন ব্রাহ্ম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সমাজের কাছে পৌঁছল তখন ব্রাহ্ম সমাজ আর নিজেকে এককভাবে রাখতে পারলেন না। হিন্দু সমাজও সমাজ সংস্কার করে, শাসক শ্রেণীর সুরটি গ্রহণ করে এক নতুন রূপ দিলেন। এই রূপের যে ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা তা হল নিম্ন মধ্যবিত্তের অর্থনীতি, চাকুরীজীবী নিম্নমধ্যবিত্তের অর্থনীতি। সরকারী অফিস, সওদাগরী অফিস, ছোটখাট ব্যবসা,—এর সম্পূর্ণ গতিটাই শহরমুখী ও জনতার নব্য শ্রেণী বিন্যাস। অবিশ্যি এসবই সম্ভব হয়েছে শাসক শ্রেণীর সঙ্গে উপনিবেশে স্থিতিবান উচ্চবিত্তের যোগাযোগের ফলে। উপনিবেশে বিদেশী বণিকের যৌথ কারবারের

সাফল্যের সঙ্গে কেরানীকুলের সৃষ্টির একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। দেশী বণিকদের স্বাদেশিকতার আন্দোলনের ফলে সমাজ-বিচ্ছিন্নতাবাদের সৃষ্টি হয়েছে। আর এই সমাজ-বিচ্ছিন্নতাবাদ থেকেই সাহিত্যে 'আমি' তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের কেরানী জীবনের বিন্যাস শুরু হবার পূর্বে এই-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণগুলো ঘটেছে। যৌথ পরিবার আর যৌথ কারবার দুটোই 'যৌথ' বটে। কিন্তু যৌথ কারবার গড়ে ওঠার পশ্চাৎপট সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এক 'যৌথ' ভেঙ্গে আর 'যৌথ' গড়ে উঠেছে। পরিবার পরিজনের সংখ্যা বৃদ্ধি, আইনের সাহায্যে কৃষি জমি ভগ্নাংশীকরণের ফলে সমগ্র ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাটি অর্থনীতির দিক দিয়ে ঘাট্তি অর্থনীতিতে দাঁড়ায়। যে উদ্বৃত্ত ফসলের ওপর নির্ভর করে একদিন সামন্ততান্ত্রিক বদান্যতা, অতিথি সেবা, যাগযজ্ঞ ক্রিয়া কলাপ চলত তার অপরিকল্পিত রূপান্তর ঘটে। জমিদার বাড়ি, উকিল মোক্তার বাড়ি ছাত্র না পুষে 'ফালাকাটা' জমির উদ্বৃত্ত ফসল বিক্রির টাকা, খাজনা বৃদ্ধির টাকা ব্যাঙ্কে ব্যক্তির নামে জমা হতে থাকে। সেই টাকা শেয়ার বাজার ও কোম্পানীর কাগজে রূপান্তরিত হয়। দেশী স্বাদেশিকতার খাত বেয়ে যৌথ কারবারের পুঁজি পরিস্ফুট হয়। অতএব প্রেমেনবাবুর—'শুধু কেরানী' গল্প আলোচনা করার আগে এই কারণগুলো স্মরণ রাখতে হবে।

বিশ-তিরিশ দশকের সাহিত্য আন্দোলন

(১)

শ্রেণীসত্তা যে এক-একটি বিশেষ অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল এ কথা আজ আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। Cole ইংল্যাণ্ডের শ্রেণীকাঠামোর একটি রূপ স্থির করছেন।* তাতে তিনি দেখিয়েছেন শ্রেণীবিন্যাস কোন-কোন ইন্ধনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠছে। তাঁর আলোচনা অবিশ্যি ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধে প্রয়োজ্য তবুও সর্বদেশের সর্বকালের কারণ তিনি সন্ধান করেছেন। Cole এগারোটি শ্রেণীবিন্যাস করেছেন। তার মধ্যে মধ্যমশ্রেণীর কৃষিপরিবার আছে, মধ্যমশ্রেণীর সিভিল সার্ভিসের লোকও আছে। স্কুল শিক্ষক, বিভিন্ন ব্যবসায়ী, কেন্দ্রের চাকুরে ইত্যাদি এদের সংমিশ্রণে যে শ্রেণী ব্যাপকভাবে গড়ে উঠেছে তাকে অভিজাত ও অন্যান্যদের শ্রমিক শ্রেণীতে রাখা হয়েছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে জমিদার নন্দনদের শ্রেণী সংযোগের পর নব্য গড়ে-ওঠা আর একটি সমাজ সাহিত্যে ঠাঁই নিয়েছে। যে-যে

*Studies in Class Structure : G. D. H. Cole, See pages 94-95

কারণে ইংল্যাণ্ডে শ্রেণী ভাঙাগড়া সম্ভব হয়েছে সেই-সেই কারণ-গুলি আধা-ঔপনিবেশিক দেশে নেই। তাই এখানে ভাঙ্গাগড়ার স্বরূপটা ততটা স্পষ্ট নয়। বিশ-তিরিশের যুগে সাহিত্যে, বিশেষ করে বাঙ্গালার গল্পসাহিত্যে, সাধারণ মানুষের নামে যাঁরা এসেছেন তাঁরা প্রায়ই সবই শিক্ষিত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান-সন্ততিরা। এঁরা শহরে এসেছেন অন্তরে অদম্যআশা নিয়ে। কিন্তু সেই আশা পূরণের কোন সম্ভাবনা নেই। ফলে শহরবাস ও নৈরাশ্য দুই-ই সমাজ-জীবনে জেঁকে বসল। কিন্তু যে মানুষ শহরে এসে যে ধরনের মনোবৃত্তির দাস হল, সেই মানুষই পল্লী জীবনে বাস করলে অনুরূপ পরিচয় দিত। এর অবিশ্যি মূল কারণ বৈষয়িক পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন; এই পল্লীর জীবন থেকে যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তাদের ক্ষেত্রে এটা অনেকটা যন্ত্রণদায়ক সন্দেহ নেই। আবার কোন-কোন ক্ষেত্রে এ অনেকটা গা-সহা হয়ে গিয়েছে। বৈষয়িক পারিপার্শ্বিককে নির্বিবাদে মেনে নেওয়া আর এর সংস্পর্শে এসে মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হওয়া—এই দুইধারা বাঙ্গালার গল্পসাহিত্যে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে বলে রাখা ভাল, সাহিত্যে সমাজবাস্তববাদ আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে এক বিশেষ ধরণের নায়ক সাহিত্যেব মধ্যে দেখা দিয়েছিল। নায়ক চরিত্রগুলির মধ্যে ছিল প্রেম ভালবাসার ক্ষেত্রে নিছক দ্বন্দ্ব। এবং যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল তার মধ্যে খুব সূক্ষ্মভাবে বা কোন সময় খুব প্রকাশ্যভাবে, শ্রেণীমর্যাদার প্রশ্ন উঠেছে। কৃষিভিত্তিক পরিবার প্রতিপালনের যুগে এই মর্যাদাটাই ছিল শ্রেণীভিত্তিক সামাজিক দ্বন্দ্বের কারণ। শরৎচন্দ্রের "দেবদাস"-এ এর কিছু আভাস পাওয়া যায়। কৃষি-সম্পত্তিভিত্তিক মধ্যবিত্ত পরিবার পরিপুষ্টির যুগে সামাজিক লড়াই-ই শ্রেণীদ্বন্দ্বের রূপ নিয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। তার

কারণ দুটি সম-সম আর্থিক অবস্থাকে যদি সামাজিক ক্ষেত্রে প্রসারিত করা যায় তবে দেখা যাবে শ্রেণীসচেতনতা মর্যাদার রূপ নিয়ে এসেছে। আবার শ্রেণীউন্নম্র হবার পর বনেদী জমিদার আর নূতন পয়সাওয়ালা অভিজাত-এ দ্বন্দ্ব বেঁধেছে। সেখানেও শ্রেণী-চেতনা হল মর্যাদা। কুমুরদাদা, মধুসূদন, কুমু—(যোগাযোগ, রবীন্দ্রনাথ) এই তিনের দ্বন্দ্বের একটি মাত্র সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় শ্রেণীউন্নম্র আর শ্রেণীঅবনমনের মধ্যে। এরই সুবাদে এ ওর মাথা ঠুকে বিনাশ খুঁজছে। একটা উন্নম্র সামাজিক চাঁদোয়ার তলায় বসে এই কাজটি সংঘটিত হচ্ছে। ফলে সাহিত্যের রস কারুর-কারুর কাছে বিষাদ-ঘন বলে মনে হয়েছে। এই বিষাদ-ঘন ছায়ার সন্ধান তাঁরাই করেন যাঁরা অর্থনৈতিক বনিয়াদটা ধরতে চান না। রবীন্দ্রনাথ অতিবড় গভীর বাস্তববোধের সাড়া দিয়েই মধুসূদন আর কুমুতে নূতন ও পুরাতন বড়-মানুষী-সুলভ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছেন। আসলে এটা শ্রেণীব ক্ষেত্রে মানসিক দ্বন্দ্ব সামাজিক পরিবেশের ওপরে।

ধনতন্ত্রী সমাজে এটা বেশ দেখতে পাওয়া যায় যে, নূতন পয়সা-ওয়ালা পুরোনো পয়সাওয়ালা শ্রেণীকে আড়চোখে ঈর্ষা করে। অর্থাৎ জোত-জমার জমিদারদের নূতন ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা একটু ঈর্ষাব চোখে দেখে। আর তথাকথিত বনেদী জমিদাররা নূতন বড়-মানুষদের আড়ালে-আবডালে একটু ছোট মনে করে ঘৃণাও করে। অথচ সামাজিক সংমিশ্রণ যখন হয় তখন এই সীমারেখা অর্থাৎ ঘৃণা বা ঈর্ষাব সীমারেখা, অতিক্রম করে পরস্পর পরস্পরকে হজম করতে চেষ্টা করে। কুমু-মধুসূদনের বিবাহ থেকে পববর্তী আচার-আচবণ সেই জাতীয় শ্রেণীর মানসিক সংঘাতেরই নিদর্শন। বাঙ্গালার ওপরতলার সমাজজীবনে এই ঘটনা অহরহ ঘটছে। অর্থের আনুকূল্যসমেত আর দু'একটা বংশ পার হলেই ঐ মধুসূদনেরাই

বনেদী পরিবার, এটা অনেকটা ক্রমগতির মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক ইতিহাসে যেমন দেখা যায় এক ধনতন্ত্রী রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রকে আক্রমণ করছে। এও ঠিক তাই সামাজিক ইতিহাসে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে আত্মগত স্ব-বিরোধ। এই উচ্চশ্রেণীর আত্মগত বিরোধের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'। যে সময় এই পুঁথি প্রকাশ করা হয় ঠিক সেই সময় অথবা তারও কিছু আগে বাঙ্গালার শোষক জমিদার আর উঠ্‌তি শিল্পপতিদের মধ্যে সামাজিক মর্যদার লড়াই চলছে। কুমুর দাদার বিষণ্ণ চিত্তের স্বপ্নবিলাস আর রাজা মধুসূদনের ধন-ঐশ্বর্যের উগ্র আত্মপ্রকাশ একটা উচ্চশ্রেণীকে আর একটা উচ্চশ্রেণীর গিলে খাবার ছলকলা মাত্র। এও এক ধরণের উগ্র বিলাসবহুল রস। স্পর্শ বাঁচিয়ে দূরত্ব বজায় রেখে জানালা দিয়ে মিছিল দেখার মত জনদরদও থাকা চাই, দাম্ভিকের আত্মপ্রসাদ লাভে মগ্ন থাকা চাই, অথচ উদ্বৃত্ত বদান্যতার বিজ্ঞাপন দেওয়া চাই—ওপরতলার সাহিত্যে এ জাতীয় চরিত্র অতীব সুলভ। সমগ্র জীবনকে বাদ দিয়ে পারিবারিক জীবন এমনভাবে জেঁকে বসেছে—যেন এর থেকে সাহিত্যের আর মুক্তি নেই। রবীন্দ্রনাথ 'গোরা'কেই প্রথম বৃহত্তর সমাজের স্বপক্ষে রুখে দাঁড় করালেন, অমনি শ্রেণী স্বার্থের পাণ্ডারা শাস্তি দিয়ে তবে ছাড়ল। সেই যুগে 'গোরা'র বিপ্লবী মন নিজের অন্তরে হাহাকার করে মরছিল।

এক পক্ষে অভিজাত সম্প্রদায়ের কাহিনী সাহিত্যের উপজীবিকা হবার একটা বিশেষ কারণ হল, যাঁদের আমরা সাহিত্যের আসরে দেখতে চাই বা দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়া-কর্মের উর্দ্ধে বৃহত্তর সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করতে চাই—তাঁরা যে কর্ম-সংযোগে দিনযাপন করেন তা যেন বৃহত্তর সমাজকে পুরোপুরি স্পর্শ করতে না পারে। পক্ষান্তরে খেটে-খাওয়া মানুষের

সমাজ-জীবনের—এখানে শ্রেণীগত জীবনের—কর্মধারা যেখানেই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে সেইখানেই শ্রেণীচেতনাটি নিমজ্জিত হয়েছে। সেই নিমজ্জিত মানস বাবুদের মনে রসের সৃষ্টি করে না। কাজেই খেটে-খাওয়া সমাজের জীবনধারা ওপরতলার মনে রেখাপাত করতে পারেনা। এই কারণে যে, যে-জীবনধারা দাস্যবৃত্তির দ্বারা পরিপ্লাবিত হয়ে আছে, তাকে সেখান থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত টেনে তুলবার সামর্থ্য খেটে-খাওয়া সমাজের মধ্যে শক্তি হিসেবে দেখা না দিয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানকার জীবগুলির সমাজের ওপরতলায় রেখাপাত করা সম্ভব নয়। কাজেই সেই দাস্যবৃত্তির দ্বারা পরিপ্লাবিত সমাজকে টেনে তুলতে গেলে যে-পরিমাণ আন্দোলন প্রয়োজন তার সূচনা না হওয়া অবধি এদের প্রকৃত স্থান সাহিত্যের মধ্যে হবে না। এ নিয়ে আক্ষেপ বা বিক্ষোভ প্রকাশ করে লাভ নেই। বস্তুত সমাজের উৎপাদনধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত চাষী এবং শ্রমিক শ্রেণীকেই এ দায়িত্ব নিতে হবে। সমাজের প্রকৃত উৎপাদনধারার সঙ্গে জড়িত চাষী এবং শ্রমিক শ্রেণীকেই আমরা বুঝি সাহিত্যের প্রাথমিক স্তর। এদের চরিত্র হিসেবে সাহিত্যে বিকাশ লাভ করতে হলেই আন্দোলনের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হতে হবে। ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে সম্পৃক্ত হয়েছিল এরা। এদের সন্ধান হওয়া সেইসময়কার যুগে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বাঙ্গালা দেশে খেটে-খাওয়া মানুষ একবার নীল বিদ্রোহ করে সেই যে পেছু হটেছে আর যেন তাদের কেউ আসতে দিতে চায় না বা তাদের প্রগতিকে শ্রেণীস্বার্থের খাতিরেই সাহিত্যের আসরে আসতে দেয়া হয়নি। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে'র পর আর চাষীর আন্দোলনের স্বার্থে কোন উল্লেখযোগ্য লেখা প্রকাশ হয়েছে বলে মনে পড়ে না। উপনিবেশবাদের অভ্যন্তরে একটা বিশেষ সুযোগ হল এই যে, সমাজের উচ্চশ্রেণীর সব

আক্রোশটাই বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া যায়। এবং তাই নিয়ে সাহিত্য রচনা করলে সমাজের ওপরতলাকার লোকদের হাততালি পাওয়া যায়। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' যদি বিদেশী নীলকরদের ছেড়ে দেশী শোষকদের বিষয়ে রচিত হত তবে এতটা আলোড়ন হত কি না সন্দেহ। আর এ আন্দোলনের কর্তা ত ওপরতলাকার শিক্ষিত সমাজ, যাদের অবাধ আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর বিদেশী ঔপনিবেশিকরা একটি কীলকের মত এঁটে বসেছিল।

বিশ-তিরিশের সাহিত্য-আন্দোলন সম্পর্কে অচিন্ত্যবাবু তাঁর 'কল্লোল' যুগে ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কথা লিখেছেন। কিন্তু কৌতূহলের বিষয় হল "বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার"-এর লেখক। তাঁর মন্তব্যগুলো যেমন ভাবালুতার আধার তেমন অবৈজ্ঞানিক।

> "কল্লোলের যুগ,—আগেই বলেছি—ক্রান্তির লগ্ন,—পাড় ভাঙার,—বেলা ভূমিকে ভাসিয়ে চুরমার করে নেবার উন্মত্ত সামুদ্রিক যুগ। অর্থনৈতিক কৃচ্ছ্রতা, আদর্শহীন শূন্যতা এবং আশ্রয় রহিত মানস অবদমন এযুগের নবীন যৌবনকে পাতালের অন্ধকারে টেনে নিয়েছিল অজগরের অমোঘ আকর্ষণে। সে বিভগ্নতার তাণ্ডবস্রোতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের এক-একটি গল্পরূপ একটি করে ক্ষণ বুদ্বুদ,—ঢেউ-এর মাথায় সাপের ফণার মণির মত ভাসছে যে উত্তাল ফেনরাজি,—তারি শীর্ষবিন্দুতে ক্ষণিকের আশ্রয় খোঁজার,—প্রত্যয়ের কঠিন মাটিটুকু মুহূর্তের জন্যও আঁকড়ে ধরার ক্ষীণ প্রয়াসে তিনি ব্যাকুল। কিন্তু, অচিন্ত্যকুমার জীবনের স্রোতে চিরভাসমান ;—নীড়ের শান্তি আর সান্ত্বনা তাঁর নয়—তলায় নীল সমুদ্র, মাথার উপরে সুনীল আকাশ, নিরবধিকালের স্রোতে নিরুদ্দেশ জীবন-যাত্রার অভিসারে

ঢেউ-এর মাথায় মাথায় তার নির্বাধ অভিসার। তাই সীমার বন্ধন নেই তাঁর কোথাও।"*

ওপরে উদ্ধৃতি দেবার কারণ হল বিশ-তিরিশের সাহিত্য আন্দোলনের যুগে এই দুইটি লেখক—প্রেমেন্দ্রনাথ ও অচিন্ত্যকুমার—যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তা বাঙ্গালা সাহিত্যে সমাজ-বাস্তববাদের সংলগ্ন না হলেও পূর্বগামী। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে তাঁদের স্থান সুনির্দিষ্ট বলতে হবে। কিন্তু উপরি-উক্ত সমালোচক অধ্যাপক মহাশয় যেভাবে ও যে ভাষায় দুই লেখকের বর্ণনা করেছেন তা পড়ে মনে হয়, সাহিত্যের গূঢ় বিষয় অনভিজ্ঞ ছাত্রদের (বয়স ২২-২৩) জন্য রচনা করেছেন, মূলসূত্রের সঙ্গে দেখা নেই, শুধু ভাষারচ্ছটা। তিনি এক মহা অবৈজ্ঞানিক চিন্তার সূত্রপাত করেছেন, অথচ তিনিই আলোচনা সূত্রে অচিন্ত্য কুমারের উপর নুট হামসনের প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। প্রথম যৌবনে অচিন্ত্যকুমার নুট হামসনের রচনা পড়ে যেভাবে প্রভাবিত হয়েছেন ঠিক সেইভাবেই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান্ সাহিত্যের বোহেমিয়ান তত্ত্ব আমদানী করেছেন। আসলে অচিন্ত্যকুমারের "বেদে" উপন্যাস নয়। এগুলি জোর করে জোড়া-তারা দিয়ে উপন্যাসের আকার দেয়া হয়েছে। আর একটা কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, বাঙ্গালা সাহিত্যে যাযাবরী মনোবৃত্তির চিত্র সৃষ্টির উদ্দেশে বৈদেশিক প্রভাবের কোন প্রয়োজন ছিল না। শহরে মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেকে দিয়ে অসংযত আচরণ ও অসংলগ্ন ঘটনার বিন্যাস সৃষ্টি করাতে কোন কৃতিত্ব নেই অবশ্যি প্রকৃত অভিজ্ঞতা অর্জন না করলে এই রকম তথাকথিত

*বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার পৃষ্ঠা—৪৯২-৪৯৩—শ্রীভূদেব চৌধুরী, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।

দুঃসাহসিকতা দেখা যায়। 'সাহস' আর 'দুঃসাহস' এক গুণ নয়। এই নঙর্থক গুণ দুঃসাহসিকতাকে সমালোচক অধ্যাপক বলেছেন, "তাই সীমার বন্ধন নেই তাঁর কোথাও।"

অচিন্ত্যবাবুর 'বেদে' লেখার সময় তার যা বয়স বা অভিজ্ঞতা তাতে করে বাঙ্গালার 'বেদে' মনোবৃত্তিসম্পন্ন যে অবহেলিত একটি জাত আছে তাদের খবর নেবার সুযোগ ছিল না। যদি 'ডোরহি কপীন' সম্বল করে তিনি বেরিয়ে পড়তেন তবে দেখতে পেতেন এই বাঙ্গালা দেশেই প্রকৃত সুন্দর একটি শ্রেণী আছে, যাঁরা 'ঘর কইনু বাহির' আর 'বাহির কইনু ঘর' এই সামাজিক মনোবৃত্তি নিয়ে চলে। তাছাড়া এই বাঙ্গালার পলিমাটিতে যে এত স্বচ্ছ সরল ভ্রাম্যমান জীবন সৃষ্টি হয়েছে তা তারাশঙ্করের 'রাইকমল' না পড়লে বুঝতে পারা যায় না।

সমাজজীবন থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ধর্মের আবেশ ও আবহাওয়ার মধ্যে একটি ভ্রাম্যমান জীবন রচনা করা—বাঙ্গালায় ঔপনিবেশিক অর্থনীতি সৃষ্টির আগে, অর্থাৎ উপনিবেশে শিল্প-বিপ্লব সৃষ্টির আগে, বেঁচে ছিল। বৈষ্ণব এবং শাক্ততন্ত্রের প্রভাবের ফলে, সামন্ততান্ত্রিক কৃষি-সভ্যতার যুগে এক শ্রেণীর সংসারবিরাগী, অথচ রহস্যপন্থী মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় অনিশ্চয়তার যুগে এ জাতীয় ভ্রাম্যমান শ্রেণী সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক—এদের অর্থনৈতিক জীবন হল ভাসমান অর্থনৈতিক জীবন। মূল কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এরা সঞ্চয়বিহীন অর্থনীতির সৃষ্টি করে। যা ভর সহে তাই সম্পদ অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবে যা বহন করা যায় তাই সম্পদ। যদিও এটা একক অর্থনীতি, তবু কৃষি-সামন্ততন্ত্রের যুগে ধর্মআন্দোলন বৃহত্তর সমাজকে যে নির্ভরশীলতা ও অলোকসামান্য শক্তির ওপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপনে সহায়তা করেছিল—এরা তারই ভগ্নাংশ প্রতিভূ হিসেবে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াত। এদের

সঙ্গে সামাজিক মানুষের সম্পর্ক ছিল গভীর রহস্যের দুয়ার খুলে দেবার সম্পর্ক। ওদেশে ইয়োরোপে খৃষ্টান পাদ্রীরা যেমন স্বর্গের দুয়ার খুলে দিত এও ঠিকই তাই। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবন রাষ্ট্রীয় অনিশ্চয়তা, প্লাবন ও খরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। কাজেই এই অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য অলৌকিক রহস্যজনক কিছু সন্ধান করা খুবই স্বাভাবিক। আর আমাদের দেশের আউল, বাউল, কর্তাভজা, দরবেশ, এরা কিছু-না-কিছু রহস্যের সন্ধান দেবার জন্য ও সেবার জন্য ঘুরে বেড়াত। এদের জীবনে নানাবিধ ঘটনা ও নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা জীবনরসে পরিপুষ্ট হয়েছিল। এরা নিজেরা সংসার ও সমাজ সম্পর্কে উদাসীন থেকে সমাজের মানুষের মধ্যে গভীর ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছিল। এদের জীবনে সমাজের সাধারণ মানুষ যেটুকু ছায়াপাত করত তার চেয়ে এরা বেশী ছায়াপাত করত সাধারণ মানুষের জীবনে। কারণ নিস্পৃহ জীবনযাত্রা, বিত্তহীন সামাজিক পরিস্থিতি —ভোগবিলাসী মানুষের ওপরে অনেক সময় রহস্যজনক প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণতঃ স্ব-বিরোধী পরিস্থিতিতে যারা বাস করত তারাই এদের সম্বন্ধে বেশী কৌতূহলী ছিল। নিজেরা থাকত ভোগবিলাসের মধ্যে, শুনতে ভালবাসত ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা। এই দ্বৈত অবস্থায় সম্পন্ন-ব্যক্তিরা এই ভ্রাম্যমানদের বড় সমর্থক ছিলেন।

আমাদের দেশে সমাজ-অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলতার জন্য আর একদল স্বভাব ভবঘুরের সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের সঙ্গে ধর্মের কোন যোগ নেই। কিন্তু তারা একটা অর্থনীতি তাদের মত করে গড়ে তুলেছিল। এদেশে একটা কথা আছে 'বেদের সাপ বেদেকে কাটে' এই প্রবাদ বাক্যটির অন্তরালে একটি সমাজের অস্তিত্ব এবং তাদের সামাজিক জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই বেদে

সম্প্রদায় কোথাও ঘর বাঁধে না, আর পেশা হিসেবে এরা সাপ ধরে, সাপের খেলা করে। এতে যা রোজগার হয় তাদিয়ে চলে। একটি অতি দুঃখজনক নিম্নতম অর্থ নৈতিক জীবনযাপন করে এরা, শুধু সাপ ধরে এবং সাপের খেলা দেখিয়ে যা কিছু পায়—তাই এদের রোজগার। এদের সঙ্গে যে মেয়েরা থাকে তারা আবার বিভিন্ন তুকতাকের ওষুধ নিয়ে গঞ্জে, বাজারে ঘুরে বেড়ায়; গেরেস্থের বাড়ি তুকতাকের ওষুধ দিয়ে মেয়েদের কাছ থেকে পয়সা পায়। এদের মেয়েরা এত স্বাধীন যে অনেক সময় মনে হয় স্বামী নামক কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব আসলে আছে কিনা। পশ্চিম বাঙ্গালায় বসত করে এমন কিছু বেদের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা মাটির সঙ্গে কিছু সম্পর্ক রেখে চলে। তারাশঙ্কর এদের সম্বন্ধে কিছু লিখেছেন। কিন্তু পূর্ব্ব বাঙ্গালায় এক ধরণের বেদে আছে যারা নৌকা ছাড়া অন্যত্র বাস করে না। হাটে বাজারে এরা যায়, মেলায় বসে মেয়েরা কাচের চুড়ি বিক্রি করে। এটা তাদের পেশা, এরা গেরস্থী করে বটে, তবু ভবঘুরে।

বিদেশ থেকে আর একদল ভবঘুরে আসে এদেশে, তাদের বেশভূষা সব বিদেশী। দোলানো বেণীর সঙ্গে ছোট ছোট ছুরি বাঁধা থাকে। চোখে সুরমা পরে, ঘাগ্‌রাপরা, গায় বেশ ভারি রূপোর গয়না। বিরাট আকারের কুণ্ডল কানে, হাতে কাচের চুড়ি, তাঁবু ফেলে এরা বিভিন্ন স্থানে বসবাস করে। এদের বাসন-কোসন, অলঙ্কার তাঁবু তৈরী করার পদ্ধতি দেখে মনে হয় এরা কোন একটা সভ্যতার অবশিষ্টাংশ হিসেবে বেঁচে আছে। জীবিকা মরা পাখীর তেল বিক্রি, নানাবিধ রঙ বেরঙের ঝাঁপী তৈরী, উলুখর ও তাজা রঙীন খেজুর পাতার সহযোগে এরা বহুবিধ ঝাঁপি তৈরী করে থাকে, বাজারেও বিক্রি করে। এরা কোন তুকতাকের ব্যবসা-বাণিজ্য করে না।

এদের পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই বেশী সক্রিয়। সেকালে এরা সাধারণত শীতের মরশুমে দলবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন ছোটখাট শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছাউনি ফেলত। এদের সমাজিক সংগঠন দেখে মনে হতো এদের পুরুষেরা ছাউনি পাহারা দিতে ব্যস্ত থাকত। মেয়েরা গ্রামে-গ্রামে ছড়িয়ে পড়ত সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে। কিন্তু কোন বিশেষ সমাজের সঙ্গে সামাজিক সংস্পর্শে ওরা আসতে চাইত না। এদের এই ভাবটি এদের গোষ্ঠীগত জীবনের বৈশিষ্ট্য। বিশেষ লক্ষ্য করার এই যে, যূথবদ্ধ সামাজিক জীবনের ওপর আমাদের সমাজ জীবনের বড় একটা প্রভাব দেখা যেতো না। বিশেষ কৌতুকের বিষয় হল এরা কোন দিন যে ছাউনি তুলবে তা বাইরে থেকে বোঝা যেতো না। এই অকস্মাৎ আগমন, নিজেদের প্রয়োজনে সাময়িক বসতি স্থাপন, একটা নৈর্ব্যক্তিক যূথ জীবন-যাপন, আবার অকস্মাৎ স্থান পরিত্যাগ—এ সব কর্ম্মধারার মাঝে আমাদের চিরপরিচিত সামাজিক অভ্যাসের কোন পরিচয় মিলত না। যত কথাই ওরা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা হিন্দিতে বলুক না কেন একটা সুনিশ্চিত দূরত্ব ওরা সব সময় বজায় রেখে চলত। বোধ হয় এটেই ওদের বৈশিষ্ট্য। এই সামাজিক জীব শ্রেণীর ভ্রাম্যমান অবস্থাটা খুব কারুরই পর্যবেক্ষণ করে দেখার অবকাশ ছিল না। কিন্তু এরা বাঙ্গালার জল আবহাওয়া হতে বিচ্ছিন্ন থেকেও একটি অদ্ভুত শ্রেণীর যাযাবর। এদের জীবনযাত্রার নিকট পরিচয় লাভ করা খুবই দুরুহ কাজ সন্দেহ নেই। তবু একথাটা স্বীকার করতে হবে যে এদের আগমন ও নিশব্দ নিষ্ক্রমন আমাদের সমাজজীবনে কেমন যেন একটা প্রতীক্ষার ভাব সৃষ্টি করত।

কাজেই বাঙ্গালী সমাজে যাযাবরী বা বেদে-বৃত্তির যে চিত্র শহর থেকে অচিন্ত্যবাবু এঁকেছিলেন তার সঙ্গে বৃহত্তর বাঙ্গালী সমাজের কোন যোগ নেই। আর যে শ্রেণীবিন্যাস সেখানে রয়েছে

তারও কোন সঠিক চিত্র তিনি তুলে ধরতে পারেননি। এর জন্য অবশ্যি একটি বিশেষ ধরনের নাগরিক জীবন দায়ী। বড় শহরের বস্তিতে বা গলিতে যে জীবন বিপর্যস্ত, বিভ্রান্ত বা ছিন্নমূল ভ্রাম্যমান তার সমাজ-অর্থনৈতিক কারণ সম্পূর্ণ আলাদা। অচিন্ত্যবাবুর লেখায় সেই কারণের প্রতিক্রিয়া থেকে যে মনোবৃত্তি জন্ম লাভ করে তার কোন চিহ্ন নেই। যারা শ্রেণী-বিভাগের জন্য ভুগছে—তাদের মধ্যে শ্রেণীর বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ নেই। তার ফলে 'বেদে'র সমস্ত চিত্রগুলি উত্তেজক পিঁয়াজী রসে নিষিক্ত মনে হয়েছে। এমন কার্য-কারণবিহীন জীবন-স্রোত, প্রকৃত বাস্তবতার দাবী করতে পারে না। শুধু সমাজে এই ধরণের কতগুলো জীব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে বলেই তা বাস্তব নয়। ব্যাপক সমাজপরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং সেইসকল পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব রয়েছে—তার যথার্থ মূল্য নিরূপণ না করা পর্য্যন্ত প্রকৃত কোন বাস্তবচিত্র বা চরিত্রসৃষ্টি করা সম্ভব নয়। যদিও বিশ-তিরিশ দশকের লেখকদের অনেকের লেখায়ই অবদমিত শ্রেণী এসেছে কিন্তু সামাজিক দ্বন্দ্ব (অর্থনৈতিক ভিত্তিতে) বোধ হয় অনেকের লেখায়ই পরিস্ফুট নয়। কিছুদিন লেখার পরই এদের অনেকেই আবার উচ্চবিত্ত ঘরের চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বিত্তশালী মধ্যবিত্তের নোংরামী নিয়ে সাহিত্য রচনার চেষ্টা করেছেন। এতে করে দেখা যাচ্ছে, বিকৃতমনা চরিত্র বেশী পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বিকৃত মনের পরিচয় দিয়ে ওরা বুর্জোয়াদের জঘন্য মানসিক উন্মাদনার পরিচয় দিয়েছেন সত্য। কিন্তু যেখান থেকে সমাজবিপ্লবের চিন্তাধারাটি মুক্তি পেতে পারে সেই সব উৎস কৌশলে এড়িয়ে গেছেন।

"কল্লোল গোষ্ঠির লেখকরাই স্কাণ্ডিনেভিয়, ফরাসী ও রুশ গল্পের প্রেরণায় বাংলা গল্পের আকাশে নতুন রঙ-রেখায় জীবনের নতুন চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হলেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে (১৩৩০ বঙ্গাব্দ) কল্লোল-পত্রিকার জন্ম তারিখ। বাংলা ছোট গল্পে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের মত এই বছরটিও তাৎপর্যপূর্ণ। কেবল ভৌগোলিক পরিধির প্রসারে ও বিস্তৃতিতে নয়, অন্তর-মানসের সংকীর্ণ সীমা লঙ্ঘন করে, অর্থ-নৈতিক জীবনের ব্যাখ্যায় নতুন ভাবে মূল্য নিরূপণে এঁরা উদ্যত হলেন। অবশ্যই রোমান্টিক নৈরাশ্যবোধ তিরিশের যুগের গল্পের প্রধান সম্বল। কিন্তু দুনিয়াব্যাপী কেবল অর্থনৈতিক সংকট নয়, মানসিক সংকটের প্রবল আবর্তে পড়ে জীবনের প্রচলিত মূল্য-বোধের বিপর্যয়, সনাতন প্রত্যয়গুলির অপঘাতমৃত্যু, বুদ্ধিজীবীর আশ্রয়চ্যুতি—সব মিলিয়েই একটা যুগান্তরের সূচনা করল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলেই পরপর এইসব সংকট দেখা গেল। তিরিশের যুগের বাংলা ছোট গল্পে তার আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল। .

* * * * *

রোমান্টিক নৈরাশ্যবোধ ও বোহেমিয়ান জীবনানুরাগের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে জীবনের তীব্রতিক্ত নির্মম আস্বাদন ও অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে ব্যক্তির নব মূল্যায়ন। ইওরোপের আকাশ বাংলা গল্পের আকাশে রঙ ফেলল, নোতুন মেঘে নোতুন সব ছবি দেখা গেল। মানবিকতা এই পর্বের গল্পের প্রধান কথা।"[১]

আমাদের পূর্বোক্ত মন্তব্যের সমর্থনে এই উক্তিটি উদ্ধৃত করলাম। তার কারণ বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠক সমাজের

[১] কথা সাহিত্য—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৩১—জিজ্ঞাসা

অনেকেরই ধারণা যে এই সাহিত্যিকগোষ্ঠী বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি ভয়ঙ্কর প্রগতিমূলক আন্দোলন এনেছেন। বহু সমালোচক এইভাবেই 'কল্লোল' 'কালিকলম' ও 'প্রগতি' (ঢাকা) যুগের সাহিত্যকে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু একথা কেউ বলেননি যে, এর জন্মকোষ্ঠী বিচার মুখ্যত ইয়োরোপীয় নৈরাশ্যবাদের বিচার। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর ইউরোপীয় সাহিত্য যেভাবে নৈরাশ্য কণ্টকিত হয়ে উঠেছিল ঠিক সেইভাবে আমাদের তরুণসম্প্রদায়ের লেখকরা নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন হয়ে কলম ধরেছিলেন। সাহিত্যের এই নৈরাশ্যবাদ শেষ পর্যন্ত যৌন বাসনালিপ্ত মন নিয়ে নায়কের মধ্যে দেখা দেয়।

সাধারণ জনসমাজ যখন রুটির উদ্দেশ্যে গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে তখন তাদের পূর্বসংস্কার বর্জন করতে বাধ্য হয়। একে একটি সামাজিক ব্যবহারবিধির পাট্যার্ন বলা যায় বা সামাজিক ছক বলা যায়। এই ছকটি ইতিপূর্বেও স্বীকৃতি লাভ করেছিল সমাজে, তার প্রমাণ হল এই সাধারণ প্রচলিত প্রবাদ বাক্যটি, 'প্রবাসে নিয়ম নাস্তি।' এই কথাটির মূল উৎস কি আমাদের জানা নেই। গ্রামের শিক্ষিত মানুষ এই আপ্ত বাক্যটি নানাদিক থেকে বিবেচনা করেই ব্যবহার করেন। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে বিদেশে, বিশেষত শহরজাতীয় বিদেশে, ঠিক অভ্যস্ত নিয়মকানুন মেনে চলা যায় না। তাই নানা কারণে ধর্মবিশ্বাসকে, সামাজিক মনোবৃত্তি ও আচার-আচরণকে অভ্যস্ত চিন্তা থেকে একটু অন্যতর করে দেখতে হয়। দেশে যে মাটি দিয়ে শিবলিঙ্গ তৈরী হত এবং নিত্য সেবা পাবার পর যাকে ফুল বেলপাতা সহযোগে পুকুরের জলে বিসর্জন দেয়া হতো সেই শিবঠাকুর গড়তে গেলে নগরে, বিশেষ করে কলকাতা নগরে, গঙ্গামাটি কিনে গড়তে হয়।

হিন্দু সমাজে আগে গোঁড়া ব্রাহ্মণরা চা পান করতেন না, যখন চা পানের প্রচলন ক্রমবর্ধমান তখন এক পা এগিয়ে চা

খেতে শুরু করেন, তবে সেটা পাথরের বাটিতে। উপস্থিত ক্ষেত্রে 'ম্লেচ্ছ' আবহাওয়ায় পাথরের বাটিটাই শুদ্ধ। অথচ একথা তিনি মনে-মনে কখনই স্বীকার করবেন না যে, পাথরের ব্যবহার মিশ্র-ধাতু ব্যবহারের আগের যুগে। এই ঐতিহাসিকতার পৌর্বাপর্য সেকালে কারুরই সামাজিক মনে স্থান পায়নি, শুদ্ধ বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তিতে আঘাত লাগেনি। কালাকালের বিচার না করে অভ্যাসের বশেই শুদ্ধাচারীরা শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার করেন। কিন্তু শুদ্ধ বোধও শহরে এসে চিড় খায় এবং সেই মানুষই চায়ের পেয়ালায় (পটারীতে প্রস্তুত দ্রব্য) চা পান করে। অতএব দেখা যাচ্ছে সামাজিক ছক ভাঙ্গা এবং গড়ার মধ্যে সামাজিক মানুষের ভৌগোলিক (এখানে গ্রাম অর্থে) সীমা লঙ্ঘন এবং সেই সীমা লঙ্ঘনের মুখ্য কারণই হল অর্থনৈতিক স্বার্থ। মানুষ যে ভ্রাম্যমান হয় তা আহারের সন্ধানেই—এটা মৌল কারণ। কিন্তু ভ্রাম্যমানতা প্রথা হিসেবে যখন দেখা দেয় তখন সেটা সামাজিক কারণ। ধর্মীয় প্রথা অবশ্যি এ সবের মধ্যে অর্থাৎ ভ্রাম্যমানতার মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে, আবার কোন-কোন সময় খুব মুখ্যভাবে যে না আছে এমন নয়। 'বেদে'র নায়ক ভাবালুতার বশে বলে যাচ্ছে"—রাস্তা খুঁড়েছি, বস্তা টেনেছি, মোটরে-মোটরে টক্কর লাগিয়েছি, চাকরীর উমেদার হয়ে পথে জিরিয়ে-জিরিয়ে পায়চারি করেছি। একবার লাঙলও ধরেছিলাম বাগিয়ে।"[২] অর্থাৎ জীবনযাত্রা নির্বাহ করার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রম ও সামাজিক স্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম সে করেছে। কিন্তু এখানে বিচার্য বিষয় সামাজিক শ্রমের স্তর নয়, দেখতে হবে কি মন নিয়ে এই স্তরগুলো তিনি অতিক্রম করেছেন। অচিন্ত্যবাবু যে বয়সে এই বইখানি লিখেছেন বলে দাবী করেছেন সে বয়সে

অচিন্ত্যগ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড):আনন্দধারা প্রকাশন, পৃষ্ঠা ১২৬

জীবনের অতি জটিল বিচিত্র রূপ গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায় না। ও বয়সে লগিতে ভর দিয়ে ডিঙি নৌকো বা তালের ডোঙা বেয়ে চলা যায়, দড়ি-দড়া, মাঝি-মাল্লা শুদ্ধ পাল খাটানো বিরাট নৌকোর হাল ধরা যায় না। এখানে লেখক হিসেবে অচিন্ত্যবাবু কালের কাছে বন্দী না হয়েই পারেন না। সমাজের গভীরে নির্মম সংঘাত কোথায় যে কিরূপ সৃষ্টি করছে, এর মূল দ্বন্দ্বটা কোথায়? সে কি সমাজ-অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে নিহিত রয়েছে, না আর কিছু? তা ঐ বয়সে উপলব্ধি করার মত নয়। এবং এ নিয়ে আমরা কোন অভিযোগ করতাম না, যদি না লেখক পরিণত বয়সে নিজে এর সংস্করণের ভূমিকায় এই কথাগুলো লিখতেন। তিনি কাঁচা বয়সের কাঁচা লেখাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে সাহিত্যের স্বয়ম্ভূ সাজতে চাইছেন। "এক ঘাট থেকে আর এক ঘাটে—রহস্যঘন তটরেখা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে নদীর মত প্রবাহিত যার জীবন সেই তো বেদে"[৩] এ মন্তব্যগুলো লেখকের পরিণত বয়সের নিজস্ব বিচারের। নিজের অপরিণত রসবোধ ও চরিত্র সৃষ্টির পঙ্গু চেষ্টাকে একটা সাহিত্যিক ও দার্শনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবার তিনি চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যের সমালোচক একে গ্রহণ করবেন না। রবীন্দ্রনাথের যে চিঠি উদ্ধৃত করে 'বেদে'র সাহিত্যিক মর্যাদা নেবার চেষ্টা হচ্ছে, সে চিঠির মধ্যেও অপরিণত সৃষ্টির ইঙ্গিত আছে। মনে হয় কবি খানিকটা বৃদ্ধ বয়সের দুর্বলতার জন্যই পত্র লিখেছেন। তবু তিনি একেবারে না বলেই পারেননি যে "তোমার বর্ণিত চরিত্র মাঝে মাঝে যে রকম করে এ সম্বন্ধে ভাব প্রকাশ করেচে তাতে মনে হয়েচে তুমি যেন নিজে গায় পড়ে

৩. অচিন্ত্য গ্রন্থাবলী—আনন্দধারা প্রকাশন (১ম খণ্ড) ভূমিকা—পৃঃ ৩

তাদের উপর এই জিনিসটা আরোপ করেচ—মনে করেচ এটা শোনাবে ভালো"[৪]

কাজেই গুণ বিচারের দিক থেকে অচিন্ত্যবাবু যে 'বেদে'র মর্যাদার দাবী করেছেন তা টেঁকে না।

'বেদে' বইখানিতে নিম্নমধ্যবিত্তের বিলম্বিত দীর্ঘশ্বাসের মত একটানা একটা বিষাদ বয়ে যাচ্ছে। এই বিলম্বিত একটানা দীর্ঘশ্বাসের খাঁজে-খাঁজে কিছু তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে বটে, তা এই সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়। যেন মনে হচ্ছে টেনে-বুনে সেই পরাজিতের সান্ত্বনার মধ্যে নিজেকে ফেলে দেওয়া। শিক্ষিত intellectual চরিত্রের উদ্দাম কল্পনাকে কিভাবে প্রভাবপুষ্ট একটি স্বপ্নে পরিণত করা হয়েছে তা নীচের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাবে।

> "তাকের বইগুলি অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের করতলের মতো সস্নেহে স্পর্শ করে ও বলে বিভোরের মতো—বাঙলার কোনে বসে বিপুল জগতের সঙ্গে কথা কই, টলষ্টয় মেঝের ওপর পা ছড়িয়ে বসে—ডস্টয়ভস্কি কাঁধের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে মধুর করে হাসে, রাতের খাবারটুকু গোর্কির সঙ্গে একত্র খাই ; হামস্থন হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে বসে বন্ধুর মতো গল্প করে যায়—জ্বরো কপালে বোয়ার তাঁর কোমল হাতখানি বুলিয়ে দেয়—নীল সাগরের কল্লোলিত মায়া তাঁর চোখে, ফ্রাঁস কতদিন আমার এই ঘরে বসে জিরিয়ে গেছে। সেদিনত কালো ঝড়ো মেঘের মত ব্রাউনিঙ্ এসেছিল—সঙ্গে ব্যারেট, রুখু মাথা, রোগা চোখে অপূর্ব বিষণ্ণতা! ঘরে ঢুকেই বললে—আমাদের একটু জায়গা দিতে পার এখানে? কত দূর থেকে পালিয়ে এসেছি। তিনজনে মেঝের

৪। অচিন্ত্য গ্রন্থাবলী, আনন্দধারা প্রকাশন (রবীন্দ্র পত্র) পৃঃ ১৫৫।

ওপর বসে কত গল্প করলাম আমার ঘর যেন ইটালি! সব স্বপ্ন।"৫

এই কল্পনার মধ্যে যেমনি নিম্নমধ্যবিত্তের স্বপ্নের বিষাদের সুর আছে, তেমনি আছে বাস্তব জীবন পরীক্ষা না করেই স্বপ্নের জগতে ঠাঁই নেয়া। বাইরে থেকে যতই বাধা আসছে ততই ভিতরে মন ঢুকে আশ্রয়স্থল খুঁজে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে প্রকৃত চরিত্রের কোন সম্বন্ধ নেই।

অথচ চরিত্রগুলিকে 'পথ বেঁধে দিল বন্ধহীন গ্রন্থি'র মত করে সাজিয়ে দেখাবার চেষ্টা আছে। আসলে সেটা চেষ্টাই মাত্র। কেননা নিম্নমধ্যবিত্তের মনের ছাপ আসল নায়কচরিত্রের মধ্যে রয়েছে। এবং নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের লোকেরা যে সাময়িক ঔদাসীন্য রোগে ভোগে তারও বহু দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। মনের নিভৃত কোনটি স্বাধীন স্বাচ্ছন্দ্য বিলাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট, নিশ্চিন্ত গৃহবাস, পারিবারিক সুখ অথবা সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য তৈরী হয়েই থাকে। নিম্নমধ্যবিত্তের মনে যে উচ্চস্তরে উঠে, স্বাধীন স্বাচ্ছন্দ্য জীবন সম্ভোগের স্পৃহা অবচেতন মনে সুপ্ত থাকে তা অতি ধীরে, এমন কি নায়কের সচেতন ঔদাসীন্য ও ভাব বিলাসিতার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও— প্রকাশ পেয়েছে। তার দৃষ্টান্তই এই 'বেদে'র নায়ক। এই বিভিন্ন বিচিত্র স্বাদ ভোগের মধ্যে, বহুতর অবচেতন ইচ্ছার মধ্যে একটি হল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণের ব্যাকুলতা। এইসব তথাকথিত সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশার পাট চুকিয়ে দিয়ে নায়ক ('বেদে'র নায়ক) চলে এলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। কেননা একটা ভাল ছাঁচের ডিগ্রি ভবিষ্যৎ সমাজ জীবন নিরাপত্তার পক্ষে অপরিহার্য। কাজেই সমাজ পরিবেশের নব-নব পত্র বিন্যাস চলতে লাগল। ভেবে দেখুন, যে জীবন স্কুলপালানো আর অকালপক্ক প্রেম থেকে

৫। অচিন্ত্য গ্রন্থাবলী—আনন্দধারা প্রকাশন (১ম খণ্ড) পৃষ্ঠা ১৩০।

শুরু হয়েছিল সেই জীবন কয়েক ঘাটে ঘোলা জল খেয়ে সটান চলে এল বিশ্ববিদ্যালয়ে, এইটেই কি 'বেদে' বৃত্তি জীবনের পরিণতি ?

নিম্ন মধ্যবিত্তের মনে এটা সাময়িক উদাসীনতা ও ভবঘুরেমির একটা সাময়িক মানসিক বিলাসের পর্যায় মাত্র। এই পর্যায় উত্তীর্ণ হলে এই চরিত্রগুলো অস্বাভাবিক আসক্তিপ্রবণ হয়ে পড়ে। এ আসল নিম্নমধ্যবিত্তের চরিত্র নয়। শ্রেণী হিসেবেই এদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হল কোন কিছুতে শিকড়গড়া। কোনক্রমে স্থিতস্বার্থের সঙ্গে আপোষ-রফা করে বেঁচেবর্তে থাকা। কিন্তু সামাজিক পরিবেশ এতই আক্রমণশীল যে সেই নিম্নমধ্যবিত্তকে ঠেলে একেবারে মেহনতী মানুষের পাশে এনে দাঁড় করায়। শেষে সে শোষণের ভোগ্যবস্তু হয়ে পড়ে। কিন্তু 'শিকড়'গড়ার রূপটি হয়ত বৃহত্তর সমাজ-সমর্থিত না-হতে পারে। তার বিচিত্রতার মধ্যে হয়ত নানাবিধ ভাবের খেলাও থাকতে পারে। পানওয়ালীর মুখ দিয়ে যেসব কথা নায়কের সম্বন্ধে বেরিয়েছে, সে-ও সেই ভবিষ্যৎ সুখের ছবির কথা। 'বেদে'র নায়কের মধ্যে আছে সৌখীন মজদুরীর ভাব, কোন একটা বিশেষ ধরনের শ্রমিক জীবন গ্রহণ না-করা বা তার গভীরে প্রবেশ করে সমাজ-অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের তত্ত্বটুকু গ্রহণ না করা—এ হচ্ছে পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয়। 'বেদে'র নায়কের কাছে এই পলায়নী মনোবৃত্তির অজস্র পরিচয় পাওয়া যায়। নিষ্পেষণ নিপীড়নের অব্যবহিত ফল হিসেবে যে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্মলাভ হয় তারও কোন পরিচয় এখানে নেই। আর নেই বলে কোন অভিযোগ করছিনা। শুধু বলছি সমাজবাস্তববাদী প্রগতি সাহিত্য এ নয়। তবু কিছু অভিযোগ মনে তখনই ওঠে, যখন স্বয়ং লেখক আগ বাড়িয়ে রসবেত্তা পাঠক সমাজের কাছে বিশেষ দাবী করে বসেন। এই দাবীর কৌতুকাবহ দিকটি হল বিশ-তিরিশের যুগে অচিন্ত্যবাবুরাই প্রগতিশীল লেখক বলে দাবী করেছেন। শুধু

দাবী নয় বুক ফুলিয়ে পাঠক সমাজের কাছে নিজেদের জাহির করেছেন। এই দাবীর সারবত্তা সম্বন্ধে আজ সন্দেহ এসেছে মানুষের মনে। আর তাছাড়া প্রগতিবাদেরও একটা তত্ত্বগত বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে, দৃষ্টিভঙ্গীর ত কথাই নেই !

'বিশ-তিরিশে'র যুগে 'বেদে', 'যাযাবর', 'অসাধু সিদ্ধার্থ' ও 'পথিক' শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল। এর অনেকটা যে নরওয়েজীয় সাহিত্যের প্রভাবে তা হয়ত অনেকেই স্বীকার করবেন। এখানে 'প্রভাব' কথাটা আমি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করছি না, বরং ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করছি। তার কারণ বাঙ্গালার কথাসাহিত্য তখন 'দুয়ার হইতে বাহিরে' চলে গেছে। তৎকালীন তরুণ লেখকেরা বাঙ্গালার কথাসাহিত্যের উন্মুক্ত দুয়ার থেকে একেবারে বাহির বিশ্বে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সাহিত্যের এলাকাটা কল্লোলগর্জী সাগরের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার এই যে সাহস সেইটেই হল সৃজনশীল মনের পরিচয়। যদিও তাদের ভরসা ছিল মাত্র ডিঙি নৌকো। কিন্তু এদেশের বহু ইতিহাস আছে সাগর-ভ্রমণে ডিঙি নৌকোর যাত্রা। কিন্তু 'বেদে' 'যাযাবর' 'অসাধু সিদ্ধার্থ' 'পথিক' কথাসাহিত্যে একটি বৃহত্তর সমাজ পরিপ্রেক্ষিত যে রচনা করেছিল সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। এই সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতের পরিচয় ইতিপূর্বে বড় একটা দেখা যায় নি। অবিশ্যি এদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'র শ্রেণী আলাদা বলতে হবে। 'বেদে'তে চরিত্র আসেনি এসেছে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ছোটখাট ঘটনার পরিধি মাত্র। এবং সে পরিধি অনেক ক্ষেত্রে সুন্দর চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু লেখক নৈর্ব্যক্তিক নয় বলে সৃষ্টির অন্তরে জ্বালা রয়েছে।

এখানে সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে 'জ্বালা' কথাটির বিশেষ মূল্য আছে। আমরা এর দ্বারা একটি attitudeকে—অর্থাৎ মনোভাব বা বিশেষ একটি মনোভঙ্গীকে বোঝবার চেষ্টা করছি। অপরিণত বয়সের লেখাতে যেমন মনের ঝাল আপনা থেকেই বেরিয়ে আসতে চায় তেমনই চরিত্র চিত্রণ ও তার পারিপার্শ্বিক ঘটনার সঠিক বিন্যাসও সম্ভব নয়। বস্তুত পারিপার্শ্বিক ঘটনা সমাজ-বিজ্ঞান বিশেষ, তাকে শুধু মাত্র ভাবালুতার দ্বারা বিচার করলে চলবে না। অথচ আমাদের দেশের সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায়শই দেখা যায় যে, এই সমাজ-বিজ্ঞানের পথটি তাঁরা এড়িয়ে যান। চরিত্রের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্যে যে সমাজ-বিজ্ঞানের বীজটি উপ্ত হয়ে আছে তাকে হয় ইঙ্গিতে, না হয় বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে হবে। পাঠক চরিত্রের মূলসূত্র সেখান থেকে পাবেন। তাহলেই সমগ্র চরিত্র রচনার মধ্য দিয়ে কার্যকারণ শৃঙ্খলাটি ফুটে উঠবে। সমাজ পরিপ্রেক্ষিত বলতে আমরা যা বুঝি তার সমগ্র উপাদানটি এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। সাহিত্যে চরিত্র বলতে আমরা যা বুঝি তাহলে কতগুলো সুসম্বদ্ধ প্রতিক্রিয়া যার ক্রিয়াটি ঘটে চরিত্রের নিজস্ব শ্রেণীমনোভাব বা সামাজিক বৃত্তির মধ্যে। চরিত্র নিজে সেই বাহ্য সামাজিক বৃত্তির ক্রিয়াটিকে খুব নিবিড় ভাবে গ্রহণ করে যে প্রতিক্রিয়ার প্রদর্শনী আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরে সেইটেই হল চরিত্র। তাছাড়া অন্য কিছু নেই। বিশেষ বাহ্য ঘটনায় বিশেষভাবে প্রতিক্রিয়ার প্রদর্শনীই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এখানে নর নারীর দেহগত সৌন্দর্য ও শ্রেণীগত মানসিকতা নানা বিচিত্রবর্ণে ফুটে ওঠে। বঙ্কিমের যুগে গোবিন্দলাল যে দৈহিক সৌন্দর্য ও সামাজিক বিলাসিতার

মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল এ যুগে সমাজ-বিপ্লবের পর সেই সৌন্দর্য ও সামাজিক বিলাসিতার পরিচয় নায়কের ক্ষেত্রে না থাকলেও চলতে পারে। সামাজিক জীবনের বিশেষ একটি চৌহদ্দির মধ্যে মনের সূক্ষ্ম এবং জটিল প্রতিক্রিয়া ফুটিয়ে তোলাই সেকালের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল। আজকের যুগের নারী 'ভ্রমরে'র মত সামাজিক ও পারিবারিক পরিস্থিতেতে পড়লে কোর্ট-কাছারী করে নিষ্কৃতি পেতো। অথবা অমনি বেরিয়ে যেতো। একালের লেখকরা পরিবারকে সমাজসংলগ্ন একটি ইউনিট বলে মনে করেন। এক ইউনিট থেকে ভেঙ্গে অন্য ইউনিটে চলে যাওয়াকে একটি অতি স্বাভাবিক সমাজ-কর্ম্ম বলে ওরা মনে করেন। বর্তমানের এই ইউনিট-পন্থী সমাজ এককালে সুদৃঢ় সমাজ গোষ্ঠী ছিল। এবং এক-একটি পরিবার সৃষ্টি ও তার সাংস্কৃতিক মর্যাদা সৃষ্টি--এ পরিণতি লাভ করতে কয়েকটি বংশ চলে যেতো। এই কলকাতা শহরের যেসব বনেদী পরিবার সৃষ্টি হয়েছিল এবং যাদের সামাজিক মর্যাদা ও সাংস্কৃতিক সৌধ কৃষি অর্থনীতির ওপর রচিত হয়েছিল— তাদের প্রত্যেককেই মৌমাছির মত তিলে-তিলে সুরম্য মৌচাক গড়ে তুলতে হয়েছিল। সেকালের কাল প্রবাহ এত দ্রুত চলত না। তার কারণ কৃষি অর্থনীতি। কৃষি সম্পদ সৃষ্টি করতে কম করেও নব্বুই দিন লাগত। অর্থাৎ ভূস্বামী তার ধান-পান, জোত-জমা থেকে যে আয় পেতো, তা বেশ সময়সাপেক্ষ ছিল। কৃষি পণ্যকে কাঁচা পয়সায় রূপান্তরিত করে অবসরভোগী সামাজিক শ্রেণীকে খাজনা-পাতি দেয়া, একটু লম্বা ঢেউয়ের সময়ের প্রয়োজন। এই যে সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করা ও শ্রম শক্তির ধীর পদক্ষেপ,— ইত্যাদি কারণে উৎপাদন ব্যবস্থার সামগ্রিক ফলটা থিতোনো জলের মত ছিল। মানুষের মনও সেই ছাঁচে গড়ে উঠতো। 'আঠারো মাসে' বছর বলে মনে হতো। এর উল্টো স্রোত হল শিল্প বিপ্লব।

বাজার দরের অতি দ্রুত উত্থান-পতন, উৎপাদন-ব্যবস্থার যান্ত্রিকতার ফলে মানুষের জীবন, কর্ম ও মনোবৃত্তি দ্রুত পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে। কাজেই একালের 'ভ্রমরে'রা স্বামী গোবিন্দলালের সঙ্গে তিলমাত্র কোন্দল না করে ইবসেনের 'নোরা'র মত স্বামীর ঘর ছাড়তে দ্বিধা বোধ করে না। তার কারণ জীবনের মূল্যবোধ এক নোতুন ঢঙে দেখা দিয়েছে। এই ভঙ্গিমার মধ্যে তথাকথিত মানব মুক্তির স্বাদ আছে বটে, কিন্তু সামাজিক দায়িত্ব বোধেরও অভাব আছে। নারী এবং পুরুষের সম্বন্ধ যেখানে অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার ওপর স্থিতিবান সেখানের মনের বিকাশ এক ধরণের, আর যেখানে অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতা রয়েছে মনের বিকাশ সেখানে অন্য ধরণের। এই বিভিন্নতা বর্তমান শিল্প-বিপ্লব পরিপুষ্ট সমাজের দান। আর এর শ্রেণী সংস্থান যেখানে রয়েছে সেখানে দ্বন্দ্বও রয়েছে। কিন্তু সেটা কোন পর্যায় রয়েছে তা নির্ভর করে চেতনার গতিমুখরতার ওপর। চরিত্রকে চেতনা দিয়ে ভরপুর করে দেওয়া চলে কিন্তু যেটা বিকাশ লাভ করে না তা হচ্ছে এই চেতনার সূত্র যেখানে রয়েছে, সেই সমাজ-অর্থনৈতিক সংস্থান। সামগ্রিক জীবন বিচারে সমাজ-অর্থনৈতিক-সংস্থান—তার সর্পিল ধারা বিশেষভাবে চরিত্রের ক্রমিক বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বিশ-তিরিশের সাহিত্যের চরিত্রগুলো এসেছে দুটো ধারা নিয়ে একদিকে ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া তথাকথিত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে, অপর দিকে শ্রেণী অবনমিত মানবের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা বিকাশের তিলমাত্র সুযোগ না দিয়েই একটা মেকিবাস্তব ভাবালুতাকে আশ্রয় করে। অবিশ্যি এর একটি কারণ ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় বৈদেশিক শক্তির স্থায়িত্ব। কিন্তু আমাদের সাহিত্যিক-গোষ্ঠীকে একথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে রাষ্ট্রের প্রকৃত পরিবর্তন মুখ্যত সাধারণ মানুষের—শ্রমজীবী শ্রেণীর অসীম বৈপ্লবিক

মনোবৃত্তির ে ের দিয়ে সম্ভব হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগের সাধারণ মানুষের অর্থাৎ শ্রমজীবী মানুষের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নেই তার অর্থ এই সব মানুষের কোন সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন ছিল না। স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোথায়-কোথায় বিদ্রোহ হয়েছে কিন্তু তা সমাজ চেতনার সামগ্রিক সত্তার দিক থেকে পর্যাপ্ত নয়। অবহেলিত অজস্র গাথার মধ্যে সেকালের সমাজ-চেতনা লুকিয়ে রয়েছে। তাদের উৎপাদন বৃত্তির ক্রিয়াকলাপ গাথার মধ্য দিয়ে মুক্তিলাভ করেছে।

> "ধান ফুরোল পান ফুরোল খাজনার উপায় কি
> আর ক'টা দিন সবুর কর রসুন বুনেছি।"

তবু বিশেষভাবে এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সমাজবাস্তববাদী সাহিত্যের অঙ্কুরোদগম সেই বিশ তিরিশের যুগ হয়েছিল। স্বর্গত সুরেন গোস্বামী প্রভৃতি অগ্রগামীরা এই সাহিত্য আন্দোলনের ভবিষ্যত বুঝতে পেরেছিলেন। তাই দরবারী সাহিত্যের বাঁধানো সড়ক ছেড়ে দিয়ে নতুন পথ সৃষ্টির কাজে তারা আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আজকের দিনে যাঁরা সমাজবাস্তববাদী সাহিত্য সৃষ্টি করবেন তাদের পথ অনেকটা কণ্টকমুক্ত। আজকে অবিশ্যি ভিয়েৎনামের মুক্তি যুদ্ধ বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন মানুষের মনে একটা আশার আলো এনেছে। সেকালেও স্পেনের গৃহযুদ্ধ বিপ্লবী চেতনা-সম্পন্ন মানুষের মনে অনেক আশার সৃষ্টি করেছিল। শ্রেণী সংঘর্ষ, রাষ্ট্রিক বিপর্যয় মানুষের মনে সত্যিকারের সমাজবোধ সৃষ্টি করে, এবং সেইটেই সমাজবাস্তববাদী সাহিত্য সৃষ্টির অনুকুল আবহাওয়া।

রাষ্ট্রিক বিপর্যয় ও সামাজিক চেতনাবিহীন মনোবৃত্তির অস্থিরতার যুগে 'চন্দ্রশেখর' 'আনন্দমঠ' ও 'দেবীচৌধুরাণী' সৃষ্টি সম্ভব। এই তিনটি উপন্যাসের মূলে রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ের ও সামাজিক বিপর্যয় চিহ্ন বর্তমান, যদিও আমরা যাকে শ্রেণী চেতনা বলি তা নেই, তবু একটি

সূত্র আছে বই কি, তা হচ্ছে সামন্ততন্ত্রী সমাজের অস্থিরতার সূত্র। কিন্তু কেন এই অস্থিরতা? রাষ্ট্রিক বিপর্যয় দেখা দিলে সামাজিক সম্পদের উৎপাদন-ব্যবস্থায় বিপর্যয় দেখা দেবেই, এবং তার ফলে সমাজ মনে অনিশ্চয়তা; বাজারে অতিক্রুত মূল্যমানের উত্থান-পতন দেখা দেবে। ইংরেজ এ দেশে আসবার আগে কোন শেয়ার বাজার ছিল না তাই শেয়ার বাজার দেখে যে উচ্চ সমাজের মানসিক সূচীর পরিচয় পাওয়া যাবে। তবু এটা বোঝা যায় যে সামন্ততন্ত্র-এর অর্থনীতি ভেঙ্গে বৈদেশিক প্রথায় যৌথ কারবার, কৃষি দ্রব্যের নতুন বাজার তৈরীর আপ্রাণ চেষ্টার ফলে সাধারণ চাষী সমাজের মধ্যে অনিশ্চয়তা এবং এই কৃষি উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে যে সব শ্রেণী সংলগ্ন হয়েছিল বা যাদের সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, ঐ উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল—তারাই এই অনিশ্চয়তার কবলে পড়েছিল। কাজেই সে যুগে হয়ত আজকের মত সচেতনতা ছিল না। কিন্তু স্থিতিশীলতাবিহীন জীবন ধারা থেকে কোন শ্রেণীই বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি। বঙ্কিমকে সেই অস্থিরতার সামাজিক ধারাটি খুঁজে বের করতে হয়েছে, যার ফলে 'চন্দ্রশেখর' 'আনন্দমঠ' 'দেবী চৌধুরাণী' রচনা সম্ভব হয়েছে। এই সব সাহিত্যের মধ্যে বৈপ্লবিক চিন্তা ধারা নেই কিন্তু মানব জীবনের, সমাজ জীবনের যে অস্থিরতার বিন্যাস বঙ্কিম করেছেন তা আজকের যুগের পূর্বগামী বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। এটা আমাদের সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে, সমাজ একটা চলিষ্ণু ঘটনা প্রবাহের মত। এক তরঙ্গ আর এক তরঙ্গকে বিরোধী হয়ে সংঘাত করছে, এবং সেই সংঘাত সামাজিক শক্তি সৃষ্টি করছে।

যখন সংঘাতটা তীব্র ও প্রবল হতে থাকে, তখনই আমরা সমাজ বিপ্লবের আসল চেহারা দেখতে পাই। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে বঙ্কিমের যুগে সমাজচেতনার ঝোঁকটা ছিল

স্থিতিশীলতার দিকে। কিন্তু তাকে অর্থাৎ বঙ্কিমকে লিখতে হয়েছে চঞ্চল অস্থির যুগের কথা। এটেই সেকালের শাসক শ্রেণীর স্ব-বিরোধ। আর একালে? বঙ্কিমের কাল থেকে অর্জিত স্থিতিশীলতা, আর মেহনতী মানুষের যে অতি দুঃসহ সামাজিক নিরাপত্তাহীন অস্থিরতা, এর ব্যবধানকে ঘুচিয়ে ফেলে নতুন সমাজ ব্যবস্থার আবির্ভাব সহজতর করে তোলাই হচ্ছে সাহিত্যের, বিশেষকরে সমাজবাস্তববাদী সাহিত্যের, মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু এ জাতীয় সাহিত্য কখনই আন্দোলনের পেছনে থাকতে পারে না। তাকে সংগ্রাম-আন্দোলনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। যাদুঘর থেকে চরিত্র আনতে হবে না। চরিত্র আসবে সংগ্রামের ভিতর থেকে। কাজেই এ সাহিত্য সৃষ্টি, রুচির বিচারে প্রচলিত বুর্জোয়া সাহিত্যের ধারায় কখনই হবে না। চিরাচরিত দৃষ্টি ভঙ্গীকে আঘাত করেই এদের আবির্ভাব সম্ভব হবে। কিন্তু লেখককে যেখানে সতর্ক প্রহরীর মত জেগে থাকতে হবে, তা হচ্ছে শিল্প সৃষ্টির রস বোধ। এই রসবোধের নতুন স্বাদ সৃষ্টি করাই সংগ্রামী সাহিত্যের আর একটি দিক। সেখানে সচেতনভাবে সমাজ পারিপার্শ্বিক থাকবে, বাস্তবতার আস্তরণ থেকে রসের একটি সূক্ষ্ম ধারা বইবে। অবিশ্যি এই রসধারা সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ আছে।

ইতিপূর্বে আমরা যে সমাজ ইউনিটের কথা উল্লেখ করেছি, এইবার তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে। গ্রাম ভেঙ্গে শহর, শহর বিকেন্দ্রীভূত হয়ে পাড়া, পাড়া-বিকেন্দ্রীভূত হয়ে মেস, হোটেল, এক ধরণের ব্যারাক বাড়ি। সমাজ জীবনের পরিচয়ের গণ্ডিটা একদিকে যেমন সঙ্কীর্ণ হয়েই আসছে এবং ইউনিট পর্যায়ে পরিণত হয়েছে তেমনি এর বিপরীতগামী আর একটি স্রোত আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেই স্রোতটি এদেশে এবং ওদেশের

সাহিত্যে ছায়া ফেলেছে, প্রভাব বিস্তার করছে—তা শুধু নয় স্রোতের উন্মুখর মূর্তি ব্যক্তিতে রূপ নিয়ে সাহিত্যের নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। জন ও জনতা দুটি ভিন্ন প্রকৃতির সামাজিক মানুষের আবির্ভাব হয়েছে। যেখানে গোষ্ঠী, সেখানে জনতা এসেছে। তাদের সামগ্রিকভাবে যা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে একটা প্রগতিমূলক কর্মকাণ্ড। অর্থাৎ যখন জন ছেড়ে জনতার আবির্ভাব হল তখন কর্মশীলতা মুক্তি পেল। চিত্রে এই জাতীয় প্রগতিশীলতা, গতিমুখরতা দেখানো সম্ভব এবং তার রূপ রেখা মনের ওপরে বেশ ছাপ রেখে যায়। কিন্তু জনতার কর্মশীলতা বা সঙ্ঘবদ্ধ কর্মশীলতা যখন সামাজিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠতে চায় তখন তাকে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন, বিশেষ একটি মনোভাবের দ্যোতক হিসেবে দেখতে হবে। সাহিত্যে বিশেষ করে সমাজবাস্তববাদী সাহিত্যেই, কর্মশীলতার স্থান আছে বলতে হবে। কোন ধর্মঘটের চিত্র নিখুঁতভাবে যদি কোন কথা সাহিত্যের মধ্যে স্থান পায় তবে দেখা যাবে যে সেখানে ব্যক্তির বড় একটা স্থান নেই। এমন কি ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যেরও তেমন কোন স্থান নেই। ঐক্যতান বাদ্যে সবার সঙ্গে সুর মিলিয়ে একটি সুর। সেই সুরটা আপনা থেকেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্র। সেই সুরটাই বিশিষ্টতা লাভ করে ব্যক্তির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ব্যক্তির এই সমাজ সচেতনায় পরিপূর্ণ মনটি একটি বিশেষ চরিত্র হিসেবে দেখা দেবে। সাহিত্য রচনার বিষয় থেকেই তা প্রমাণিত হবে সমাজ ও ব্যক্তির স্থান কতটুকু। সমাজবোধ বিশেষ কোন অর্থনৈতিক কারণকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হবে, সেই সৃষ্ট-কারণগুলো পূর্ণতা লাভ করলেই এক-একটি সামাজিক বিপ্লবের ধাপ এগিয়ে যাবে। অবিরাম ও অবিচ্ছেদ্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই ক্রমগতি রূপ নেবে সাহিত্যের মধ্যে। প্রকৃতভাবে যদি চিত্রকে অর্থাৎ অবিরাম

অবিচ্ছেদ্য সংগ্রামকে বিভিন্ন চরিত্র চিত্রনের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারা যায় তবে মানুষকে এক নোতুন চেহারায় দেখতে পাওয়া যাবে। সামাজিক মানুষের পাশে-পাশে যে আন্দোলন বা তীব্র সংগ্রামের ঢেউ ভেসে উঠবে তা থেকে মানুষের নোতুন চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যাবে। আর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রেণী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠবে। একটা সংগ্রামকে আদি এবং মুখ্য বাস্তব ঘটনা ধরে নিয়ে—বা মেনে নিয়ে সামাজিক মানুষকে তার সামাজিক শ্রেণী সংস্থান বর্ণনা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ যেমন 'যোগাযোগে' দুই কূলের বৈশিষ্ট্য ও বিরোধ—একই শ্রেণীর মধ্যে দুই শাখার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন, অথচ বিরোধের বীজ সেখানে পুঁতে রেখেছেন, তেমনি করে শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব (আমরা স্ব-বিরোধ বলতে পারি) একটা মুখ্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে —এখানে 'ধর্ম্মঘট' একটা মুখ্য ঘটনা বলতে হবে—এক-এক ধরণের সমাজ সংগ্রামী মানুষকে রূপে রেখায় সৃষ্টি করতে হবে। সাহিত্যে বিশেষ করে গল্প বা উপন্যাস সাহিত্যে, এই জাতীয় চরিত্র, বুর্জোয়া সমাজের ভাব-ফানুস পাঠকরা গ্রহণ করতে চাইবে না। কেননা, তারা যে সমাজে বাস করে, তাদের দৈনন্দিন জীবনে যে জাতীয় ঘটনার আবির্ভাব ঘটে, তার মধ্যে সাধারণত এই জাতীয় ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় যা তাদের অর্থাৎ সেই শ্রেণীর অভিজ্ঞতার জগৎ—সংগ্রামী চরিত্র শ্রেণীর সঙ্গে ঠিক সদ্ভাব রেখে চলেনা। কাজেই পাঠক হিসেবে তারা রস পায় না। এই জাতীয় সাহিত্যের চরিত্রের মধ্যে রসের সন্ধান করতে না-পাবার পেছনে আর একটি সত্য নিহিত আছে। সেটিও বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে। সমাজ-জীবনের তীব্র সংগ্রামটি তাকে স্পর্শ করেনি। তার অর্থ আন্দোলনের ঢেউ সেই সামাজিক শ্রেণী জীবনের তীরে এসে আছাড় খেয়ে তীরকে ভাঙ্গতে পারেনি। এই

না-পারার ব্যর্থতাকেও সমাজবাস্তববাদী সাহিত্যের মধ্যে রূপ দিতে হবে। সার্থকতা সাক্ষ্য না-মেলার কারণ অনুসন্ধান বা নির্দ্দেশ করতে নয়। সমাজ-বিপ্লবে ব্যর্থতার স্থান আছে, শ্রেণী চরিত্র কিভাবে সমগ্র সমাজবিপ্লবকে ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে, কোন-কোন সময় এই বিপ্লবের স্রোতকে অবরুদ্ধ করে ব্যর্থ করেও দেয়। কিন্তু আবার অবদমিত মানুষের সক্রিয় সমাজ চেতনা নোতুন চরিত্র সৃষ্টি করে গতির মুখে সেই অবোরধকে ভেঙ্গে বেরিয়ে যায়। এই বাঁধ ভাঙ্গার কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রচুরই মেলে। কিন্তু সমাজবাস্তববাদী সাহিত্য সৃষ্টিতে সেই ইতিহাসের একটি স্ফূরণ বা ইঙ্গিতই যথেষ্ট। সেই ইঙ্গিত অনুসরণ করেই নোতুন চরিত্রের বিকাশ হবে, নোতুন সামাজিক মানবতাবোধ সৃষ্টি হবে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে চাঁদপুরে (কুমিল্লা, বর্ত্তমানে বাংলাদেশ) অতবড় একটা রেলষ্টীমার ধর্মঘট হয়ে গেল। সেখানে শোষিত চা কর্মীরা কিভাবে লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েছে এবং তারা যে প্রাণপাত করে একটি দুরূহ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, এর দুঃখবোধ ও অসীম দুঃখকষ্ট, তীব্র মানসিক যন্ত্রণা, অচিন্ত্যবাবুরা কলম ধরে চিত্রিত করলেন না। এটা যে একটা ঐতিহাসিক সত্য এবং শোষিত মানুষের জীবনে নির্মম ঘটনা—এর থেকে সাহিত্য রস নির্ঝর সৃষ্টি করার জন্য কিন্তু অচিন্ত্যবাবুদের দল এগিয়ে এলেন না। অথচ 'প্রগতি' বাদের ঝুড়ি মাথায় করে ওরাই নাকি সবার আগে বেরিয়েছেন। 'কল্লোল' বা 'কালিকলমের' জন্ম ঐ সব ঐতিহাসিক ঘটনার পরেই।

বর্তমান শিল্পবিপ্লবের যুগের সাহিত্যে ঘটনা নিজে-নিজেই কিছু নয়। যে-কোন সামাজিক ঘটনা তখনই বিশেষত্ব বা গুরুত্ব লাভ করে যখন সে কারণ হিসেবে ব্যক্তিকেন্দ্রীক না হয়ে সমাজকেন্দ্রীক হয়ে পড়ে। ইতিপূর্বকার যুগের সুখ-দুঃখ, ভালবাসা, বিরহ, বিচ্ছেদ,

ব্যক্তিকে এমন একটা প্রাধান্য দিয়েছে যে পাঠকের মনে হয়েছে মানবজীবনের এই ভাবসমূহ সমাজপরিধি বাদ দিয়ে কিছু হবে। তাই সাহিত্যিকেরা সমাজকে, বৃহত্তর সামাজিক শক্তিকে নেপথ্যে রেখে ব্যক্তির মনোবৃত্তিকে অযাচিত গুরুত্ব দিয়েছে। এবং শ্রেণীভেদে সুখ-দুঃখের ভাববিকাশ যে বিভিন্নতা তাও ভুলে গিয়ে একটি বিশেষ শ্রেণীর দুঃখের নিদানকে আদি এবং অকৃত্রিম বলে ধরে নিয়েছেন। ফলে কথাসাহিত্য সমাজ, বিশেষ করে শোষিত সাধারণ মানুষের বৃহত্তর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এই বিচ্ছিন্নতার অন্তরালে কতগুলো স্থিতস্বার্থ খেলা করে। সে খেলা বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই, শুধু সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণীর সংস্থানটি বিশ্লেষণ করলেই এই জাতীয় স্থিতস্বার্থের খেলা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র সামাজিক এবং পরের ইউনিট ‘পরিবার’ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক ধরা পড়ে না। এই নেপথ্য শক্তি সমস্ত চরিত্রের মূলে ক্রিয়া করে। এবং যারা শ্রেণী সচেতন লেখক নন তারা এই সব পরিস্থিতিতে নিজেদের অজ্ঞাতসারে আসল সমাজতাত্ত্বিক গুণটি এড়িয়ে যান। ফলে চরিত্রগুলির মধ্যে বৈপ্লবিক মনোবৃত্তির জন্ম নেয় না। বস্তুত আমাদের সাহিত্যের রস এইরূপ ঢাকা-চাপা দেওয়া চরিত্রের মধ্যেই মৃত্যু বরণ করে। বিশ-তিরিশের যুগে যে সামাজিক বনিয়াদ সাহিত্যে, বিশেষ করে কথাসাহিত্যের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে এসেছে তাতে অবক্ষয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। এই অবক্ষয় এত ব্যাপক, বিচিত্র ও গভীরভাবে দেখা দিয়েছে যে তাকে একটা যুগ ক্রিয়া বলা যেতে পারে। এই যুগ ক্রিয়া জাতীয় মানসিক চেতনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে সত্য, কিন্তু সমাজ বিপ্লবের বাণী বহন করেনি।

সাহিত্যের মধ্যে যে পাঠক, লেখক ও সমাজ সম্বন্ধ রয়েছে, তার বিচার এখানে না করাই ভাল। কেননা বিশ তিরিশের যুগের প্রথম শ্রেণীর লেখক গোষ্ঠী এই সম্বন্ধ বিচর নিয়ে মাথা ঘামান নি। আত্মকেন্দ্রিক লেখক সমাজ মনে করেন, তাদের চিন্তা বিন্যাস সমাজ মনকে গঠন করে। এবং তা সুঠাম ও সুষ্ঠুরূপেই করে। অর্থাৎ যে সমাজ পরিপ্রেক্ষিতের ওপর ভিত্তি করে লেখকদের চিন্তাস্রোত মুক্তিলাভ করে সেই বহিরাঙ্গের সমাজ পরিপ্রেক্ষিত ও সংশ্লিষ্ট পরিবেশকেই ওরা ভুলে যান। সমাজের বৃহত্তর সত্তা ও তার শ্রেণীদ্বন্দ্ব-কণ্টকিত সমাজ গোষ্ঠীর কি অবস্থা এসব ভুলে গিয়ে একটি ব্যক্তিকে বাছাই করে নেন। ভাবটা হল, বন থেকে ওদের মনের মত বাছাই করা একটি ফুল তুলে নিলেন। এবং বন থেকে যে ফুলটিকে (এখানে ব্যক্তি অর্থে) তোলা হল, তাকে বাছাই করা, ও তারমধ্যে রসের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা,—এটেই নাকি বিশেষ সাহিত্য কৃতিত্বের পরিচয়। আশ্চর্যের বিষয়, বনটি যে আছে এবং তার অসংখ্য লতাগুল্ম নিয়েই আছে, তার অস্তিত্বের কথা ওরা বেমালুম চেপে যান। বনের সমগ্রতার মধ্যেই ফুলটির প্রকৃতি পরিচয় রয়েছে। তার বাইরে তার পরিচয় রাখতে গেলে তা যে সীমাবদ্ধ ও পঙ্গু হয়ে পড়ে এ মতবাদ ওরা স্বীকার করেন না। এ এক ধরনের মনোজগতের বিচ্ছিন্নতাবাদ। ঐকিক জীবন ধর্মে আস্থাশীল শ্রেণীর মধ্যে মানসিক বিচ্ছিন্নতা-বাদের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবটি এই যে আমি আছি বলেই জগৎ ও সমাজ আছে। সমাজের সঙ্গে সব রকমের লেনদেন সম্পর্কের মধ্যে 'আমি' বাদকে বিস্তীর্ণ করে দেয়াই তাদের জীবন দর্শন। সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির ওপর অযাচিত, ও অবাস্তব নির্ভরশীলতা এর একটি বিশেষ কারণ। আরও বিভিন্ন কারণ সমষ্টি রয়েছে।

Dr. Mannheim তাঁর Man and Society নামক গ্রন্থে এর একটি উচ্চমার্গ গোষ্ঠিতন্ত্রের কারণ নির্দেশ করেছেন। আমাদের চিন্তাধারার সঙ্গে এর একটি গুণগত সম্পর্ক আছে বলেই আমরা তার একটি বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করছি।

"If one calls to mind the essential forms of selecting élites which up to the present have appeared on the historical scene, three principles can be distinguished : selection on the basis of *blood*, *property* and *achievement*. Aristocratic society, especially after it had entrenched itself, chose its élites primarily on the blood principle. Bourgeois society gradually introduced, as a supplement, the principle of wealth, a principle which also obtained for the intellectual élite, inasmuch as education was more or less available only to the offspring of the well to do." * এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে লেখক তিনটি সামাজিক স্তর নির্দেশ করেছেন—এবং এর প্রত্যেকটি স্তর গুণগত বিভিন্নতায় পর্যবসিত। এবং এও বেশ বোঝা যাচ্ছে যে ব্যক্তিকে ঘিরেই এইসব গুণগত বিভিন্নতার বিন্যাস। প্রথম স্তরে দেখা যাচ্ছে, রক্তশুদ্ধির আভিজাত্যের বিন্যাসের কথা লেখক বলেছেন। ধনতন্ত্রী অভিজাত সমাজে এই রক্তশুদ্ধির আভিজাত্য বিচার বোধ খুব প্রখর। দ্বিতীয় স্তর বিন্যাসে এলো সম্পত্তি—এটা হল একবারে নির্মম বাস্তব, এই নির্মম বাস্তব সত্যটা অর্থাৎ ধন-দৌলত-টাকাকড়ি যাঁদের যত বেশী

*Man and Society—p.-89—Dr. Mannheim : Quoted in "Notes towards the Definition of Culture by T. S. Eliot. : Chapter : The Class and the Elite p. 39.

পরিমাণ সঞ্চিত, তাঁরাই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে—সফলতার দাবী করতে পারেন। এবং এই সফলতার সূত্রেই elite নামক একটি গোষ্ঠীর মধ্যে এঁরা প্রবেশাধিকার পান। বস্তুত এটেই শ্রেণী বিন্যাসের ও elite গোষ্ঠী গঠনের ধারাবাহিক ক্রম। শ্রেণী রূপান্তরের এই অনিবার্য ধারাবাহিকতা শুধু মাত্র ব্যাহত হয় বৈপ্লবিক সমাজচেতনার কারণে।

ধনতন্ত্রী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সমাজের পরতে-পরতে এমন একটা সূক্ষ্ম সাংস্কৃতিক সূত্র দিয়ে গাঁট বাধা আছে, যা বাইরে থেকে বোঝা মুস্কিল। শুধু অনুভব করা যায়, এর একটির সঙ্গে আর একটি খুব সূক্ষ্মভাবে জড়িয়ে আছে। কাজেই একটি স্তরে তথা-কথিত সফলতার কথা উঠেছে। সফলতা যেমন অনুভব করা যায় তেমন বাহ্য দৃশ্যমান বস্তুর মত এ অনেকটা জাজ্জল্যমান। 'achievement' কথাটি এখানে বিশেষ অর্থবহ। এর প্রয়োগও বিশেষ অর্থে হয়েছে। পারিবারিক ভিত্তিতে যেমন রক্তের শুদ্ধতা দরকার তেমন সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে একটা উজ্জ্বলতম সফলতার প্রয়োজন। ভূ-সম্পত্তি, ধনদৌলত নিয়ে সমাজে জেঁকে বসে থাকলে চলবে না। দুধের মধ্যে ক্ষীর সদৃশ বস্তুতে পরিণত হয়ে উচ্চাঙ্গের সামাজিক গোষ্ঠীতে ভর্তি হতে হবে। এর জন্য চাই সংস্কৃতিগত গুণ। এর বৈশিষ্ট্যের নামে দেখা দিয়েছিল বিশুদ্ধ বুদ্ধিবাদী রসচেতনা—আর বুদ্ধিবাদী রসচেতন জীবেরাই শ্রেণী হিসেবে সমাজের ওপর তলায় আশ্রয় নিয়েছিল, প্রচার করেছিল শিল্পের জন্যই শিল্প।

বর্তমান গণচেতনার যুগে যাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী বলে নির্দেশ করা হয়, এরা আসলে কিন্তু তা নয়। বুদ্ধিবাদী রসচেতন জীবশ্রেণীর গঠন ও প্রসার স্থিতস্বার্থের ওপর রচিত। শুধু উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় হলেই চলবে না। পুরোপুরি আভিজাত্যের লক্ষণাক্রান্ত হওয়া চাই। এবং সমাজিক আঁতগুলি বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট দেখা

যাবে যে প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রপরিচালক গোষ্ঠীর সঙ্গে বিশেষ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এঁরা। সূত্রের এক অন্তিম প্রান্তে রয়েছেন এঁরা। রাজকীয় অনুপ্রেরণা ও রাজকীয় পক্ষপাতদুষ্ট অনুগ্রহ শিল্পে, সাহিত্যে সৃষ্টি করতে এঁরা একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন একদিন। তাই সংস্কৃতি ও সাহিত্য যখনই (elite) এলিট গোষ্ঠীর হাতে গিয়ে পড়েছে, তখনই বৃহত্তর সমাজের মানুষকে বাদ তা একেবারে একটি শ্রেণী বিশেষের হয়ে উঠেছে। Dr. Mannheim-এর তথ্য আলোচনায় এই সত্যটি প্রকট হয়েছে, তিনি বলেছেন, "A sciological investigation of culture in liberal society must begin with the life of those who creat culture ; i. e. the intelligentsia and their position with in the society as a whole".

নিতান্তই বলার বেলায় বলা চলে যে "society as a whole." কিন্তু এই বাক্যটি, বা এই বাক্যাসমষ্টি-বিশেষ যে সামাজিক মূল্যের বাহন, তার কোন প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। যদিও বৃহত্তর সমাজের একটা সর্ব্বাঙ্গীন সত্তা এতে ব্যাখ্যাত হয়েছে বটে, কিন্তু বাস্তবে তা বিভিন্ন শ্রেণী-কুঠুরীবিশিষ্ট একটা-কিছু। শ্রেণী রূপান্তরিত গোষ্ঠীও আছে এতে। শ্রেণী এবং elite-এর প্রশ্নটি এখান থেকে আবার উদ্ভব হয়েছে। এটা দেখা গেছে যে শ্রেণী হলেই elite হয় না। এবং সব সময় যে elite শ্রেণীর সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চলেন এমন নয়। একে অন্য থেকে জন্মলাভ করে কালক্রমে আর একটি সক্রিয় সত্তা হয়ে পড়ে। যখন elite নামক সত্তাটি এই গোষ্ঠী পায় তখন শ্রেণী তাদের কাছে স্বল্পদামী হয়ে পড়ে। ফলে elite-রাই একটি শ্রেণীর

* Man and Society by Dr. Mannheim p. 81—Quoted in the Chapter "The Class and the Elite" page 37. Notes towards the Definition of Culture by T. S. Eliot.

মধ্যে বিশেষ শ্রেণী হয়ে পড়ে। এটাকে সামাজিক ক্রম বলা যেতে পারে। T. S. Eliot বলেছেন, "But while it is generally supposed that class, in any sense which maintains association of the past, will disappear, it is now the opinion of some of the most advanced minds that some qualitative differences between individuals must still be recognised, and that the superior individuals must be formed into suitable groups, endowed with appropriate powers, and perhaps with varied emoluments and honours. Those groups, formed of individuals apt for powers of government and administration, will direct the public life of the nation ; the individuals composing them will be spoken of as 'leaders'. There will be groups concerned with art, and groups concerned with science, and groups concerned with philosophy, as well as groups consisting of men of action : and these groups are what we call elites." *

বুর্জোয়া সমাজের শ্রেণী সংগঠন ও রূপান্তর—elite গোষ্ঠী গঠনের ক্রমবিকাশ এলিয়টের ভাষায় খুব ভালভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এমনটাই ঘটে, ব্যক্তিকে বিশেষ গুণের অধিকারী ধরে নিয়ে, তাঁকে অযাচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করে, সমাজের সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নেতৃত্ব সৃষ্টি করা হয়। এটা রাজনীতি, আমলাতন্ত্র ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে খাটে বলেই কবি এলিয়টের ধারণা। সাহিত্যের

***The Class and the Elite—Notes towards the Definition of Culture. T. S. Eliot—page 36.**

ক্ষেত্রেও এই ধরণের এক ওপর তলার এলিটের সৃষ্টি হয়েছে। এঁরা একটা শক্তিশালী গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করেন। এবং এদের রচিত সাহিত্যে সেই শ্রেণীরাই মহৎ ও ব্যক্তিত্বশালী হয়ে ওঠে যাদের সামাজিক শ্রেণী সংস্থান উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত নয়। এবং এখান থেকেই রুচি বিচার ও রস বিচারের কাজ শুরু হয়ে থাকে। বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা গল্প মুখে-মুখে প্রচলিত আছে। শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' বই নাকি কোন মাসিক পত্রিকাদ্বারা ফেরৎ দেওয়া হয়েছিল। তার কারণ যে উপন্যাসের নায়িকা মেসের ঝি তাকে সাহিত্যের দরবারে পাত্রস্থ করতে পত্রিকাটির আপত্তি ছিল। মন্তব্যটাকে যাচাই করে দেখা হয়নি, বর্তমান আলোচনা ক্ষেত্রে তার সুযোগ নেই। কিন্তু এই গল্প কথাকে একটা বিশেষ শ্রেণীর সামাজিক মনের সূচী হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা সমাজের অন্যান্য সাংস্কৃতিক পরিবেশে এই ধরণের মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়ে থাকে। সাধারণভাবে এটা একটা লক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। শ্রমিক বা চাষীর আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সব গল্প, উপন্যাস রচিত হয় আজও তার পাঠক সীমাবদ্ধ। এই বর্তমান সমাজের পাঠকের মনকে এমনভাবে রুচি বায়ুগ্রস্ত করে রাখা হচ্ছে যে ঐ জাতীয় ঘটনা উপন্যাসে বা সাহিত্যের অন্যকোন শাখায় পাঠক পড়ে রস পায় না। পাঠক সেই ঘটনার অন্তরালে কোন শক্তি বা রসের উৎস খুঁজে পায় না। তার কারণ হল এলিয়টের "groups concerned with art, and groups concerned with science, and groups concerned with philosophy".

বাস্তব ক্ষেত্রে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এই তিন গ্রুপেরাই সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্প প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করে থাকেন। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এরাই কর্ণধর অথবা পরোক্ষ ভাবে রাষ্ট্রকে

নিয়ন্ত্রিত করে। কাজেই elite শ্রেণীর কাছ থেকে যে সাহিত্য সমাজে ছড়িয়ে পড়বে তার সীমাবদ্ধ শ্রেণী প্রয়োগ হবেই। এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাই এই শ্রেণীর মহান জীবনদর্শন। বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী সৃষ্ট সাহিত্য বিচার করতে গেলে এই সামাজিক পরিবেশ, elite গঠনের পদ্ধতি ও প্রসার মনে রাখতে হবে। কেননা উনি মুখ্যত elite গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে সাহিত্যে এসেছেন। কাজেই ওঁর প্রতিভা বিচারে আমাদের এদিকটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। এবং আমাদের বিশ্বাস এইদিক থেকে বিচার করলেই ওঁর প্রকৃতি ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া সম্ভব হবে। প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভা এই বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করলে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

আমাদের বিচারের মানদণ্ড শ্রেণী, শ্রেণী থেকে উদ্ভূত মন, আর সেই সংশ্লিষ্ট মনের সাহিত্য সৃষ্টি। সেই সাহিত্যের মধ্যে অবদমিত শ্রেণীর জীবের পরিচয় ও তাদের মনোবৃত্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ। এমনও হতে পারে যে পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হয় নি। কিন্তু সামাজিক কর্ম বা ইতিহাসের ধারা বেয়ে শোষিত মানুষের বলিষ্ঠ মন এসেছে। সেটাও সাহিত্যের ক্রমবিকাশে কম মূল্যবান নয়। আর তাছাড়া সাহিত্যকে দেশ, কাল ও সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে নিবদ্ধ রেখে বিচার করতে হবে। আরও দেখতে হবে তিনি (সাহিত্যিক) হিসেবে এর ঊর্ধ্বে কতটা উঠতে পেরেছেন। একটা সীমাবদ্ধ কালের চৌহদ্দির মধ্যে থাকা আর তাকে ছাড়িয়ে যাওয়া এর মধ্যেও সাহিত্যিকের বিপ্লবী চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। দেশ, কাল ও সীমাবদ্ধ সমসাময়িক ঘটনার মধ্য থেকে ভবিষ্যতের চরিত্র খুঁজে বের করা সাহিত্যিকের একটা বিশেষ সামাজিক দায়িত্ব হওয়া উচিত। আমরা 'উচিত' কথাটা প্রয়োগ করছি এই কারণে যে কোন-কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে

সাহিত্যিক নিজের অবিরাম সাধনাদ্বারা সমাজের নীচুতলার জাগ্রত চেতনার সঙ্গে নিজের সাহিত্য কর্ম মিশিয়ে দিয়েছেন। ভবিষ্যতের ছবি এঁকেছেন। সচেতন সাহিত্যিক, সমাজ ও জাগ্রত চেতনাসম্পন্ন অবদমিত সামাজিক শক্তিকে মেনে নেন। কিন্তু এই চিন্তা ধারার ক্রমবিকাশ কোন-কোন সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে ঘটেনা। অন্যথায় বিশেষ প্রতিভার অধিকারী হয়েও তাঁরা সমাজকে এড়িয়ে চলেন। এটা তাঁদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তার অনিবার্য ফল

প্রমথ চৌধুরী মশাইয়ের আত্মকেন্দ্রিক চিন্তার ফলেই 'চার-ইয়ারি কথা' গল্পের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি স্বীকার করেছেন যে একটি অভিজাত মেয়েকে ভাঙ্গিয়ে চারটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এর একজন পাগল, (কাত্তির মাথায় একটু ছিট ছিল বলে লেখকের নিজের বিশ্বাস।) তাঁর নিজের জবানীতে "উপরন্তু তার ব্যবহার এত অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় দিত যে, তার থেকে আমার মনে হত তার ভেতর একটু পাগলামি ছিট আছে"* আর একজন চোর, তৃতীয়টি জোচ্চোর সবার শেষেরটি প্রেতাত্মা। তিনি কাত্তির সামাজিক পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে ওরা ব্রাসেল্‌সে থাকত। ওদের ঠাকুরদা ভারতবর্ষে জেনারেল ছিলেন। বাবা মিলিটারী অফিসার ছিলেন। লেখক বলেছেন, যদি কাত্তির কথা বিশ্বাস করতে হয়, তবে বলতে হয় সে ছিল অভিজাত বংশীয়া। আমরা এটা বলতে পারি যে অভিজাত বংশীয়া মেয়েকে দেখেই গল্পের চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। এইটুকু সামাজিক পশ্চাৎপট রেখে তিনি eternal feminine এর কল্পনা করেছেন। এখানে আরো একটু বিস্ময় এই যে, যাদের উনি সাহিত্যের মধ্যে চরিত্র হিসেবে স্থান দিয়েছেন তারা পৃথিবীর সব দেশেই সমাজ বিচ্ছিন্ন জীব। এদেরকে উনি বৃহত্তর

---

*গল্প সংগ্রহ—চার-ইয়ারি কথা প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী—বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ পৃঃ ৫১৪।

সমাজের মুখোমুখী না দাঁড় করিয়ে একটা আপাত সহজ সামাজিক সাম্য রেখে সৃষ্টি করেছেন। আসলে এইটেই সমাজ অবাস্তব। বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, চরিত্র পাগল, চোর, জোচ্চর—এইগুলি অর্থনৈতিক ক্লেদ থেকে সৃষ্টি হয়। প্রেতাত্মা অবাস্তব কাল্পনিক বিশ্বাস—যা বংশপরাম্পরায়ক্রমে অলীক কাহিনীর মারফৎ সামাজিক মানুষের কাছে তুলে দেয়া হয়েছে। প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করে না এমন সহজ মানুষ বড় একটা পাওয়া যায় না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে এর প্রভাবটা আজকাল কিছু কম। কিন্তু মনের সংস্কার এখনো মিটে যায় নি। কিন্তু লেখকের এই প্রেতাত্মা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। সাধারণত মৃতের আত্মা বা spirit বলতে যা বোঝায়—শেষের গল্পটি ঠিক সেই ধরণের। অ-বাস্তব ও অ-বৈজ্ঞানিক সামাজিক মনে লেখক একে সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে যে প্রেমের আঁচ রয়েছে তা যেমন শ্রেণী আভিজাত্যেরদ্বারা সুমার্জ্জিত তেমন আবার তা প্রচ্ছন্ন। তার ফাঁক দিয়ে ভালবাসার আসল মধুর রস নিষিক্ত হবার উপায় ছিল না। এ অভিজাত শ্রেণীর প্রেম অন-অভিজাত শ্রেণীর কাছে নিতান্ত পরিহাস। পরবর্তী কালে প্রেমিকা নায়িকা, মৃত্যুর পর আত্মা সেজে টেলিফোনের মারফৎ তার, 'আমি' নায়কের কাছে স্বীকার করে গেল যে সে তাকে গভীরভাবে ভালবাসত। প্রেমিকার ভালবাসা যে কত গভীর ও নির্মম সত্য ছিল তা তাদের এই কথোপকথন থেকেই ধরা পড়বে।

"আমি মনে আর দাসী ছিলুমনা—তাই আমি স্পষ্ট দেখতে পেতুম যে, তাদের ভদ্র কথার পিছনে যে মনোভাব আছে তা মোটেই ভদ্র নয়। ফলে আমি আমার রূপ-যৌবন দারিদ্র্য নিয়েও সকল বিপদ এড়িয়ে গেছি। জান কিসের সাহায্যে?

"না"

"আমি আমার শরীরে এমন-একটি রক্ষা কবচ ধারণ করতুম, যারগুণে কোনো পাপ আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি।"

"সেটি কি Cross?"

"বিশেষ করে আমার পক্ষেই তা Cross ছিল—অন্য কারো পক্ষে নয়। তুমি যাবার সময় আমাকে যে-গিনিটি বকশিস দেও সেটি আমি একটি কালো ফিতে দিয়ে বুকে ঝুলিয়ে রেখেছিলুম। আমার বুকের ভিতর যে ভালবাসা ছিল আমার বুকের উপরে ওই স্বর্ণমুদ্রা ছিল তার বাহ্য নিদর্শন। এক মুহূর্তের জন্যও আমি সেটিকে দেহছাড়া করিনি, যদিচ আমার এমন দিন গেছে যখন আমি খেতে পাইনি।"

প্রেমের এই গভীরতা কিন্তু নায়ককে স্পর্শ করেনি। আত্ম-কীর্তনকারী নায়ক যেভাবে সমগ্র কথোপকথন চালিয়েছিল তাতে মনে হয় নায়কের মন একটি নীরেট লৌহপিণ্ড দিয়ে গঠিত, যার মধ্যে কোন ভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। এই ভাবহীন, উদাস ও আত্মকেন্দ্রিক নায়ক কোন কালেও নায়িকার প্রতি এতটুকু ভাবান্তরের পরিচয় দেয়নি। পাছে তার শ্রেণী আভিজাত্যের পবিত্রতায় মলিনতা স্পর্শ করে। কিন্তু আভিজাত্যের পরিপূর্ণ কায়দায় পরিচারিকাকে বকশিস দেবার রেয়াজ তিনি ঠিকই রেখেছেন। যে নারী (এখানে নিছক পরিচারিকা হিসাবে। 'দাসী' কথাটা লেখক লিখেছেন। আমরা মনে করি সেটা অপমানকর ভাষা।) সেই বকশীসটি গ্রহণ করল এবং সেই বকশীসটি জলন্ত স্মৃতির মত যার সমগ্র জীবন সত্তাকে ঘিরে রইল, সেই নারীকে নায়ক গভীর ঔদাসীন্যে ছেড়ে চলে এসেছেন। পরিচারিকার প্রতি প্রেম! সে ত ইতরীয় কিছু হবে। অথচ

*চার-ইয়ারি কথা—পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮—গল্প সংগ্রহ—প্রথম চৌধুরী : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।

জীবন-অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে যখন মনকে তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে গিয়েছেন তখন 'আমি' নায়ক আসরে বসে গল্প করেছেন সেই পরিচারিকাটিরই। বস্তুত উচ্চ শ্রেণীর মনের ধাঁচই এই। কিন্তু অনাদৃত স্মৃতিও বন্ধু-বান্ধবদের আসরে কাব্যরসে নিমজ্জিত হয়ে এক নতুন মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। 'চার-ইয়ারি কথা'য় সেই অনাদৃত স্মৃতির মানসিক পরিবেশেরই অপূর্ব্ব নিদর্শন মেলে। তবু গল্প বলার ভঙ্গীমার মাঝে থেকে-থেকে একটি ব্যথিত চিত্ত, বিষাদক্লিষ্ট মন ধরা পড়ে। তা না হলে নায়কের কাহিনীর মাঝে নায়িকা প্রেমিকার ছবি ফুটে উঠত না। প্রেমের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে একটি মনোবৃত্তি যে প্রবল হয়ে উঠেছিল তা ঐ নায়িকার কথাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—সেটা হল 'উপেক্ষা'। এই 'উপেক্ষা' মনোভাবটির বিশ্লেষণ করলেই সেই অভিজাতীয় শ্রেণীমনোভাব খুঁজে পাওয়া যাবে। তুলনামূলকভাবে নায়িকা বলেছেন, অন্যরা আমায় মিষ্টি কথা বলত। আর তুমি আমায় করতে 'উপেক্ষা'। সম্ভবত এই উপেক্ষার মনোভাবকে জয় করার জন্যই নায়িকা নিজেকে নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। গোপনে-গোপনে পাঠ চর্চ্চা করা এরই একটা অঙ্গ বলে মনে করা যেতে পারে। কেননা নিজেকে নায়ক প্রেমিকের সমযোগ্য করে তোলাই হল এর মূল উদ্দেশ্য। ওরা যখন অর্থাৎ নায়কের বন্ধু-বান্ধবরা যখন টেবিলে বসে ইংরেজি ভাষায় কথোপকথন চালাতো তা সেই প্রেমিকা পরিচারিকাটি সবটা বুঝতে পারত না। তাই সে গোপনে বই 'চুরি' করে পড়তে শুরু করে: উদ্দেশ্য, নিজেকে প্রেমাস্পদের সমযোগ্য করে তোলা। মুক্তোর Tie-pin হারাবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে নায়ক তার বন্ধুর কাছে যে রসিকতা করেছিল তা নায়িকার মনে পিনের মতই বিঁধেছিল। নায়ক হাসতে-হাসতে রসিকতা করে তাঁর বন্ধুর কাছে বলেছিলেন,

"আনি ওটি চুরি করে ঠকেছে, কেননা মুক্তোটি হচ্ছে ঝুটো, আর পিনটি পিতলের, আনি বেচতে গিয়ে দেখতে পাবে যে ওর দাম এক পেনি! তারপর তোমরা দুজনেই হাসতে লাগলে।" আসল চোর ছিল কিন্তু বাড়ীউলী Mrs. Smith. সমাজে এই সব অসম মনের আদান-প্রদান ঘটলেই সামান্য ঘটনাকে আশ্রয় করে উচ্চশ্রেণীর সামাজিক মন ধরা পড়ে। গল্পের নায়ক কোন অবস্থাতেই ভাবতে পারছে না যে তার ঝুটো মুক্তোর tie-pin Mrs. Smith চুরি করতে পারে। সবচেয়ে যেটা সম্ভব তা হল বাড়ির ঝি-চাকরেরা। এরকম ঘটনা বহুই আছে, বড়লোকের বাড়িতে কিছু হারালে বা চুরি হলে ঝি-চাকরদের ওপর সন্দেহটা ফলাও হয়ে ওঠে। কোন-কোন ক্ষেত্রে এই সন্দেহ সত্যে পরিণত হয়েছে বটে। তার চেয়ে বেশী সত্যরূপে দেখা দেয় সন্দেহটা, সম্পন্ন শ্রেণীর মাঝে। কিন্তু তিরস্কারের বেলায় বা শাস্তির বেলায় ঝি-চাকরদেব ঘটনাটা মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। আর সম-গোত্রীয় সম্পন্ন শ্রেণীর বেলায় ওটা ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়। এটা হল শ্রেণী মনোভাব। ওটা কোন-কোন ক্ষেত্রে প্রেমের বেলায়ও খাটে। সে যাই হোক নায়ক আত্ম-স্বীকরোক্তিব মুখে নিজের চরিত্রের শ্রেণীসুলভ বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করেছেন।

প্রমথ চৌধুবী মশাইয়েব গল্পে বাস্তব সামাজিক মন মাঝে-মাঝে ধরা পড়েছে—তবে তা সামন্ততন্ত্রী। একটা নিরাপদ দূরত্ব ও ক্ষমতার মণিকোঠায় থেকে, সমাজের তথাকথিত নিম্নতমের শক্তির বিন্যাস করেছেন, প্রশংসা করেছেন তিনি: আর তাদের অন্তর থেকে এক নব্য মানবিকতা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। চৌধুরী মশাই এখানে শুধু স্বজনশীল এমন নয়, শ্রেণীচেতনার দ্বারা আবৃত হয়েও একটা উজ্জ্বল আলোর রন্ধ্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। নিপীড়িত সাধারণের মধ্যে সামন্ত-তন্ত্র যুগের দৈহিক

শক্তি,অসমসাহসিকতা, অবলীলাক্রমে পরার্থে আত্মত্যাগ ধর্ম একটি তেজস্বীতার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। একে মানবিকতার নতুন আবির্ভাব বলে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন। যদিও এ সবার ওপরে এক অজ্ঞাত রহস্যের ধূসর আবরণ চাপিয়ে দিয়েছেন, এবং তিনি নিজেও সেই বিস্ময়াবিষ্ট মনে রহস্যের স্বাদ অনুভব করেছেন। এটা সামন্ততন্ত্র যুগের মানসিক অভ্যাস। এর ঐতিহাসিকতা নিয়ে অযথা তর্ক করে লাভ নেই। কেননা সমাজ-ইতিহাস এবং তার সঙ্গে শ্রেণী মনের ক্রমবিকাশ অতি ধীরেও হতে পারে। আবার কখন-কখন বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এক শক্তিশালী অপরিচিত নতুন সামাজিক মনও সৃষ্টি হতে পারে। সে অন্য প্রসঙ্গ।

সেকালের সামন্ত প্রভুরা আত্মরক্ষার তাগিদে পারিবারিক রক্ষী বাহিনী সৃষ্টি করেছিল। ভূস্বামীত্ব রক্ষা করা এবং অন্যের ভূ-সম্পত্তি জোরে দখল ও করায়ত্ত করা—এটা সামন্তনৃপতি, এবং পরবর্তী কালে এরই ভগ্নাংশ জমিদার শ্রেণীর মুখ্য কর্তব্য ছিল। এই কর্তব্য রক্ষা করতে কত জন-জীবন যে নিষ্পেষিত হয়েছে তার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস এদেশে নেই। আর থাকবার কথাও নয়। সামন্ত শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ঐ মৃত জনজীবনের ইতিহাস রচনা করবেন এমন গণতান্ত্রিক অধিকার সে যুগের ছিলনা। কিন্তু তা হলেও জনমানসে এখনও তাদের নিষ্পেষণ, শৌর্য ও বীর্যের কাহিনী বেঁচে আছে। সাহিত্য তা নিয়ে বেশ কাজ-কারবারও করেছে। ওদেশের অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য দেশের সাহিত্যে এর ত কোন লেখা-জোখা হিসেব নেই। এদেশের সাহিত্যেও—এখানে বাঙ্গালা সাহিত্যে—সামন্ততন্ত্রীয় বীরত্বের কাহিনী পাওয়া যায়। তবে সে বীরত্ব মুখ্যত শাসক শ্রেণীর কার্য উদ্ধারের জন্য নিয়োজিত হত। অর্থাৎ বীরত্ব-শৌর্য-বীর্য

ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারে এসে পৌঁছেছিল। বাঙ্গালাদেশের ঢালী শ্রেণী, বিশাল দেহী পাইক বরকন্দাজ জমিদারদের স্থিতস্বার্থ রক্ষার জন্যই নিয়োজিত হত। বঙ্কিমচন্দ্র লাঠির মাহাত্ম্যে তা মোটমুটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই লেঠেলি সূত্রে নানাবিধ অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যেতো। অবিশ্যি এই দক্ষতা লাঠি চালাবার ও প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার দক্ষতাকেই এখানে নির্দ্দেশ করতে হবে। এই লেঠেলি দক্ষতা একদিন শাসক শ্রেণীর অবসর বিনোদনের মাঝে নানা প্রদর্শনী ক্রীড়া-কৌতুকের রূপ নিয়েছিল। সামাজিক উৎসবে, পাল-পার্ব্বণে এই লেঠেলিবৃত্তি বেশ আনন্দের উৎস হয়ে উঠেছিল। সাধারণ যা উপভোগ করতেন তার চেয়েও বেশী উপভোগ করতেন শাসক সম্প্রদায়। কেননা এরাই ছিল এঁদের (শোষক, জমিদারদের) রক্ষাব্যূহ। এই রক্ষা ব্যূহ ভেদ করে যখন প্রতিদ্বন্দ্বী শসাক জমিদার ঢুকত তখন আর মান ইজ্জত থাকত না। আর শ্রেণী ইজ্জত রাখতেই বিচিত্র শোষণ, বহু জীবন ধ্বংস হয়েছে। তবু এই লেঠেলি দক্ষতা একটা সামাজিক ক্রীড়া-কৌতুকে পরিণত হয়েছিল বলেই এর একটা রহস্যের দিক ছিল, আর একটা আর্থিক বিনিময়ের দিকও গড়ে উঠেছিল। এর সঙ্গে যে শ্রেণীটি সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিল জনজমায়েতে বীরত্বের মহিমায় তারাও মহিমান্বিত হত। অমুক জমিদারের একশ' লেঠেল আছে। অমুক জমিদারের বাছাবাছা পাইক আছে—এসব গল্প আকারে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারিত হত। শক্তির এই জাতীয় প্রচারও এক ধরণের পরোক্ষ প্রভুত্ব রক্ষার নিদর্শন। এমন একটা জনজমায়েতে লেঠেলি প্রদর্শনী খেলার বর্ণনা প্রসঙ্গে গল্পকার চৌধুরীমশাই বলেছেন, "মন্ত্র শক্তি তোমরা বিশ্বাস করনা, কারণ আজকাল কেউ করেনা; কিন্তু আমি করি।" এই বলে একটা গল্প তিনি ফাঁদলেন। সেটা একটা পূর্ণাঙ্গ লাঠি

খেলার গল্প। 'মন্ত্রশক্তি' এই গল্পে তিনি অতিবাস্তব সামাজিক দিকটা বাদ দিয়ে, মনুষ্য দক্ষতার ওপর একটা আধিদৈবিক রহস্যের আভাস আমদানি করছেন। এই আমদানীকৃত দৈবীক্রিয়াই গল্পের মুখ্য বস্তু।

যে সময় এই শ্রেণীর লেঠেলদের জীবন নিয়ে লেখা সে সময়ের সমাজ চেতনা এর মাঝে নেই, কাজেই চরিত্রগুলিকে বিশেষ করে ঈশ্বর পাটনীকে দৈব শক্তির আধার করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সমস্ত গল্প চিত্রটির মধ্যে নায়েব-হুজুর সংযোগের ঘটনা আছে, কিন্তু সে ঘটনা সাজানো হয়েছে ঈশ্বরের ওপর গুপ্ত প্রভুত্বের মহিমা রক্ষা করার জন্য। ফলে গল্পের চরিত্র হিসেবে ঈশ্বর হুজুরের খেয়ালের অথবা ইচ্ছার প্রতিভূ মাত্র। তার নিজস্ব কোন চেতনা নেই। অথচ সমস্ত চিত্রটির মাঝে সামন্ততন্ত্র যুগের হুকুম-চেতনা বিহীন জনগণের পিঠ-চাপড়ানো ব্যাপারটিও রয়েছে। হুজুরের বাড়ীর মর্যাদা রক্ষার জন্যই ঈশ্বর পাটনীর লাঠি খেলা। এবং তার লাঠি খেলার দক্ষতার ওপরে রহস্যের অবলেপ বিস্তার করে সেকেলে মন্ত্রের মহিমা প্রচার। এটা হল জীবন বিমুখতার গল্প। বস্তুত চৌধুরী মশাইর প্রায় সব গল্পই জীবন বিমুখতার দিকে ঝুঁকে আছে। কাজেই নায়ক শ্রেণী বিচারে তিনি প্রায় সবসময়ই এমন সব শ্রেণী থেকে নায়ক বা নায়িকা বেছে নিয়েছেন যাঁরা বৃহত্তর সমাজের অংশ বলে বিবেচ্য নয়। এই যে বিচ্ছিন্ন অংশের সাহিত্য—বিশেষ করে গল্প সাহিত্যে এর যে আবির্ভাব তা অনেকটা সমাজের গভীর ও ব্যাপক দ্বন্দ্ব চেতনার স্পর্শ এড়িয়ে হস্তীদন্ত নির্মিত মিনারে বাস করার মত। মিনারের গোড়টা মাটির সঙ্গে আছে বটে, কিন্তু উচ্চমার্গে উত্তরণের পর আর শক্ত মাটির মানুষ নেই। এই জীবন বিচ্ছিন্নতা উচ্চশ্রেণীর একটি অতি বিলাসী স্বপ্ন। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে তিনি এই স্বপ্নকে আমদানী করে সমাজ বাস্তব-

বিরোধী কাজ করেছেন। এর অর্থই সাহিত্যের সমাজবাস্তবকে অস্বীকার করা। চৌধুরী মশাইয়ের গল্পে এই অস্বীকারের পরিচয় বহুল পরিমাণে মেলে। যদি ভঙ্গীমাই গল্প-শিল্পের একমাত্র পরিচয় হয় তবে চৌধুরী মশাইয়ের জুড়ী মেলা ভার—কিন্তু এটা সমাজ-সত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। সমাজচেতনার দিগন্তে সাহিত্যের অতি বড় একটি আকাঙ্ক্ষিত ভাব-রূপ – সৌন্দর্য। এর পতন ঘটলে সাহিত্য যেমন হয় বোবা, তেমন হয় স্থাণু। যদি ঈশ্বব পাটনীর মধ্যে একটি বিশ্বজনীন চেতনার বীজ থাকত তবে আজও পাঠক তার মধ্য থেকে ভবিষ্যৎ আত্মবিশ্বাসী লড়িয়ের সন্ধান পেতেন। কিন্তু তিনি তা না করে সামন্তযুগের জোরকবে দাসমনোবৃত্তি সৃষ্টি-করা বীর্যবান মানুষকে আধিদৈবিক কৃপাব পাত্র করে তুলেছেন। যেখানে সাহস ও কর্মদক্ষতার সঙ্গে দৈবেব কোন যোগ নেই সেইখানে তিনি চরিত্রের মধ্যে দৈবেব কৃপা বিস্তাব করে চরিত্রকে সেই দৈবী কৃপার ভিখারী করে তুলেছেন।

> মিছু সর্দার বললে, "হুজুর আগেই বলেছিলুম ও বেটা যাদু জানে। এখন তো দেখলেন যে আমাদের কথা ঠিক। মন্তরের সঙ্গে কে লড়তে পারবে?
>
> ঈশ্বর হাত জোড় করে বললে, "হুজুর আমি মন্তর-তন্তর কিছুই জানিনে। তবে সড়কি-লাঠি ধরবা মাত্র আমার শরীবে কি যেন ভব করে। শক্তি আমার কিছুই নেই; যিনি আমাব উপর ভর করেন, সব শক্তি তাঁরই।"*

'মন্ত্রশক্তি,' গল্পে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ (এখানে লেঠেল অর্থে) এলেও, তার চেতনাকে এমন একটি absolute শক্তির ওপর ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হয়েছে যা পড়ে আর মানবিক আত্মবিশ্বাসের কথা মনে হয় না। সমাস্ততন্ত্রের যুগে একটা

*'মন্ত্র শক্তি'—গল্প সংগ্রহ প্রমথ চৌধুরী : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ—পৃষ্ঠা ৩৪৪।

absolute রাষ্ট্র এবং সেই রাষ্ট্রের প্রতি দ্বিধাবিহীন আনুগত্য এই ছিল বৃহত্তর সামাজিক শক্তির আসল চেহারা। সেই আনুগত্য রাষ্ট্রশক্তির প্রতি, অদৃশ্য শক্তির প্রতি যে পরিমাণ মানুষ দিয়েছে ঠিক সেই পরিমাণে সে হারিয়েছে আত্মবিশ্বাসের অধিকার। এই আত্মবিশ্বাসের প্রকৃত অধিকার বঞ্চিত মানুষই ছিল সেকালের শোষিত জনগণ। শাসক শ্রেণী তাদের প্রতি আনুগত্যকে পুণ্যের আর ধর্মের কাজ বলে প্রচার করত। সাহিত্য ও বিশেষ করে শ্রেণী সাহিত্য সেই প্রচার থেকে মুক্ত নয়।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারে প্রমথ চৌধুরীর 'আহুতি' ও 'ধ্বংসপুরী' গল্প দুটির বিশেষ একটি ঐতিহাসিক সত্তা আছে, নিপীড়িত মানুষের একটু-আধটু টুকোরা-টাকরা পীড়নের ইঙ্গিত আছে, অর্থাৎ গল্পের মধ্যে শোষক শ্রেণীর একটি অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যদিও পর্যাপ্ত কিছু নয় তবু তার মধ্য থেকে মন্তব্য ও মনোবৃত্তি পাওয়া যাচ্ছে। কাহিনী দুটির পশ্চাৎপটে সামন্তযুগের ব্যাভিচারী উচ্ছৃঙ্খল, কামান্ধ পাশববৃত্তির ঘটনার কিছু উল্লেখ আছে। ফলে সেই যুগীয় পাপবৃত্তির একটা অস্ফুট ছবি পাওয়া যাচ্ছে। শোষিত মানুষেরা বিশেষ রূপে ফুটে ওঠেনি। মূল ঘটনাকে রূপ সজ্জা দেবার জন্য ওরা পার্শ্বচর হয়ে এসেছে। তবু এটা স্বীকার করতেই হবে যে সাধারণ মানুষকে না এনে, অন্তত স্বল্পাকারে, তাদের দিয়ে পরিবেশ সৃষ্টি না করে, মূল গল্প দুটি সাজানো যায়নি। মধ্যযুগে নারী ও সাধারণ মানুষ অত্যাচারী স্বামী ও সামন্তপ্রভুর কাছে বেশী নিপীড়িত হত। 'আহুতি' গল্পের পরিবেশ সৃষ্টিতে লেখক লিখলেন "আমরা ধনীলোকেরা পৃথিবীর দরিদ্র লোকদের কাঁধে চড়েই তো জীবনযাত্রা নির্বাহ করছি। আর পৃথিবীতে যে স্বল্প সংখ্যক ধনী এবং অসংখ্য দরিদ্র ছিল, আছে, থাকবে এবং থাকা উচিত—এইত 'পলিটিক্যাল

ইকনমির' শেষকথা। Conscience-কে ঘুম পাড়াবার কত-না মন্ত্রই আমরা শিখেছি।"* এই আত্ম-উক্তির মধ্যে যে ছদ্ম ব্যঙ্গ ফুটে উঠেছে তার মাঝে কিছু সত্যতা এবং সত্যের অনুভূতি আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা বিষহীন নিষ্ক্রিয় সাপের মত। জরাজীর্ণ ক্ষীয়মান শ্রেণীর গুটি কয়েকের চেহারা দেখে যদি লেখকের মনে এই মন্তব্য এসে থাকে ত, সুখের কথা। কিন্তু এই মন্তব্যের গভীরতা ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। কেননা এই দরিদ্র লোকদের কাঁধে চড়ে শ্রেণীগতভাবে যে শোষণ কার্যটি চলছে গল্পে তার কোন আভাস না রেখে তিনি অতীতের কবর খুঁড়তে গিয়েছেন। এটা এলিট শ্রেণীর সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব। সেদিক থেকে লেখক তাঁর শ্রেণী সত্তার ওপর অবিচার করেননি।

একটা বিশেষ মুহূর্তে লেখকের কাছে অতীত মুখর হয়ে উঠেছে এবং সে অতীতে যে কীর্তিই থাকনা কেন তিনি এর ভেতর থেকে অত্যাচারী শাসক শ্রেণীর—এখানে সামন্তপ্রভুর—কীর্তির মাঝে যে দুঃসহ মানবিক অপমানের ইন্ধন ছিল সেটাই লক্ষ্য করেছেন। এবং সেই পবিত্র মানবিকতা কিভাবে পদদলিত হয়েছে তারও কিছু ইঙ্গিত রেখেছেন। ফলে গল্পটি তিনটি ভাগে পর্যবসিত হয়েছে। প্রথম ভাগে পাল্কী বেহারার দারিদ্র্যের ওপর লেখকের আত্ম-উক্তি। দ্বিতীয়ভাগে অত্যাচারী শাসক শ্রেণীর সামাজিক ব্যাভিচারের বর্ণনা। "সন্ধ্যার সময় কুলদেবতা সিংহবাহিনীর

> দর্শনের পর বাবুরা যখন বৈঠকখানায় বসে মদ্যপানে রত হতেন, তখন সেই-সকল গৌরবর্ণ প্রকাণ্ড পুরুষদের কপালে রক্ত চন্দনের ফোঁটা আর জবাফুলের মত দুই চোখ—এই তিনে মিলে সাক্ষাৎ মহাদেবের রোষকষায়িত ত্রিনেত্রের মত দেখাত।

* 'আহুতি' : গল্প সংগ্রহ প্রমথ চৌধুরী : বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ পৃঃ ৭৫ ॥

এই সময়ে পৃথিবীতে এমন দুঃসাহসের কার্য নেই যা তাঁদের দ্বারা না হত। তাঁরা লাঠিয়ালদের এ-শরিকের ধানের গোলা লুঠে আনতে, ও-শরিকের প্রজার বৌ, ঝিকে বে-ইজ্জৎ করতে হুকুম দিতেন।"*

সামন্ত প্রভুদের এমন নিষ্ঠুর লীলার আর অন্ত নেই। এই কলঙ্কিত ইতিহাসের ভূমিকা শুধু যে নবাবী আমলেই রচিত হয়েছে এমন নয়। ব্রিটিশ প্রভুত্ব কায়েম হবার পরও অতি কদর্য সামাজিক ব্যাভিচার উচ্চ শ্রেণীর জমিদারদের মধ্যে ছিল। তৃতীয় ভাগে, গল্পটিকে লেখক একেবারে ঘুরিয়ে দিলেন ধর্মান্ধ অর্থ সংরক্ষণ বিশ্বাসের দিকে। ইতিপূর্বে পাল্কী বেহারাদের সম্বন্ধে যে উক্তি প্রকাশ করেছিলেন তাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে, আমলাদের বিশেষ একটি কপট মজুরীর শ্রেণী উন্নত্রের কাহিনী শুরু করেন, তারপর সংস্কারগত ধনরক্ষার বিভ্রান্তিকর উন্মাদ বিলাসিতার বর্ণনা। ফলে গল্পে গভীর ব্যাপক সামাজিক মানবতাবোধ বাদ পড়ে গেল। দম্ভোস্ফীত পরিবারের পতন ও কুসংস্কারপ্রিয় নিষ্ঠুর, ক্রুর, অর্থগৃধ্নু চরিত্রের উৎপত্তি হল। এই চরিত্রটি লেখক অপূর্ব দক্ষতার সহিত সৃষ্টি করেছেন। ধনঞ্জয়ের মনে ধনের প্রতি যেমন অপরিমিত লোভ ছিল, তেমন ছিল তা রক্ষা করার জন্য বিপুল উন্মাদনা। কিসের জন্য এই অর্থ সঞ্চয় একথা ধনঞ্জয়ের মনে কখন হয়নি। তার মনে এমন একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে ধন রক্ষা দেবতার অসীম অনুগ্রহ ছাড়া সম্ভব নয়, এ সম্বন্ধে দেশজ কিম্বদন্তী বা বিশ্বাস তাকে প্রেরণা জুগিয়েছিল এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই। আমাদের একথা ভাবতে অসুবিধা নেই যে গ্রীক দেশের প্লুটাস আর আমাদের ভারতীয় পুরাণে বা মহাভারতে যক্ষ সমধর্মী

---

* 'আহুতি' গল্প-সংগ্রহ প্রমথ চৌধুরী বিশ্বভারতী সংস্করণ। পৃষ্ঠা ৮৩।

মানুষ। এদের কাজই নাকি ধনসংরক্ষণ করা। এদেশে আবার লক্ষ্মীকে ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে প্রচার করা হয়েছে। লক্ষ্মীকে বলা হয় চিরচঞ্চলা। তিনি নাকি কারুর ঘরেই চিরকাল থাকেন না। এদেশে নারীদের চঞ্চলা বলা হয়। আর পুরুষদের বলা হয় দৃঢ়চেতা, কঠিন, নির্ব্বিকার মানুষ। সাংখ্য বলছেন প্রকৃতি (এখানে নারী অর্থে) নৃত্যশীলা আর পুরুষ নির্বিকার। এই চাঞ্চল্য ও নিষ্ঠুরতা, নির্বিকার ও নির্মমতা নারী ও পুরুষের মাঝে গুণগত ভাবে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। সাধারণ সামাজিক ব্যবহারে দেখা যায় নারীরা একটু শিথিলছন্দে হাত নাড়াচাড়া করেন। পুরুষ সেখানে এমন হাত মুঠি করে পয়সা ধরেন যে, কোন ফাঁক থাকে না এতটুকু জল গলে পড়তে পারে। তাছাড়া এটাও দেখা যায় যে একটু কৃপণ স্বভাব, নির্মম ও ভাবলেশহীন নিষ্ঠুর না হলে ধন সঞ্চয় হয় না।

ধনঞ্জয় ছোটবেলায় কিম্বদন্তী শুনেছে যে একটি ব্রাহ্মণ শিশুকে যদি টাকার সঙ্গে একটি ঘরে বন্ধ করে রাখা যায় তাহলে সেই শিশুটি বদ্ধ অবস্থায় অনাহারে প্রাণত্যাগ করে যক্ষ হয়ে সেই টাকা চিরকাল ধরে রাখবে। কোথা থেকে এই নরহত্যা করে অর্থ রক্ষার প্রথা এলো এটা আমাদের সঠিক জানা নেই তবে আদিম জাতির আচার-আচরণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে নরহত্যা করে জমির সারবত্তা বৃদ্ধির একটা প্রথা ছিল।

উড়িষ্যার খোন্দ নামক এক আদিম জাতির মধ্যে এই জাতীয় একটা প্রথা ছিল। তারা নরহত্যা করে জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে নরহত্যা করলে জমিতে শস্য বেশী পাওয়া যাবে। এ এক ধরণের সম্পদ বৃদ্ধির সংস্কারক্লিষ্ট প্রথা বটে। কিন্তু এতে ত সম্পদ অনন্তকাল স্থায়ী থাকবে এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। হিন্দু সমাজে অর্থ রক্ষার জন্য সমাজ-ধর্মীয়-সংস্কার সূত্রে যাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হয় তিনি

হলেন যক্ষ দেবতা। মহাভারতে যে যক্ষের উল্লেখ আছে এবং যিনি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে কথোপকথন করছেন, তাঁর চরিত্রতে ত এমন বীভৎসার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। তবে এই বীভৎসতা ও অর্থ সংরক্ষণ প্রথা কোথা থেকে এলো?

রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি সমর্পণ' প্রমথ চৌধুরীর 'যখ' ও 'আহুতি' গল্পে এই ধন সঞ্চয় সংস্কারের ভিত্তি করেই রচিত। এদের মধ্যে 'আহুতি' গল্পে মধ্যযুগীয় সংঘর্ষ, শোষণ ও ব্যাভিচারের পরিচয় কিছু পাওয়া যায়। নিষ্ঠুরতা এমন পর্যায় গিয়ে পৌছুল যে সবই ধ্বংস হয়ে গেল। লেখক অবশ্যি এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে শুধু কিরীট চন্দ্রের কান্না ও রত্নময়ীর উন্মত্ত হাসির শব্দই শুনতে পেয়েছেন। কেননা কিরীটচন্দ্রই ব্রাহ্মণশিশু হিসেবে ধনঞ্জয়ের ধনাগারে নিহত হয়েছে। আর তার প্রতিহিংসার আগুনে উগ্রনারায়ণের বিধবা কন্যা রত্নময়ী সমস্ত গ্রাম পুড়ে ছারখার করে দিয়েছিল। কিন্তু এসবের মধ্যে পাঠান পাড়ার পাঠান প্রজাদের ভূমিকা নিতান্ত নগণ্যই থেকে গেল। তারা যেমন ঐ রুদ্রপুরের জীয়ন্তে মরা পুরীর রক্ষক ছিল তেমন আবার অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে বংশ মর্যাদাকে রক্ষা করার জন্য নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী পার্শ্বচর হিসেবে উজ্জ্বল ভূমিকা নিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিতপাষাণ", প্রমথ চৌধুরীর "ধ্বংসপুরী" মূলত সমধর্মী গল্প। অথচ এ দুয়ের মাঝে প্রভেদও আছে বিস্তর। এ সব গল্পের ব্যাখ্যায় বা চরিত্র বিন্যাসে অতীতকে পাঠকের সামনে না এনে উপায় নেই। কিন্তু এখানে দেখতে হবে কি ভঙ্গীতে পাঠকের সামনে সেই ভয়াবহ অতীতকে পরিবেশন করা হয়েছে। আমাদের জীবনে অতীত যেমন রহস্য বিস্তার করে তেমন আবার মোহও বিস্তার করে। ধ্বংসপুরী গল্পে পারলৌকিক রহস্য এসেছে। আর 'ক্ষুধিত পাষাণে' মোহ তার নির্মম জাল বিস্তার করে ব্যক্তিকে

টেনেছে। আকর্ষণ দুয়েরই সমান। তবে ঘটনার অনিবার্য সংস্থানে রহস্য ও মোহ দুটি বৈশিষ্ট নিয়ে ফুটে উঠেছে। কোন বিরাট পুরোনো অট্টালিকা থেকে আমরা রাজারাজড়া বা নবাব বাদশাদের উত্থান ও পতনের কাহিনী খুঁজে পাই।

কেননা অট্টালিকা, প্রাসাদ শোষণ ও সঞ্চয়ের সাক্ষী, আবার নির্মম অতীতের সাক্ষী, * এবং এই সাক্ষী নীরবে দিনের পর দিন পৃথিবীর সব রকম জঘন্য কর্মের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা হিসেবে রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মহাকাল তার পঞ্চভূতের ক্রিয়াদ্বারা অট্টালিকা বা প্রাসাদকে একেবারে বিলুপ্ত করে না ফেলছে ততক্ষণ পর্যন্তই সমাজ-মন সেই অতীতের ঘটনাকে স্মরণ রাখছে। এখানে সামাজিক মনের, বিশেষ করে কর্মহীন অলস সামজিক মনের, একটি অসম্ভোব দাসত্ব সৃষ্টি হয়। যে ঘটনা ইতিপূর্ব্বে বলা সম্ভব হয়নি, তাই বারবার অতি রঞ্জিত হয়ে, অতি কথনের দোষে আসল সত্য নির্ব্বাসিত হয়ে, সামাজিক জীবের কাছে ফিরে এসেছে অদ্ভুত রূপে। একে ইতিহাসের অস্থি সংগঠন বলা যেতে পারে। কেননা একটি পর একটি অস্থি সংযোগ করে সাধারণ মানুষ একই কথা

* "Saha Jahan—(1628-1658)—In his reign—he was the contemprorary of Lonis XIV of France—came the climax of Moghal splendour, and in his reign also are cleary visible the seeds of decay. The famous Peacock Throne, covered with expensive jewles, was made for the king to sit on. Then also was made the Taj Mahal, that dream of beauty by the side of Jumna at Agra .. ..he did next to nothing to give relief to the Dekhan and Gujrat when a terrible famine raged there. (অথচ এই দুর্ভিক্ষ সময়কালের মধ্যেই তাজমহল তৈরী হয়েছিল।) His wealth and magnificence appear most odious when contrasted with the misery and poverty of his people... . ...Besides the Taj, he built the Moti Masjid —the Pearl Mosque in Agra; and the great Jami Masjid of Delhi, and the *Diwan-i-am* and *Diwan-i-khas* in the palace in Delhi. But behind this fairy-like beauty were the poverty-striken people, who paid for the palaces, though many did not even have mud huts to live in." Glimpses of World History. Jawaharlal Nehru—pp. 313-314.

বিভিন্ন ঢঙে প্রকাশ করেছে। কিন্তু এই যে কাহিনী সাধারণের কল্পনার মাঝে ঠাঁই নিয়েছে সেই সাধারণ কিন্তু অনন্তকাল ধরে সাধারণই থেকে গেছে। এই সাধারণের সমাজ থেকে যারা একবার উত্তীর্ণ হয়ে ওই উচ্চ শ্রেণীতে ঠাঁই পেয়েছে তারা আর ও কাহিনী বলেও না, শোনেও না। কারণ তারাওত ওই একই পথের পথিক। তাহলে কি হবে, কাহিনী অনন্তকাল ধরে চলেছে। সাধারণের গল্পের মধ্যে অতীতের অত্যাচার, ব্যাভিচার সবই যেন খোলা হাওয়ার মত মুক্তি পেয়েছে। সাধারণের প্রতিনিধি বৃদ্ধ করিম খাঁ মূল গল্পের মুক্তিদাতা। অর্থাৎ যে অত্যাচার ও অবিচারের কাহিনী দানবীয় শক্তির দাপটে মুক্তি পায়নি অথচ সবারই মনে সেই সব কাহিনীর মূল মন্ত্রটি জীবীত ছিল, তারাই বংশপরাম্পরায় কাহিনীকে সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে, প্রতি যুগে বলার ভঙ্গীতে কাহিনী নব-নব রূপ পেয়েছে। 'ধ্বংসপুরী'র গল্পে গ্রামবৃদ্ধদের উল্লেখ আছে। এই গ্রামবৃদ্ধরাই গল্পের অস্থি সংযোগ করে বিভিন্নরূপে বিভিন্ন ভঙ্গীতে কাহিনী প্রকাশ করেছে। এই কাহিনী শুনে-মিলে মনে হয় কি যেন একটা হারিয়ে গিয়েছে। তাকে অতীতের অসীম কালো গহ্বরের মাঝে শঙ্কাকুলচিত্তে খুঁজে বেড়াই। আবার নিজেদের অজ্ঞাতসারে একটা দীর্ঘ নিশ্বাসও ফেলি।

তার কারণ, ধ্বংসপ্রাপ্ত জরাজীর্ণ অট্টালিকা একটা অসীম কালের সাক্ষীরূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। যে-কোন একটি বিশেষ উদ্ধত গৌরবের উত্থান—সে বংশ গতই হোক বা ব্যক্তিগত হোক—নিপীড়িত সমাজ শ্রেণীর মনে ভয় মিশ্রিত বিস্ময় সৃষ্টি করে। আবার পতনও—সে বংশগত হোক বা ব্যক্তিগত হোক—শঙ্কাকুল অভাব ও দুঃখবোধ সৃষ্টি করে। এটা হল বাস্তব ইতিহাসের খণ্ড চেতনা। কেননা অত্যাচারী শোষকের সব ইতিহাস কখনও প্রকাশ পায়না। আবার পতনোম্মুখ বংশের দয়া-দাক্ষিণ্য শৌর্য-বীর্য

অতি উজ্জ্বল রঙে ফলাও হয়ে সমাজ শ্রেণী-মনের ওপর প্রভাবের ছায় ফেলে। শৌর্য-বীর্যের প্রতি মানুষের একটা বিস্ময় ও ভয়মিশ্রিত মমত্ববোধ আছে। অবিরত শৌর্য-বীর্য কাহিনীতে পুষ্ট মনে তখনই অভাব বোধ জন্মে যখনই আর কোন নতুন খোরাক পায়না। অর্থাৎ পতন সম্পূর্ণ হলেই সাধারণের মধ্যে অলীক কাহিনী বা কিছু সত্য কাহিনী আর প্রচারিত হয়না। কাজেই ইতিহাস খণ্ড খণ্ড রূপে সাধারণের মাঝে আসে। ইতিহাস চেতনাও তারই ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়। অবিশ্যি এই জাতীয় ইতিহাস চেতনা বৈজ্ঞানিক সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এর কারণ এর মধ্যে মূল দ্বন্দ্বের উপাদানটি সুস্পষ্ট নয়। সে যাই হোক।

একটি শ্রেণীর গৌরব, শৌর্য-বীর্য ও ঔদ্ধত্যকে এমন ভাবে মহৎ নামাবলীতে সাজিয়ে আর একটি শ্রেণীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের নিষ্পেষিত ব্যবস্থার মধ্যে যে ইতিহাসের আসল সত্যটি নিহিত রয়েছে তা তারা ভাবতেই পারে না। অথচ সাধারণ মানুষই সেই ঔদ্ধত্য, বিলাসের খোরাক জুগিয়েছে। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের গভীর রহস্যবাদেরও কিছু-কিছু সামাজিক সত্য প্রকাশ পেয়েছে।

> এক সময় ওই প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত—সেই সকল চিত্তদাহে, সেই সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তর খণ্ড ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া আছে ;
>
> বৃদ্ধ কহিল............কিন্তু তাৎপূর্ব্বে ওই গুলবাগের একটি ইরণী ক্রীতদাসীর পুরাতন ইতিহাস বলা আবশ্যক। তেমন আশ্চর্য এবং তেমন হৃদয় বিদারক ঘটনা সংসারে আর কখনো ঘটে নাই।"*

* 'ক্ষুধিতপাষাণ' গল্পগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথ। পৃঃ ৩১৭, জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ ; সপ্তম খণ্ড। পশ্চিম বঙ্গ সরকার।

বস্তুত এই ধরনের অত্যাচারের কাহিনী প্রায় সব সমস্ত রাজা রাজড়াদের, নবাব বাদশাদের উত্থান-পতনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কিন্তু এরা যখন সাহিত্যে স্থান পায় তখন লেখকের একটি বিশেষ ভঙ্গী তার মধ্যে ফুটে ওঠে। সাহিত্য রস সৃষ্টিতে এমন বৈচিত্র মেনে নিতে হয়। কেননা এ ত জীবিত কালের সমসাময়িক সমাজের চিত্র নয় যে পাঠক বাস্তব সত্যটা বিচার করতে পারবেন। পাঠকের মনকে সুদূর অতীতে টেনে নিয়ে গিয়ে লেখক তার নিজস্ব অনুভূতি বিশ্লেষণ বা বর্ণনা করেন। এখানে লেখক জীবনের দ্রষ্টা না হয়ে বিশেষ ভাবে ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েন। ফলে অনেক ক্ষেত্রে শোষক সামন্ত রাজা বা বাদশা তাঁর অস্বাভাবিক পতনের জন্য একটি ঢাকাচাপা সহানুভূতি পেয়ে থাকেন। তাঁর দম্ভপূর্ণ অসীম ক্ষমতা থেকে বিচ্যুতি বা বিরূপ কিছু পাঠকের হৃদয়ে দুঃখ বা সহানুভূতির সঞ্চার করে। আমাদের সমালোচকরা আলোচনার গুণে সামন্তপ্রভু বা রাজরাজড়াদের জন্য এই সহানুভূতি সঞ্চার করেন। আমাদের সমালোচকরাও এই সহানুভূতি সৃষ্টির কাজকে সাহিত্যের রসানুভূতি বলে বর্ণনা করে থাকেন। বর্ণনার চাতুর্যে ও চমৎকারিত্বে মহা দুষমন দাম্ভিক শোষককেও বহুলাংশে মধুর করে গড়ে তোলা যায়।

আমাদের সাহিত্যে এ জাতীয় আপাতমধুর চরিত্র সৃষ্টির অন্ত নেই। আবার লেখকের কলমে ছায়া অবলুপ্ত অতীত থেকে দীর্ঘ নিশ্বাস-স্রাবী আবহাওয়া সৃষ্টিরও অন্ত নেই। কিন্তু চৌধুরী মশাইর বর্ণনায় দেখা যায় একটি সুস্পষ্ট ইতিহাস চেতনা, সমাজের উচ্চ শ্রেণী গঠনের অদ্ভুত ক্রম।

> "বাঙলা দেশে—বিশেষতঃ এ অঞ্চলের পাড়াগাঁয়ে দুটি একটি আকারে বিরাট পুরী দেখেছি। সে-সব বাড়ি তৈরী হয়েছিল ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে—যে সময়

জনকতক লোক অনেক জমির মালিক হন ও প্রকাণ্ড ধনী হয়ে ওঠেন। এ সব বাড়ি মনোরম নয় আর তাদের কোন কারুকার্য নেই—আর পাথরে নয়, ইটে তৈরী বলে বহুদিন টি'কে থাকারও কথা নয়। কিন্তু এসব বাড়ি বিধ্বস্ত নয়—জীর্ণ। জরাজীর্ণ স্ত্রীপুরুষ দেখলে দুঃখ হয়—ভয় হয় না।*

এই সংক্ষিপ্ত অথচ ইঙ্গিত পূর্ণ বর্ণনার মধ্যে অর্থ ও মর্যাদার সৃষ্টির আভাষ রয়েছে। আমরা মনে করি সমগ্র গল্পের মধ্যে এইটুকুই বাস্তব উপাদান। কিন্তু লেখককে শেষ পর্যন্ত এদের জন্য দুঃখ করতে হয়েছে। এই তথ্যটুকু হল আসল শ্রেণী চেতনার বীজ।

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ থেকে বর্ধমানের রাজা পর্যন্ত সবাই ওই একই পদ্ধতিতে জমিদারী ও সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন। আজকে যেমন বহু বিচিত্র রকমের বাণিজ্য করে সম্পদ সৃষ্টির সম্ভবনা রয়েছে সেকালে তেমন ছিলনা। আর যেটুকু ছিল তা ইংরেজ প্রভুরা এবং তাদের শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীরই জুড়ে বসেছিলেন। কিন্তু আর একটি প্রশস্ত পথ ছিল, তা হল রাজ অনুগ্রহ। এই রাজ অনুগ্রহে কতটা হয় তার আদর্শ দৃষ্টান্ত হল শোভা বাজারের রাজপরিবার, আন্দুলের রাজপরিবার, আরও সব রয়েছেন তবে এদের মধ্যে রাজা নবকৃষ্ণের উন্নতি এবং সম্পদ বৃদ্ধির ইতিহাস বেশ চটকদার বলতে হবে। মুড়াগাছা পরগণার দরিদ্র ঘরের সন্তান নবকৃষ্ণ রাজসরকারে চাকুরী পাবার আশায় ফার্সি ভাষা আয়ত্ত করেন। প্রথমে হেষ্টিংসের শিক্ষক হিসেবে রাজসরকারে ঢোকেন। তখনও ইংরেজি ভাষার রাজত্ব শুরু হয়নি। তাই পূর্ব্বতন-নবাব সরকারের ফার্সি ভাষাই ছিল রাজসরকারে ঢোকবার প্রবেশ পত্র। কারণ তিনি মোটা ও মিহি রাজকর্মচারীর ভূমিকা খুব দক্ষতার সহিত অভিনয়

* 'ধ্বংসপুরী' গল্প সংগ্রহ—প্রমথ চৌধুরী বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। পৃঃ ১৫৬।

করেছিলেন ; উদ্দেশ্য, ধনরত্ন আহরণ। তা ওঁরা কম করেননি। সঙ্গে জুটল রামচাঁদ রায় ও আমীর বেগ খাঁ। এই তিন দুষ্ট গ্রহ সংযোগে যে ত্র্যহস্পর্শ হয়েছিল তাঁরাই মুর্শিদাবাদের নবাব প্রাসাদের ধনরত্ন অপহরণ করেন। সেই অর্থেই শোভাবাজারের রাজপরিবারের সৃষ্টি ; আন্দুলের রাজপরিবারের সৃষ্টি।

লেখক মন্তব্য করেছেন "পরস্বাপহরণ যাঁদের ধর্ম পরস্ত্রী অপহরণও তাদের নিত্য কর্ম।" এ কথাটা এক রকম আপ্তবাক্যের মত শোনায়। আর একে একটা আপ্তবাক্যের মত মেনে নিলেও ক্ষতি নেই। কেননা একটি কার্য (পরস্বাপহরণ) আর একটি কার্যকে (পরস্ত্রীহরণ) গুরু শিষ্যের মত অনুসণ করে। রাজা নবকৃষ্ণ সাতটি স্ত্রীলোকের পানি গ্রহণ করেন, তা বাদেও রাজার নামে নারী ধর্ষণের মামলা হয়েছিল বলে শোনা যায়। সামন্ততন্ত্রের যুগে রাজার পক্ষে যখন কোন সামন্তপ্রভুরা যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তখন আর একটি সমগোত্রীয় সামন্তপ্রভু (এখানে বন্ধু) সেই অবকাশে ডুবে থাকত বন্ধুপত্নীর সহিত প্রেম বিলাসে। এ জাতীয় সামাজিক ব্যাভিচার সে যুগের শৌর্য-বীর্য প্রকাশের নিদর্শনও বটে। কেননা নারীকে তখন নিছক ভোগের পাত্র হিসেবেই দেখা হত।

সম্ভবত এইসব বিশ্বাসঘাতক সামন্তপ্রভুদের লালসাপূর্ণ যৌন মত্ততা ঠেকাবার জন্য সেকেলে সামন্তপ্রভুরা যুদ্ধে যাবার প্রাকালে একধরণের লোহার বর্ম নারীদের নিম্ন অঙ্গে পরিয়ে রেখে যেত। পাছে কোন যৌনঘটিত বিপদ ঘটে।* এটা সেকেলে সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু গল্পের আসল মোড়টা সেখানে নয়। পাপপুণ্য সৎ-অসতের বিচার ও আত্মহত্যা, গ্রামবৃদ্ধদের কাছ থেকে যে কাহিনী টুক্‌রো টুক্‌রো পাওয়া গেছে তাই ইতিহাসাশ্রিত হয়ে উঠেছে।

---

* Cupid In War—Nripen Bose

ধ্বংসপুরীর মালিক তাঁর বন্ধুটিকে বধ করলেন ও (কেননা এই বন্ধুটির কাছেই বিশ্বাস করে অট্টালিকার মালিক তাঁর স্ত্রীর রক্ষণা-বেক্ষণের ভার রেখে গিয়েছিলেন।) নিজে আহত হয়ে ভূমিশায়ী হলেন। তখন তাঁর স্ত্রী আরও একটি বল্লম নিয়ে তাঁর স্বামীর বুকে বসিয়ে দিলেন। যে বিকট চীৎকার ও কান্না আজও শোনা যায় সে ঐ পত্নীর প্রেতাত্মার চীৎকার ও কান্না। মহিলাটির পতি হত্যার মুখ্য কারণ হল নিজেকে বাঁচান। যদি স্বামী বেঁচে থাকত তবে তাকে অশেষ যন্ত্রণায় জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারত। যখন দেখল প্রেমিক মারা যাচ্ছে, তখন তার পক্ষে কীটদ্রংষ্ট্র স্মৃতির তিলমাত্র অস্তিত্ব না রাখাই সম্ভব। বর্তমান চরিত্র আলোচনায় এ কথাটি মনে রাখলেই তথাকথিত পতি হন্তা কথাটির সুষ্ঠু প্রয়োগ হবেনা। কেননা গল্পটি আগাগোড়াই মানসিক বিকৃতির গল্প। এরপরে মহিলাটি যে হঠাৎ ধর্মকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং যে ধর্ম গুরুর সাহায্যে পরলোক থেকে প্রেতাত্মা নামবার ব্যবস্থা হয়েছিল সে নিজে ও এক বিকৃতমনা গুরু। কেননা গুরুটি দেখতে যেমন কুৎসিত, তেমনি আবার ছিলেন খঞ্জ, কুব্জ আর অতিরিক্ত মদ্যপায়ী। এহেন আদর্শ গুরুর সাহায্যে মহিলাটি পরলোক থেকে স্বামীর প্রেতাত্মা নামিয়ে সান্ত্বনা পাবার চাইতে প্রেমিক উপপতিকেই চাইত। কিন্তু গুরুও তেমনি গুরু বটে। নামিয়ে আনতেন স্বামীর প্রেতাত্মা স্বামীর প্রেতাত্মার উপস্থিতিতে মহিলা চীৎকার করে উঠতেন। আর উপপতিকে দেখতে না পেয়ে কাঁদতেন। এই কান্না তার পাগলামিরই নামান্তর বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। এখানেও সেই মন্ত্রবলের প্রভাবের কথা। এবং প্রেতাত্মা নামানোতে মন্ত্রবলেরই যথাযোগ্য শক্তির বিচার। এই অন্ধ বিশ্বাস আশ্রিত শক্তির নানাবিধ খেলা দেখতে পাওয়া যায় আরো অনেক গল্পে।

মন্ত্রবলের আর একটি গল্প 'ঝাঁপান খেলা'। আমাদের দেশে

ধর্মের মধ্যে রহস্য ও সাধনমার্গের মধ্যে রহস্য এটা খুব সাধারণ ঘটনা। কিন্তু এই রহস্যের প্রভাব সাধারণ মানুষের জীবনে অসীম। যে-কোন ঘটনাকে রহস্যের আবরণে আচ্ছাদিত করে সাধারণ অনভিজ্ঞ মানুষকে আকর্ষণ করা এ অতি সাধারণ কাজ। কিন্তু সাধারণ কাজটি কালক্রমে সাধারণ থাকেনি। জনসাধারণকে আকর্ষণ করা তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করা এ শুধু শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরাই করে এমন নয়, নিম্নতম শ্রেণী অর্থাৎ শোষিত শ্রেণীর মধ্যেও আছে এই সামাজিকব্যবহার। এটা সমাজের নীচুতলায় অনুকরণের ফল। যেমন উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে আছে তেমন আবার নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও আছে অনুকরণ স্পৃহা। তা নাহলে 'ধ্বংসপুরী' গল্পে অতিকদর্য ও কদাকার চেহারার খৃষ্টান গুরু মত্তপ হয়েও লর্ডপত্নীকে কিভাবে সম্মোহিত করল। এ আসলে ধর্মীয় রহস্যবাদেরই একটি অঙ্গ বিশেষ।

বন-জঙ্গল খাল-বিল নদী-নালার কাছে যারা বাস করে তারা সাপকে ভয় করবেনা, এমন কোন কথা নয়। আর ভয়েতে ভক্তি বিস্ময় সৃষ্টি হয় আর প্রসারিত হয় দুর্জ্ঞেয় রহস্যবাদের আবরণ। এই আবরণ ভেদ করে আসল সত্যটি কখনই প্রকাশ হয় না, এই ভয় মিশ্রিত রহস্য আছে বলেই সাপুড়ে ওঝাদের অন্য চোখে দেখে সবাই। সাপের ঐ অতি ভয়ঙ্কর বিষদাঁতকে উপড়ে ফেলে তার উপর প্রভুত্ব করার আপ্রাণ চেষ্টাতেই একটি সামাজিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ মানুষ ওঝাদের সাপ বশ করার অপূর্ব্ব কলা-কৌশল দেখে সাপের ওঝাদের বিশেষ সমীহ করে চলে। সমাজের সাধারণের কাছে অতিরিক্ত ভয় মিশ্রিত সমাদর পেয়ে অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিল এই সাপুড়ে শ্রেণীটি। ওঝা মাত্রেই দেখা যায় দুর্মুখ, গেঁজেল মদো-মাতাল। তাদের চরিত্রের এই সব গুণগুলির সঙ্গে আবার একটা গভীর ঔদাসীন্যের

পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীকান্তের অন্নদা দিদির স্বামীর কথা স্মরণ করুন। তবেই এই কথার সারবত্তা অনুভব করা যাবে।

'ঝাঁপান খেলা'টা আসলে সাপের ওঝাদের নিজেদের খেলা, এ অঞ্চলে (পশ্চিমবঙ্গে) বিষ্ণুপুরের ঝাঁপান খেলার সুনাম আছে। অসহায় আদিম মানুষ একদিন আপন আত্মরক্ষার দায় নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ সৃষ্টি করেছিল। সাপকে হাতে না মেরে মন্ত্র-তন্ত্র তুক্‌তাক্ দিয়ে জব্দ করা যায় কিনা এই-ই ছিল বোধ হয় মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু কালক্রমে এই কৌশলে মাবার প্রক্রিয়াই তন্ত্র-মন্ত্রে পরিণত হল বোধ হয়। এখানে আমাদের অনুমানের ওপব নির্ভর করা ছাড়া সঠিক কারণ খুঁজে বের করা মুস্কিল। আর এ আলোচনায় সে জাতীয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানেব অবকাশ নেই। কিন্তু এই সাপেব বিষমন্ত্র, সাপেব বিষ নামাবার প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি সুন্দর কূটনীতির সন্ধান পাওয়া গেছে। শত্রুর শত্রু আমার মিত্র। এই কূটনীতির খেলা সাপের মন্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। সাপের শত্রু হল বেঁজি আর ময়ূর। এদের সাধ্যসাধনা করে সপক্ষে রেখে সাপের ওঝা মন্ত্র পড়ে সাপের বিষ নামায়। বিনতা নন্দন গুরুড় সাপের শত্রু। বেঁজিও সাপের শত্রু, মন্ত্র ছড়ার মধ্যে তাদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

"বেঁজি বলে অহিনী তোরে আমি কাটি।
কালোয়ার কালকূট বিষ মোরে দেয় বাটি॥
মনসার মন্ত্রতে তোমায় ফুঁয়ে করলাম জল।
দেখি তুই এইবারেতে কোথা পাস্ স্থল॥
মনসার মন্ত্রেব তেজে বিষ জল হয়ে যায়।
গরুড় স্মরণে বিষ কিছু নাহি রয়।"

* 'সাপ' নামক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত পৃ : ২৪৯। সাপ : শ্রীঅবনীভূষণ ঘোষ শিক্ষাভারতী—কলিকাতা-৯

এই ঝাঁপন খেলার মধ্যে ধর্মীয় প্রভাবের পবিচয় অতীব স্পষ্ট। বস্তুত সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা মনসাকে স্মরণ করে এদেশে অনেক সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে এবং সে সাহিত্যের মূল সুর মানবিকতা নয়—মা রক্ষে কর। তোমাব বোষে পড়লে আব রক্ষে নেই। এ হচ্ছে আতঙ্ক ও ভয়েব ভক্তিব সাহিত্য। যতগুলি মঙ্গলকাব্য বচিত হযেছে তাব প্রধান সুব দেবতাব মহিমা। এই মহিমা বিস্তাব করতে প্রতিযোগী বিবোধীকে পীডন, আর ভক্তকে নানা পার্থিব যন্ত্রণাব মধ্য দিযে অনুগ্রহ প্রদর্শন। রাজদণ্ড যেমন অনুগতপ্রার্থী ও বিবোধীকে দুই জাতীয় সামাজিক ও বাষ্ট্রীয় মূল্যাযন করে বিচাব করে, দেবতারাও কৃপা সেই ধাঁচেই করে থাকেন। তাব কাবণ দেবতা মানব মনেবই সৃষ্টি। মহিমা প্রদর্শন ও নিগ্রহ কবণ এ দুটি বাজরাজডাদেব কাছ থেকে সাধাবণ মানুষ চিরকাল পেযেছে, তারই পবিপূর্ণ ছবি তাবা ছন্দে ও সাহিত্যে রেখে গেছে। এক কথায—গভীব সামাজিক দৃষ্টিবোধ থাকলেই বাজশক্তিকে বাদ দিয়ে—অন্য শক্তিব আধাব সৃষ্টি করা সম্ভব। এবং প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় যেমন-যেমন পীডন ও অনুগ্রহ মানুষ রাজা-রাজড়া কাছ থেকে পেতো তাকেই ছন্দে সুরে সাজিয়ে কাব্য সৃষ্টি কবত। মঙ্গলকাব্য অন্য একধরনের গভীব সমাজবোধ। বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে সব রকম সামাজিক ব্যবহারের ধাঁচগুলি দেবতা ও দেবতা বিরোধীদেব মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছিল। বিজয গুপ্তের মনসা মঙ্গলে আছে নিজ কার্য উদ্ধারেব জন্য মা মনসা নটী সেজেছিলেন। এই ঘটনাকে আজকের সামাজিক পাবিপার্শ্বিকে স্থাপন করে একটি নাবীর জীবনকে বিচাব করুন! শুধুমাত্র দেবত্ব আরোপ ব্যাতিরকে ঘটনাটা ব্যক্তির জীবনে কি ভয়ঙ্কর। কিন্তু ভয়ঙ্কর সামাজিক মনোবৃত্তি মনসামঙ্গল বচনার যুগেও ছিল। অর্থাৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোন পন্থাই নিকৃষ্ট

নয়। এর নাম সামাজিক কূটনীতি। কিন্তু এটা রাষ্ট্রচেতনার কাছ থেকেই ধার করা বলতে হবে। মহাভারতের যুগ থেকে এই রাষ্ট্রচেতনার প্রভাবিত সামাজিক কূটনীতির বিরতি নেই। বস্তুত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কূটনীতি জন্মসূত্র হল আপদ ধর্ম। এ বিষয় মহাভারত সেরা গুরু। এত গেল মা মনসার পূজা প্রচারের পালা; এর নীতি ও দ্বন্দ্বের কথা। কিন্তু শ্রেণীরা কিভাবে রহস্যাশ্রিত ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয় তার খানিকটা ইঙ্গিত—বস্তুত সেটেই বাস্তব—প্রমথ চৌধুরী মশাই গল্পের মধ্যে দিয়েছেন। এবং তার সঙ্গে চরিত্রের বে-হিসাবী দিকটাও দেখিয়েছেন। ঝাঁপান খেলার পশ্চাদপট বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক মনসামঙ্গল কাহিনীর ইঙ্গিতটুকু দিয়েছেন। তাতে করে চরিত্রের ধর্মের মধ্যে অর্থাৎ বীরবলের চরিত্রের মধ্যে ও মানসিক গঠনের মধ্যে—সেই বেহুলা লখিন্দরের কাহিনী বেঁচে আছে। বীরবল আসলে জাত সাপুড়ে নয়। তবু সে সাপ খেলত চমৎকার। সম্ভবত এটেই তার চরিত্রের বেহিসেবী বাহাদুরী আর এ জাতীয় :বেহিসেবী সাহস না থাকলে ঐ শ্রেণীর মধ্যে ব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ করে না। এত বুদ্ধিজীবির ব্যক্তিত্ব নয় যে অর্থ ও বুদ্ধির চাতুরী দিয়ে সব মাৎ করা সম্ভব। এই শ্রেণীটি কর্মযোগীর শ্রেণী। বাস্তব কাজ দেখিয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা আদায় করতে হবে। কাজেই বীরবলকে (গল্পের নায়ক) যদি তার গুপ্ত ক্ষমতার অত্যাশ্চর্য দিক সবার সামনে তুলে ধরতে হয়—তবে এমন-একটা-কিছু করতে হবে তা যুগপৎ ওস্তাদী ও সাহসের পরিচয় দেবে। বীরবলের মন এদিন দুটোর জন্যই প্রস্তুত ছিল। কারণ সেদিনটি একটি বিশেষ দিন। যে দিন বেহুলা ইন্দ্রের সভায় নেচে লখিন্দরকে বাঁচিয়েছিল, সেই দিনই এই খেলা খেলতে হয়, সাপুড়েদের পাঁজিতে এদিন ক্ষণ কবে লেখা হয়েছে তা সাধারণের জানবার কথা নয়। পূর্ববঙ্গে

(বর্তমান বাঙ্গালা দেশে) সাপের ওঝাদের মধ্যে একটা প্রচলিত বিশ্বাস আছে। ভাদ্রমাসের অমাবস্যার দিন যার যা সাপের মন্ত্র জানা আছে, তা স্মরণ করতে হয়। সারারাত ধরে ওঝারা সাপের মন্ত্র নাকি মনে-মনে আউড়ে চলেন। আর একটা প্রচলিত বিশ্বাস আছে এই দিন সারারাত বেহুলা জেগে লখিন্দরের লোহার বাসর পাহারা দিয়েছিল। মনসার নিদ্রালী দেয়ার ফলে রাতের শেষে দিকে বেহুলা যখন প্রায় নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়েছে তখন কালীনাগ সেই লোহার বাসরে ঢুকে লখিন্দরকে দংশন করে। এই লোহার বাসর চাঁদ বেনে অতি সতর্কতার সঙ্গে সুদক্ষ কুশলী যন্ত্রীকে দিয়ে তৈরী করিয়েছিলেন। কিন্তু মনসা সেই যন্ত্রীকে স্বপ্নে ভয় দেখায়। সে ভয় ভীত হয়ে কুশলযন্ত্রী সামান্য একটু রন্ধ্র পথ রেখেছিল। সেই রন্ধ্রপথেই কালীনাগ প্রবেশ করে লখিন্দরকে দংশন করে। কিন্তু কালীনাগ লখিন্দরকে দংশন করে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসতে পারেনি। বেহুলা তন্দ্রা ভেঙ্গে দেখে যে কালীনাগ রন্ধ্রপথে পালাচ্ছে। তাই দেখে বেহুলা তার লেজ কেটে দিয়েছিল।

এ জাতীয় কথিত কাহিনী বাদেও বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গলেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য ভাবভাষা অন্য ধরণের। ঝাপান খেলার এই বিশেষ দিনটি মঙ্গল কাহিনীর সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি অপূর্ব্ব বিষাদ মিশ্রিত স্বাদের সৃষ্টি করেছে। সেই রাতে বেহুলা ইন্দ্রের সভায় নেচে লখিন্দরকে বাঁচিয়েছিল বটে। কিন্তু সেই রাতে বীরবল বাঁচেনি। এই ঘটনাটির মধ্যে দুটি সুরের সংজ্ঞা আছে। একে অন্যকে যেন ঢেকে রেখেছে রহস্যের আবরণে। যে সাপুড়েরা এই বিশেষ দিনটিতে খেলতে বসে তারা কিন্তু লখিন্দরের জীবন প্রবাহ মুক্ত হয়েছে জেনেই বিষধর সাপ নিয়ে খেলতে বসে। বিষদাঁত ভাঙ্গা নেই এমন সাপকে নিয়ে খেলাতেই ত বাহাদুরী।

এই জাতীয় বাহাদুরীর মধ্যে জীবন মৃত্যুর প্রতি বীরবলের একটা গভীর ঔদাসীন্য আছে। নিজের দক্ষতাকে মহৎ করে দেখানোর মধ্যে যে চরিত্রের বৈশিষ্ট আছে বীরবল তাই পরীক্ষা-নীরীক্ষা করে দেখছিল। সাপ যেদিক থেকে যে ভাবেই ছোঁবল মারুক না কেন, বীরবলের অঙ্গ কখনও ছুঁতে পরে নি। এই মারাত্মক বিষাক্ত সাপ নিয়ে খেলা করাই হলো জীবনের আনন্দের স্বাদ। এই স্বাদ গ্রহণ করার জন্য বীরবলের মন উদার ভাবে প্রস্তুত ছিল। পূর্বপূর্ব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এই উন্মত্ত বেহিসেবী আনন্দে অধীর হয়েই বীরবল খেলেছে। এ খেলার কলা কৌশল পারদর্শীতাই বীরবলের জীবনের সম্বল। একে অক্ষয় সম্বল বলা যেতে পারে। কিন্তু এর সঙ্গে যে বীরবলের জীবনগ্রন্থী বাঁধা রয়েছে তা কে জানত? কিন্তু বীরবলের চরিত্র হল যে কাজে বিপদ আছে সেই কাজে হাসি মুখে ঝাঁপিয়ে-পড়া। বস্তুত পক্ষে বীরবল তার স্বভাবের প্রকৃত পরিচয় দিয়েছিল। অতিমাত্রায় মদ্যপানের ফলে ঝগড়ু সাপের সঙ্গে ইয়ারকি করতে গিয়েছিল, আর তাকে বাঁচাতে গিয়েই নাকি সাপের ছোঁবল বীরবলের হাতে পড়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, বীরবল তার অতি সুন্দর ভয়ঙ্কর খেলায় হারেনি। হেরেছে উদার মানবিকতাকে সম্মান দিতে গিয়ে। এই মানবিকতা রক্ষায় জীবনের অপরাজেয় পারদর্শীতার পরিচয় সে দিয়েছে। সে নিজের পারদর্শীতার প্রতি যদি কৃপণের মত আসক্ত থাকত তবে হয়ত সে ঐ জাতীয় মৃত্যু বরণ করত না। কিন্তু জীবনের মূল্য পারদর্শীতার চেয়ে অনেক বড়। সেই মূল্যের সন্ধান করতে গিয়েই বীরবল মহৎ চরিত্র লাভ করেছে।

প্রকৃত অর্থনৈতিক অধিকার বঞ্চিত মানুষের মনোজগৎটা সহসা বাইরে থেকে ধরা পড়ে না। সহজাত এবং সাধারণ মন যখন দিনের-পর-দিন পীড়িত হতে থাকে তখন মন নামক যে 'বস্তু'টি তা বাহ্য ঘটনার চাপে ভিন্ন রূপে দেখা দেয়। এবং এই রূপটি অনেক ক্ষেত্রে বীভৎস আকার ধারণ করে। বাইরে থেকে এর যখন বিচার চলে তখন এই জাতীয় কিছু মন্তব্য হয়

সমস্যা

> "এ অকিঞ্চিৎকর ঘটনার গল্প আপনাদের কাছে বলবার উদ্দেশ্য এই যে—মা বলেছিলেন চিনিবাস মানুষ নয়, দেবতা। আর উপেনদা বলেছিলেন সে মানুষ নয়, পশু। আমি বহুকাল বুঝতে পারিনি, এঁদের কার কথা সত্য। এখন আমার মনে হয় যে, চিনিবাস দেবতাও নয় পশুও নয়—শুধু মানুষ, যে অর্থে ঝোট্টন-লোট্টনও মানুষ, তুমি আমিও মানুষ।"*

এ মন্তব্যের মূল সূত্রটি খুঁজতে গেলে ঝোট্টন ও লোট্টন গল্পটির আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ ও বিবৃতি দেওয়া প্রয়োজন। কেননা বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকৃত অর্থনৈতিক সত্তা বঞ্চিত মানুষের এমন বীভৎস অথচ প্রকৃত বাস্তব রূপ খুবই কম মেলে। প্রয়োজনে মানুষ বীভৎস হয়, কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে যে বীভৎসতা সহজরূপ ধরে আসে তার পরিচয় খুব কমই মেলে। মানুষ যে প্রকৃতই পরিপার্শ্বিক অবস্থার দাস আর তার মনোজগৎ যে, কালপ্রবাহের মত অতীত সামাজিক ইচ্ছা-অনিচ্ছার ইতিহাস দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকে —তা 'ঝোট্টন ও লোট্টন' গল্পটি গভীর ভাবে উপলব্ধি না করলে

* 'ঝোট্টন ও লোট্টন' গল্পসংগ্রহ—প্রমথ চৌধুরী, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃষ্ঠা ৩৯১।

বোঝা যায় না। প্রমথ প্রতিভার এটি একটি অপূর্ব নিদর্শন, মনে হয় সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

গল্পটি দৈহিক আকারে স্বল্প কিন্তু ইঙ্গিতে ভরপুর। গল্পের রূপ সজ্জার বর্ণনায় যে সব উপাদান এসেছে তার একটি বিশেষ স্থল ঘোড়ার আস্তাবল। লেখক যে সময়ের কথা বলছেন, তখন গাড়িও ছিলনা, ঘোড়াও ছিলনা। এমন কি অমন বিরাট স্থানে মানুষও বাস করত না। অর্থাৎ একটা অতীত ইতিহাস নিয়ে শূন্যতা বিরাজ করত। পুরোণো ঘরের (এখানে আস্তাবল অর্থে) এই জন শূন্যতা সম্বন্ধে লেখক কিছু বলেন নি, কিন্তু আকারকে অর্থাৎ আস্তাবলের দৈহিক অস্তিত্বকে, বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি বলে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত আস্তাবলের কালে অর্থাৎ অর্থ গৌরবের কালে, এই স্থানে আভিজাত্যের চিহ্নস্বরূপ জুড়ি গাড়ি ছিল। সে আভিজাত্য নেই। তা বলে তা নিয়ে কোন দীর্ঘ নিশ্বাসও ফেলেন নি লেখক। বরং একটা অস্বাভাবিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি বলে বাঙ্গ করেছেন তিনি। এই অসঙ্গতি লেখকের মনে উদয় হয়েছে। এটেই বাস্তব বোধের পরিচয়। লেখক যে শ্রেণী থেকেই আসুন-না-কেন মাঝে-মধ্যে এই গভীর মানবিক সমাজ-বাস্তব বোধের পরিচয় দিতে দ্বিধা করেননি। বর্তমান আলোচ্য গল্পের সমাজ-বাস্তব বোধ অতি নির্মম ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি এবং প্রশ্ন করেছেন মানবিকতার।

এই আস্তাবলের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া বর্ণনায় কাদের কতটা দান ছিল তারও একটি খতিয়ান এর থেকে পাওয়া যাবে। ইঁদুর, ছুঁচো, টিকটিকি, আরসোলা। আর সেখানে যাতায়াত করত গো-সাপ, ঢোঁড়া-সাপ, গিরগিটি—যাদের দেখলেই বিলিতি শিকারী কুকুর ছুটে এসে ধ্বংস করত। কুকুরের ধর্ম

কুকুর প্রতিপালন করেছে। এতে আর বলার কি আছে। কিন্তু লেখক বলছেন, হত্যার জন্যই হত্যা করত কুকুরটি। কাজেই সে ইংরেজী মতে খাঁটি sportsman. যাক, এই আবহাওয়ায় একদিন একটি নতুন ঘটনার উৎপাৎ শুরু হল। সেই পড়ো আবর্জনাপূর্ণ আস্তাবলের মাঝে এক 'মহা চিৎকার' শুরু হল। লেখকের লেখা পড়ে মনে হয় মুহূর্তে এক বিশেষ সামাজিক সত্তা নিয়ে আস্তাবলটি সজীব হয়ে উঠল। বস্তুত তাই হয়েছিল। সেই আস্তাবলের কদর্য আবহাওয়ায় দুই মানবিক-অধিকার-বঞ্চিত মানুষের আবির্ভাব হল। চিনিবাসের গলার আওয়াজে লেখকের 'আমি' আত্মার কান সেদিকে সজাগ হয়ে রইল। কেননা পশুর উপযুক্ত বাসের স্থান থেকে হঠাৎ চিনিবাসের গলায় 'নিকালো' 'নিকালো' শব্দ। লেখক নিজেই অনুধাবন করেছেন যে বিষয়টি কোন জন্তু, জানোয়ারকে ঘিরে নয়, মানুষকে ঘিরেই ঘটনার আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে। সেই ঘূর্ণাবর্তে পতিত মানুষ দুটি কিন্তু 'মানুষ' পদবাচ্য নয়, বলা যেতে পারে। কেননা, তাদের দৈহিক বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে ঃ

> "দুজনেই সমান অস্থিচর্মসার, আর দুজনেই মুমূর্ষু। রোগেই হোক, উপবাসেই হোক, তারা শুকিয়ে-মুকিয়ে আমচুর হয়ে গেছে। তারা যে চিনিবাসের কথা অমান্য করছে, তার কারণ তাদের নড়বার চড়বার শক্তি নেই। এমন কঙ্কালসার মানুষ জীবনে আর কখনো দেখিনি। তারা যে এখানে চলে এল কী করে, তা বুঝতে পারলুম না। বোধ হয় আকাশ থেকে পড়েছিল।"

* 'ঝোট্টন ও লোট্টন' গল্প সংগ্রহ—প্রমথ চৌধুরী, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। পৃষ্ঠা ৩৮৮।

আত্মীয় উপেনদা এবং চিনিবাসের কণ্ঠে প্রায় একই সুর ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়েছে, পরগাছাবৃত্তির যে, নিয়ম এখানে তার কোন ব্যত্যয় হয়নি। এবং ফোর্থ ক্লাসের 'আমি' প্রভুত্বের সীমায় উঠে লেখক নিজ চরিত্রের যা বিকাশ সম্ভব তাও তিনি করেছেন। কিন্তু গল্পটির বিভ্রান্তিকর বিষাদের দিকটি হল, ওরা যে কোন দেশ থেকে এসেছে তা বলতে পারে না। 'কুছ ইয়াদ নেই' মৃতপ্রায় নর-কঙ্কালের এর চেয়ে আর কি উত্তর থাকতে পারে? ভিক্ষুকের কোন দেশে আছে বলে ত আমাদের জানা নেই। কাজেই দেশের কথাটা এখানে 'অবান্তর'। অবিশ্যি জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন আছে। একথা লেখকও স্বীকার করেছেন ওই নরকঙ্কাল দুটির জীবনের প্রয়োজন আছে। শুধু পেটের 'ক্ষিধে' আর বেঁচে থাকবার 'ইচ্ছে'—এই দুই মনোভাবকে দোসর করে তারা হয়ত বেরিয়েছিল এমন যাত্রায়, যেখানে ভূগোল কোন সীমানা মানে না। অন্নহীনের দেশও নেই ইজ্জতও নেই। কারণ ওই দুটি তারা সবার আগে খোয়ায়।

দারিদ্র্যের এমন যুগল মিলন প্রায়ই ঘটে থাকে। কাজেই সামাজিক জীব হিসেবে ঝোট্টন ও লোট্টন উভয়ই ভাসমান 'ট্যাপা পোনা', অবিরাম স্রোতে ভেসেই চলেছে। এরা যে নিজেদের ইচ্ছায় ভেসে যাচ্ছে এমন নয়, স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে। দারিদ্র্য তার উন্মত্ত ফণা তুলে ইচ্ছা শক্তির বিনাশ অনেক আগেই ঘটিয়েছে। এখন জীবন ধারণের শক্তি আস্তে-আস্তে পাঁপড়ি মত ক্ষয়ে যাচ্ছে। কাজেই ঝোট্টন ও লোট্টন গভীর সামাজিক ক্ষত ও ক্লেদাক্ত স্থান থেকে জন্ম নিয়ে সাজানো-গোছানো সমাজের মোহনায় এসে ঠেকে গিয়েছে। এখন যে-কোন সময় ডুবে যাবার প্রশ্ন। ডুবে যাবার আগে এক কদর্য অপমানকর ইতিহাস লেখকের কলমে চিত্রিত হয়েছে। এই স্বল্প পরিসরের

মধ্যে উপেনদার চরিত্রটি অদ্ভুত বলতে হবে। কেননা, উপেনদা সন্দেহের বেলুন, সে নিজস্ব সন্দেহ-বায়ুতে নিজে সব সময় উর্দ্ধমুখী। আমাদের মনে হয় উপেনদার মন্তব্যের মধ্য দিয়ে চিনিবাসের চরিত্র খানিকটা ফুটে উঠেছে। উপেনদা তাঁর অনবদ্য হিন্দিতে জবাব দিলেন। "তুমি চোরের উপর বাটপাড়ি করতে গিয়া থা, না পেরে এখন ঝোট্রনকে খুন করতে চাতা হ্যায়—। ঐ লোটার লিয়ে তুমি লোট্রনকো পিঠে করে হাসপাতাল যাতা আতা থা। আর তার মরবার পরও লোট্রনের জাত-বিচার নেই করকে তার মড়া কাঁধে করেছ। তোমি মানুষ নেহি হ্যায়—পশু হ্যায়।" চিনিবাস জিজ্ঞেস করলে, "মুর্দ্দা কোন জাত হ্যায় বাবুজি?"

এরপর চিনিবাস ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল—উপেনদার কটু কথা শুনে নয়, হারানো ধন লোটার দুঃখে!"

এখানে লোটা এবং তার দখলী স্বত্ব নিয়ে মানব সামাজিক জীবনের একটি অতি আদিম মনোবৃত্তির খেলা সম্পূর্ণ হয়েছে। সে খেলায় ঝোট্রন জিতেছে, চিনিবাস হেরেছে। এবার খেলার পশ্চাদপট নিয়ে কিছু বিশ্লেষণ করা যাক। কারণ এসব গল্পে দারিদ্র্যকে দেখানো হয়েছে বটে। কিন্তু মানব চরিত্রকে সেই মৌলিক উপাদান থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে অন্যত্র উপস্থাপিত করা হয়েছে। জীবনের গ্লানির প্রতি সচেতন সামাজিক ঘৃণা উদ্রেক না করে একটা নির্বিকার অমানুষীবৃত্তি তুলে ধরা হয়েছে।

দখলী স্বত্বের মোহে আকৃষ্ট সামাজিক মন এইভাবেই সাড়া দেয়। লোট্রনের রুগ্ন দেহটা যখন চিনিবাস কাঁধে নিয়ে রোজ হাসপাতালে যেত তখন সবাই ভাবত চিনিবাস মানুষ নয়, দেবতা। এমনতর সামাজিক দায়-দায়িত্ব খুব কম সামাজিক জীবই প্রতিপালন করে থাকে। তাছাড়া মানুষের মধ্যে দেবত্ব আরোপ তার কর্মের জন্য সম্ভব হয়। কিন্তু সেই কর্মটির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সব ক্ষেত্রে

স্ব-প্রকট নয়। কিছু তার আভাষে অথবা ইঙ্গিতে থাকে। চিনিবাসের চরিত্রের মধ্যে আভাষ যাই থাক ইঙ্গিত ছিল না। সে ইঙ্গিত প্রথমে ধরা পড়েনি। লোট্টনের মৃত্যুর পর চিনিবাস আসল রূপ প্রকাশ করল। সেই লোটার স্বত্বের জন্য আপ্রাণ দ্বন্দ্ব ঘোষণা করল চিনিবাস। তাদের দখলে, এই শ্রেণীটির দখলে, শুধুমাত্র একটি লোটা থাকলেই তারা সন্তুষ্ট থাকত। এবং পূর্ব দাম্পত্যের ইতিহাস চিনিবাসের মুখে যা প্রকাশ পেয়েছে তাতে দেখা যায় যে, সে স্ত্রীর কাছে একটি লোটার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। ঘটনাচক্রে মনে হয় যে চিনিবাসের এমন আর্থিক অবস্থা ছিলনা যে, সে একটা লোটা কিনে স্ত্রীকে উপহার দেয়। সবরকমের বঞ্চিত মানুষ চিনিবাস লোটা অধিকার করার অপূর্ব সম্ভাবনা লোট্টনের সেবাযত্নের মধ্য দিয়ে দেখতে পেয়েছিল। উপেনদা যখন বল্লেন যে, লোট্টনকে খাবার না দিয়ে চিনিবাস তার সবটা খেয়ে নিয়েছে। উপেনদার এসব মন্তব্যের অন্তরালে 'ইতর' চিনিবাসকে আরও 'ইতর' করে ভাববার বিষয়টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এবং উপেনদার প্রতি পাঠকের মন অনেকটা বিরূপ হতে চায়। কিন্তু পরবর্তী ঘটনায় এবং চিনিবাসের এক্‌রারে [স্বীকারোক্তিতে] চিনিবাসের অন্তর যে গভীর স্বার্থের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল এটাই প্রমাণিত হয়। সে যখন ঝোট্টনের সঙ্গে ঝগড়ায় নিমগ্ন ছিল তখন অন্তত একটি কথা কবুল করেছে যে, লোট্টন মরবার আগে তার যাবতীয় সম্পত্তি (লোটা আর কম্বল) তাকে অর্থাৎ চিনিবাসকে দিয়ে গেছে। মৃতের জবানবন্দী অনুসারে চিনিবাসই লোটা ও কম্বলের স্বত্বাধিকারী। এই অধিকার সাব্যস্ত হবার পথে ঝোট্টন বড় বাধা। কিন্তু লোট্টনের সম্পত্তির ওপর ঝোট্টনের দাবী ওয়ারিশ সূত্রে। তাহলে মূল ঘটনাটা দেখা যাচ্ছে, ওয়ারিশান সূত্রে সম্পত্তি দখল আর দখল সেবা যত্ন সূত্রে। এখন দেখা যাচ্ছে সেবাযত্ন উদ্দেশ্যবিহীন নয়।

চিনিবাসের সেবা-যত্নের মারফৎ দখলী স্বত্বের প্রচেষ্টা তার কথায় প্রমাণ করা যেতে পারে কিন্তু আরও অকথিত অনেক ইঙ্গিত রয়েছে। তা এর বিবৃতিকে ছাড়িয়ে আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে।

> "ইতিমধ্যে মা এসে জিজ্ঞেস করলেন—এত দুঃখ কিসের ?
>
> চিনিবাস বলল্লে, "হামরা জরুকো বোল্‌কে আয়া যে একটো আচ্ছা লোটা লা দেগা। বেগর লোটা ঘর যানেসে—উস্‌কো সাথ লড়াই হোগা। ও ভি হামকো মারেগা,—হাম ভি উস্‌কো মারেগা। ওঠো ছোটা জাতকে ঔরৎ হ্যায়। উস্‌কো মারনেসে ও ভাগেগা। তব্ হামারা ভাত কোন্ পাকায়গা ? হাম ভুক্‌সে মরেগা।"*

ভারাক্রান্ত মনের এই মন্তব্য যা চোখের জলের মধ্য দিয়ে সমাজের কাছে পাত্রস্থ করা হয়েছে তা সর্বহারা মানুষের সামাজিক জীবনের একটি বিষণ্ণ ভয়াবহ দিক। দুঃখের যবনিকার এই অংশ গভীর বেদনার উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে উত্তোলিত হয়েছে। যবনিকা উন্মুক্ত হবার পর শুধুই জীবনের নিঃসীম অন্ধকার দেখা যাচ্ছে। অথচ এই অন্ধকারে সমাজ কোন দিন আলোক বর্তিকা নিয়ে আসবে না। কেউ অন্ধকার দূর করে নতুন মানুষ সৃষ্টির কাজে লাগবে না। কিন্তু এই সর্বহারা মানুষ যদি সমাজ ও শ্রেণী সচেতন হয়ে উঠে তবে অবিচারের সূত্র ছিন্ন করে নতুন গ্রন্থীবন্ধনে জীবনকে সুসংহত করে তুলবে এবং সেইটেই হবে তার বিপ্লবী চেতনার কর্মকাণ্ড।

* ঝোট্টন ও লোট্টন গল্পসংগ্রহ—প্রমথ চৌধুরী, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ। পৃষ্ঠা ৩৯০।

সাধারণত সমালোচকের অতিরিক্ত চিন্তা করার অধিকার কম —'আছে বস্তু নিয়ে বিষয়।' তার অর্থ এই নয় যে গল্পকার যা দিয়েছেন তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। চৌধুরী মশাইয়ের প্রতিভার গুণ হল যেমনটি চিত্র আসে তেমনটি করে সাজিয়ে দাও। মানবতার অপমানকে তিনি তুলে ধরেছেন। কিন্তু সেই মানবতার মধ্যে প্রতিরোধের মশালটি জ্বালতে রাজী হননি। তার প্রধান কারণ উনি মুখ্যত establishment প্রতিনিধি। তাবৎকালের মধ্যে establishmentএর প্রতিনিধিদের তরফ থেকে যত সাহিত্য রচিত হয়েছে তার মাধুর্য ও কূটনৈতিক দিক হল যেমনটি ছিল তেমনটি থাক। এর যেন নড়চড় না হয়। যারা দুঃখ বিপদ ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে দুরূহ জীবন যাপন করছে তাদের দুঃখের চিত্রটাই দেখানো হোক। যেন এমন ইঙ্গিত লেখায় কোথায় না আসে যাতে করে সর্ব্বহারা শ্রেণী বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাহলে প্রচারের বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে সাহিত্য। এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের মহৎ প্রতিভারাও সর্ব্বহারা শ্রেণীর স্বপক্ষে কলম ধরনেনি। তবুও বিশ্বজোড়া শোষিত মানুষের চিত্র যখনই আঁকতে গিয়েছেন তখনই তাঁরা সেই আদি মৌলিক কথাটি এসেছে। ঝোট্টন ও লোট্টনের মত মানুষেরা এককালে মানুষ ছিল ত? যে দুঃখের কবলে পড়ে, যে অভাবের করাল গ্রাসে পড়ে তারা খাঁটি মানব চরিত্র হারিয়ে মহান মানব সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, সেই দুঃখ ও অভাব থেকে ত্রাণ পাবার জন্য মানব জীবনের কোন সামাজিক কর্ম আছে কিনা? এই মৌলিক প্রশ্ন সাহিত্যের দরবারে করবার অধিকার সাহিত্যিকদের রয়েছে। যেখানে এই প্রশ্ন যথাযথ আবেগ নিয়ে আসবে না। সেখানে মানব সত্তার প্রতি একটি বিশেষ অবিচার হয়েছে বলে মেনে নিতে হবে।

সম্পত্তির উৎপত্তি এবং সম্পত্তির বিনাশ এই দুটি ঘটনাই সমাজ জীবনকে, পারিবারিক জীবনকে প্রভাবিত করে। মানুষের চরিত্রের বিকাশে, মনের সূক্ষ্ম ভাব ধারার প্রকাশে, এই দুটি মৌলিক উপাদানের অসীম দান। যেহেতু আমরা মনকে তার বাহ্য পারি-পার্শ্বিক, পার্থিব প্রাচুর্য্য ও অনটন থেকে দূরে রেখে মনকে নির্বিকার সত্তার মত কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করি সেই কারণেই মনকে অহৈতুক প্রাধান্য দিয়ে এক স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করি এবং যার দুর্দ্দশাকে সাহিত্যের ভাণ্ডারে উপাদেয় বস্তু বা চরিত্র বলে প্রমাণ করি। আর সেই দুর্দ্দশার কাহিনীই সাহিত্যের অনেকখানি জুড়ে বসে আছে। সমাজের মধ্যে—এখানে বৃহত্তর পাঠক সমাজের মধ্যে—রূপ-রস গন্ধ-স্পর্শ সমন্বিত এক মহা স্বাতন্ত্র্যের জয়গান করি ; তার পতনের সঙ্গে দুঃখ বোধ, বিষাদ ব্যথা সবই অনুভব করি। মানসিক বিচারে সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যের উত্থান পাকা-পোক্ত জমিদারী অথবা প্রচুর অর্থাগম হলে হয়। সেই স্বাতন্ত্র্যেরই পতন ও স্ফীত দম্ভের খোরাক জোগাতে গিয়ে—মামলা-মোকদ্দমা উকীল-ব্যারিষ্টারকে পয়সা-খাওয়ানো, যৌন ব্যাভিচার, বিকৃত মস্তিষ্ক, খুন-জখম সবশুদ্ধ পতন, মায় সম্পত্তি শুদ্ধ পতন ঘটাতে হয়। সম্পত্তি কখনও ধ্বংস হয় না। ভূ-সম্পত্তির সৃষ্ট বস্তুর রকমফের হয় মাত্র। সেই সম্পত্তি আর একজনের কাছে গিয়ে আবার একটি নতুন স্বাতন্ত্র্যের জন্মদান করে। ধনতান্ত্রিক সমাজে এই জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের জন্ম ও মৃত্যু অবিরাম হচ্ছে। এবং সাহিত্যও এর জন্ম মৃত্যু নিয়ে কম কারবার করেনি। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যের জন্মের মূল সূত্রটি নিপীড়িত জনগণের কাছে যে রয়েছে একথা স্বাতন্ত্র্যবাদীরা কখনও স্বীকার করেননি। তাদের জীবন দর্শন ব্যক্তির মহিমায় মহিমান্বিত।

ভাববাদী দার্শনিকেরা ব্যক্তিরঅন্তরে অনন্ত অলৌকিক শক্তির আধার খুঁজে পেয়েছেন। সমাজ-জীবনে ব্যক্তির অলৌকিকত্ব ততক্ষণ পর্যন্তই সম্ভব যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তির অপ্রতিহত ক্ষমতার (অলৌকিক অর্থে) উৎস নিপীড়িত সাধারণ শ্রেণী সমাজ-সচেতন না হয়ে ওঠে। তাদের—নিপীড়িত শ্রেণীর—সত্তার সচেতন বিকাশ লাভ করলেই অলৌকিকত্বের উদ্ধত স্রোতে ভাটা পড়ে। ব্যক্তির উদ্ধত চেতনাকে শুধু সমষ্টির সমাজ চেতনাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারা যায়। সাহিত্যের চরিত্রগুলির সঙ্গে এর কিছু যোগ আছে। কিন্তু নিপীড়িতশ্রেণীর সমাজচেতনার যোগ নেই।

কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য তার প্রতিবিম্ব নিয়ে বাড়তে থাকে, 'যোগাযোগ' উপন্যাসে মুকুন্দলাল আর তাঁর পত্নী নন্দরাণী মূল স্বাতন্ত্র্যের এ ওর প্রতিবিম্ব হিসেবে দেখা দিয়েছিল। ঘটনাচক্রে একটি প্রতিবিম্ব প্রবল হয়ে মূল স্বাতন্ত্র্যের (মুকুন্দলালের) প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই স্বাতন্ত্র্যই 'যোগাযোগ' উপন্যাসের মূল সুর। বিপ্রদাস, মধুসূদন ও কুমু এরাও এই স্বাতন্ত্র্যের ভীড়ে জমে গিয়েছে। এদের মধ্যে মধুসূদনের উগ্রতার কারণ তাঁর সম্পদ উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়ে চলছে। বিপ্রদাসের ভাটার টান, তার কারণ তমস্সুকদাস হালওয়াইদের কাছে একটা মোটা অঙ্কের দেনা। এর সামাজিক প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্টি হয়েছে—বিবাহবন্ধন, মানসিক বিচ্ছেদ, বিষণ্ণ দাদা বিপ্রদাসকে ঘিরে কুমুর স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করার চেষ্টা। কুমু তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে নারীত্বের নামে।

> "কুমু বললে, "আমাকে ওরা ইচ্ছে করে দুঃখ দিয়েছে তা মনে কোরো না। আমাকে সুখ ওরা দিতে পারে না আমি এমনি করেই তৈরি। আমিও তো ওদের পারব না সুখী করতে। যারা সহজে ওদের সুখী করতে পারে

তাদের জায়গা জুড়ে কেবল একটা-না-একটা মুশকিল বাধবে। তা হলে কেন এ বিড়ম্বনা? সমাজের কাছ থেকে অপরাধের সমস্ত লাঞ্ছনা আমিই একলা মেনে নেব, ওদের গায় কোন কলঙ্ক লাগবে না। কিন্তু একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব, আমিও মুক্তি নেব; চলে আসবই এ তুমি দেখে নিয়ো।"*

এই যে আমিত্বের উক্তি; আর একটা আমিত্ব থেকে জন্ম নিয়েছে। মুকুন্দলাল-নন্দরাণী এর পশ্চৎপট। কিন্তু বিপ্রদাসের আমিত্বের মহিমার মধ্যে একটা বিষাদ-জনক দীর্ঘশ্বাস আছে। পারিবারিক আভিজাত্যের জন্য সেই আমিত্ব মাঝে-মধ্যে উগ্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু স্নেহষিক্ত মন নুয়ে পড়েছে। এই নুয়ে-পড়া মন নিয়ে বিপ্রদাস চিরটাকাল কাটিয়ে গেল। যে সত্য তার অন্তরে ছিল তার বেশীরভাগ আচ্ছাদিত ছিল বংশগত গৌরব দিয়ে। এই গৌরব তার শ্রেণীকে এক সময় বাঙ্গালাদেশে ক্ষমতার ও খ্যাতির শীর্ষে তুলেছিল। এদেশে ব্রিটিশ যুগে Land Holders' Association ছিল। সেকালে এই এসোশিয়েশানের মারফৎ শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রজা শাসনের কাজ সমাধা করতেন এবং এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রতিযোগিতার তীব্র মনোভাব—একে অন্যকে ধ্বংস করে দেবার চেষ্টা, হয়ত সামাজিক জীবনে মিথ্যা কুৎসা রটিয়ে নিজেদের পারিবারিক মর্যাদা সৃষ্টি করা। এখানে 'যোগাযোগ' গল্পের পশ্চাৎপট রচনায় দেখা যাচ্ছে পারিবারিক কুযশ একটা পরিবারকে স্থানচ্যুত করতে যথেষ্ট

* 'যোগাযোগ'—রবীন্দ্র রচনাবলী—জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণ—পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পৃষ্ঠা ৭১০

সহায়তা করেছে। বস্তুত অবসরভোগী সমাজের এটেই হল 'মহাপুণ্যের কাজ'। অন্য প্রতিযোগীর দোষ দর্শন এবং তার যথাযথ প্রচার। কিন্তু এই প্রচার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কাদের কাছে চলত? বৃহত্তর সমাজ এদের মাঝে ছিল না। তাই এদের অর্থাৎ অবকাশ-ভোগী শ্রেণীদের কাজ ছিল পূজাপার্বন, বিবাহ ও মোকদ্দমা দিয়ে পারিবারিক গৌরব বৃদ্ধ করা। এই সব প্রতিটি সামাজিক ক্রিয়াতেই অতি খরচের একটা পর্ব আছে। এই অতিখরচের পর্বে প্রজাদের তেমন কোন ভূমিকা থাকে না। কিন্তু এর ফল হিসেবে এরা বিক্রি-বাটা হয়ে যায়, প্রভু বদল হয়। রাজাশক্তি যেমন অন্যের রাজ্য জোর করে দখল করে, বিজয় করে রাজ্যের সীমানা প্রভুত্ব বৃদ্ধি করে—জমিদাররাওতেমনি করত। রাষ্ট্র শাসক শ্রেণীর কাছে এরা ছিলেন সহায়কগোষ্ঠী। তাই এদের রাজানুকরণে আচার-ব্যবহার গৃহের সাজ-সরঞ্জাম।

> "বৈঠক খানায় মুকুন্দলাল বসেন গদির উপর, পিঠের কাছে তাকিয়া। পারিষদেরা বসে নীচে, সামনে বাঁয়ে দুই ভাগে। হুঁকাবরদারের জানা আছে, এদের কার সম্মান কোন রকম হুঁকোয় রক্ষা হয়—বাঁধানো আবাঁধানো, না গুড়গুড়ি। কর্তা মহারাজের জন্যে বৃহৎ আলবোলা গোলাপ জলের গন্ধে সুগন্ধি।
>
> "বাড়ির আর-এক মহলে বিলিতি বৈঠকখানা, সেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলিতি আসবাব। সামনেই কালো দাগধরা মস্ত এক আয়না, তার গিলটি করা ফ্রেমের দুই গায়ে ডানাওয়ালা পরীমূর্তি হাতে-ধরা বাতিদান। তলায় টেবিলে সোনার জলে চিত্রিত কালো পাথরের ঘড়ি, আর কতগুলো বিলিতি কাঁচের পুতুল। খাড়াপিঠ-ওয়ালা চৌকি, সোফা, কড়িতে

দোদুল্যমান ঝাড় লণ্ঠন, সমস্তই হল্যাণ্ড-কাপড়ের মোড়া। দেয়ালে পূর্বপুরুষদের অয়েলপেন্টিং, আর তার সঙ্গে বংশের মুরুব্বি দু-একজন রাজপুরুষের ছবি।"*

শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে উচ্চবর্ণ জমিদারদের মহামিলনে যে সভ্যতা, সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতায় গড়ে উঠেছিল, এটা তার সাংস্কৃতিক প্রভাবের দিক। ইতিপূর্বে হুঁকোবরদারদের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এবং এর ব্যবহারের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নও তাতে বেশ ফলাও করে বলা হয়েছে—এটা এ্যাংলো-নবাবী আমলের আভিজাত্যের দিক। নবাবী আভিজাত্য ও ব্রিটিশি আভিজাত্য এ দুইয়ের সংঘর্ষ রাজ পুরুষদের মধ্যে থাকতে পারে, কিন্তু কৃপা এবং অনুগ্রহপ্রার্থী জমিদারশ্রেণীর মধ্যে থাকেনা। তবুও একটি দ্বন্দ্বের দিক থাকে। পুরোনো পরিবারে একবার একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতি রীতিমত দখলী স্বত্ব পেলে তাকে ঠেলে ফেলে দেয়া এত সহজ নয়। বাড়ির দেউড়ির পার হয়ে অন্দর মহলে ঢুকতে নতুন সভ্যতাকে বেশ বেগ পেতে হয়। তবে রাজ অনুগ্রহ চিরকালই একটি সূক্ষ্ম ও একটি জটিল সুবিধাবাদ সৃষ্টি করে, তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে উপায় নেই। কেননা রাজদণ্ড যার হাতে, আইনের গঠনের ভার যার হাতে, তার হাতে অনেক সময় সভ্যতা ও সংস্কৃতির চাবিকাঠিটিও থাকে। আইন দণ্ড, রাজদণ্ড যার হাতে তাকে এড়ানো জমিদার শ্রেণীর পক্ষে কোন ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। কেননা, জনসাধারণের উপর, প্রতিপক্ষের ওপর আইন-এড়ানোর কূটবুদ্ধির প্রয়োগই ত হল এই শ্রেণীর আসল কর্ম।

* 'যোগাযোগ'—রবীন্দ্র রচনাবলী : জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার : পৃষ্ঠা ৫৫৮-৫৫৯।

ইতিপূর্বে সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করেছি। এবারে ঘটনার মোড়টা ঠিক সেই পথই নিয়েছে। অর্থাৎ মৃন্ময়ী দেবদেবীরা জমিদার প্রভুদের খেয়ালের খোরাক যোগাতে শুরু করেছেন। ঘোষালেরা চাটুজ্যের ওপর একটা উপর-ছক্কা মাতব্বরী নেবার জন্য প্রতিমার আকার দু-হাত বাড়িয়ে দিল, ফলে চাটুজ্যের মৃন্ময়ী প্রতিমার খানিকটা হ্রস্ব হল। আর সুদীর্ঘ আকারের যে দেবী তিনি এলেন ঘোষালদের বাড়ীতে। আমাদের দেশের সাধারণের সমাজ সম্বন্ধে যার এতটুকু অভিজ্ঞতা আছে তিনিই জানেন, পাড়ায়-পাড়ায় গ্রামে-গ্রামে সাধারণের মধ্যে কার প্রতিমা কত উঁচু তা নিয়ে বরাবরই একটা জনসাধারণের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব ছিল। আর এই সূত্রে জমিদারদের মধ্যে এ সামাজিক অভিমান থাকা খুবই স্বাভাবিক। এই সামাজিক অভিমানের খোরাক জোগাতে সাধারণ মানুষের মন্তব্য অনেকখানি কাজ করত। যে কালে জমিদাররা গ্রামে বাস করতেন সেকালে তারা পার্শ্ববর্তী দু-চারখানা গ্রামে কিনে সবাইকে একরকম কেনা গোলামের মত রেখে দিতেন। জমিদারদের অভিমান ছিল তাদের আশেপাশের সব লোকেরাই তাঁবে থাকবে। এবং সুনামের ঢাক এরা পেটাবে। প্রয়োজনে সুনাম ঢাকের বাত্য প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারের কানে পৌঁছে দিয়ে তার গাত্র দাহ সৃষ্টি করবে। সেকালের জমিদারদের এমন ধরণের অশোভন আচরণ, ইচ্ছাকৃত বিরোধ ডেকে আনার অদম্য স্পৃহা ছিল। এই স্পৃহাকে ইন্ধন যোগাত চাটুকার পারিষদেরা। এই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে যদি আমরা প্রতিমার ছোটবড় তৈরী করার ইতিহাসটা গ্রহণ করি তবে সামাজিক বিরোধের সূত্রপাত্রটা কোথায় বুঝতে পারব। ছোট মাপের প্রতিমার দল বড় মাপের প্রতিমা দলকে ঠেকালে পথে তোরণ সৃষ্টি করে। এ জাতীয় ছেলেমানুষী বিরোধ কিন্তু তখনই

সম্ভব, যখন সামাজিক মন একেবারে কূপমণ্ডুক হয়েছে। বিরোধের তুচ্ছতা যতই হোক এর পরিণতি যে কত ভয়াবহ তা পরের ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে। দেবী সেবারে তার 'বরদ্দ রক্তের' চেয়ে কিছু বেশী পেয়ে খুশী হয়েছিলেন—কেননা ঐ রক্তপাত থেকে মামলার সূত্রপাত্র। তার ফেউ উকীল, মোক্তার ত্রিশূলনয়ণা ঋণদেবী এলেন সবটাই আঁচলে গুটিয়ে নিতে।

এই সূত্র ধরে এল বড়বাজারের তমস্মুকদাস। রবীন্দ্রনাথ বিপ্রদাস জমিদারের চরিত্রে উচ্ছৃঙ্খলতার আঁচড় কাটেন নি। কিন্তু অনার্জ্জিত অর্থের এমন বিপুল আভিজাত্য বিলাস—সে কথাও তিনি বলেছেন। সেই অর্থের দ্বীপটি যে চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছিল তা শুধু পিতৃ বিয়োগের পর বিপ্রদাস: টের পেল। পারিবারিক সম্মানের শেষ ভগ্নাংশ কুমুর বিয়ে, তাকে সামালতেই বিপ্রদাস হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। বিলেত-বাসিন্দা ভাই অর্থের জোর তাগিদ দিচ্ছে, এবং শেষ পর্যন্ত নিজ অংশ (ছোট ভাইয়ের) বিক্রি করে টাকা চাওয়ার দাবীও এসেছে। প্রকৃত পক্ষে বিপ্রদাসকে রবীন্দ্র নাথ জীইয়ে রেখেছিল এক গুচ্ছের অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে। এই অর্থনৈতিক সমস্যায় কণ্টকিত বিপ্রদাস কোন ব্যক্তিগত প্রেম, ভালবাসা বা আকাঙ্ক্ষার জন্য একটি দিনও নিমগ্ন ছিলনা। জীবনের পবিত্রতার দিকটা এত মধুর যে তা মাঝে-মাঝে মনে হয় যদি বিষাদের খাদ এর মধ্যে না থাকত তবে হয়ত এত মধুর হত না। বস্তুত তাই, মুকুন্দলালের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ক্লেদ বিপ্রদাসের শ্বাস রোধ করেছে। তাকে একদিনের জন্যও বিষাদক্লিষ্ট মন থেকে রেহাই দেয়নি। কিন্তু বিপ্রদাসকে রবীন্দ্রনাথ এমন ব্যাথাপাণ্ডুর করে গড়েছিলেন কেন? বিপ্রদাসের জীবনে বাঘ ও পাখী শিকার ছাড়া আর নতুন কোন খেয়াল দেখা যায় না। তাও শেষের দিকে পাখী শিকার ছেড়ে দিয়েছিলেন। মনের দিক থেকে

বিপ্রদাস বৈরাগী, শুধু মাত্র ভগ্নী প্রেম তার জীবনের সম্বল। এই সম্বল রক্ষা করতে আবার সেই বংশগত মর্যাদায় ফিরে এসেছে।

পারিবারিক জীবনের এ এক অদ্ভুত পরিণতি। যার জন্য সে দোষী নয়, সেই অন্যের দোষের বোঝা তাকেই বহন করে বেড়াতে হয়। মানুষ নিজেও জানেনা, কেন কিং কারণে এ দোষের বোঝা তার ঘাড়ে এলো। আসলে মানুষের এ অজ্ঞতা সমাজের অপ্রকট সূক্ষ্ম কার্যকারণ শৃঙ্খলতা থেকে এসেছে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চেতনার স্রোত উন্মুখর হয়ে ওঠেনি বলেই মানুষ নিজে বুঝতে পারছে না। পূর্বপুরুষের কর্ম পরবর্তী পুরুষের নাভিশ্বাসের সৃষ্টি করে, আবার সমাজ জীবনে অঢেল অবসরও এনে দেয়। পারিবারিক কাঠামো যতক্ষণ মোটামুটি টিকে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই অমোঘ কার্যকারণ শৃঙ্খলের কাজটা সম্পূর্ণ ধরা পড়ে না। কিন্তু অর্থনৈতিক বনিয়াদের ওপরকার রচিত কাঠামো যখন নড়বড় হয়ে ওঠে তখন স্থানে-স্থানে ফাটল দেখা দেয়।

বিপ্রদাস চাটুজ্যেদের যৌথ পরিবারকে সেই ফাটল-ধরা অবস্থায় পেয়েছে। এর নাম পিতৃদত্ত সম্পদ। এ সম্পদের পরিধি আছে, গভীরতা নেই। তার অর্থ সম্পদ স্থিতি-স্থাপকতা হারিয়ে হেজে-মজে গিয়েছে। তাই পরিধি ব্যপ্তিলাভ করেছে। দীঘির যেমন, যখন মজে আসে, তখন তার পাড় ভেঙ্গে কেমন যেন সীমানাটা ব্যপ্তি লাভ করতে থাকে, তখন পাশের সাধারণ জমির সঙ্গে সেই পুরোণো অভিজাত পাড়ের কোন বৈষম্য থাকেনা। যখন বৈষম্যহীন, বৈশিষ্ট্যবিহীন বিশাল দিঘির (এখানে জমিদারী অর্থে) অবস্থা দঁাড়িয়েছে এইরূপ তখন বিপ্রদাসের আসল ভূমিকা হল মাত্র উত্তরাধিকার। এখানে ব্যক্তিগত প্রেম বা ভালবাসার কোন স্থান নেই। সমগ্র পরিবারটাই তখন মানের খুঁটি। তার গলায় দড়ি দিয়ে

বিপ্রদাস প্রাণ পাখীকে আপনি ফাঁস লাগাচ্ছে। যেদিন কাউকে তিলমাত্র খবর না দিয়ে বিপ্রদাস নিজে ঘোড়ায় চেপে মধুসূদনকে ষ্টেশনে আনতে গেল সেদিন তার নিজস্ব সত্তা ছিল না। তখন তার পারিবারিক যৌথ সত্তা তার মধ্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। পূর্ব-পুরুষের পাওয়ানা রুচি, শিষ্টাচার, ভদ্রতা তার ব্যক্তিগত সত্তা চেপে রেখে একটি ঐকান্তিক ইচ্ছা তাকে ঐ ষ্টেশনের পথ ধরিয়েছিল। ওটা ব্যক্তিসত্তা মানসে যে খুব অপমানকর ব্যাপার তা কুমুর পরবর্তীকালের অবাক বিস্ময় প্রকাশদ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। যখন মোতির মা তাকে জানালেন যে তার অমন সুপুরুষ দাদা ষ্টেশনে এসেছিলেন মধুসূদনকে অভ্যর্থনা জানাতে, অথচ মধুসূদন আসবার আগে একটা খবর মাত্র দিয়েও আসেনি—বা ভাবি আত্মীয়ের প্রতি এ জাতীয় ব্যবহার করা অসমীচীন মনে করেনি। অবিশ্যি মধুসূদনের কথাও ভেবে দেখবার। সে অতি তির্যক ভঙ্গীতে যে কথার অবতারণা করেছে তা হল এই, "দেখুন, একটা কথা মনে রাখবেন, এসেছি আমার পূর্বপুরুষদের জন্মভূমিতে—আপনাদের দেশে না।" এই মন্তব্য পারিবারিক ইতিহাসের দিক থেকে নির্মম সত্য। কেননা এই ঘোষালেরাই পারিবারিক লাঞ্ছনা নিয়ে গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। আর চাটুজ্যেদের কর্তাবাবুরা তাতে কম ইন্ধন যোগাননি।

আজ নতুন সামাজিক পারিপার্শ্বিকে এক পক্ষ (অর্থাৎ বিপ্রদাসের পক্ষ) ইতিহাসকে ভুলে যাবার চেষ্টা করছে। আর এক পক্ষ (অর্থাৎ মধুসূদনের পক্ষ) সেই ইতিহাসকে নতুন রঙে সাজিয়ে রূপ দিতে চেষ্টা করছে। এই সব অতি করুণ, অতি বিষাদ অথচ যন্ত্রণাদায়ক ঘটনাবলীর শীর্ষে রয়েছে এদানিং কালের উগ্রতা, আর অতীতকাল থেকে পাওয়া সহনশীল ভদ্রতা। এই দুটি গুণেরই অবতারণা কালে-কালে প্রতিটি ঘটনায় পরিস্ফুট

হয়ে ওঠে। আমাদের দেশের ভূমিভিত্তিক পারিবারিক কাঠামো, আর শিল্পভিত্তিক পারিবারিক কাঠামো—এ থেকে কেউই রেহাই পায় না। তাই মধুসূদনের উগ্রতার পাশে বিপ্রদাসের অবনম্র ভাবটি এত মধুর, আর মধুর শুধু নয় চিরায়ত সুন্দরের রূপে দেদীপ্যমান। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে মধুসূদনের উগ্রতা তীব্র কঠোর শক্তিবাদের এক মূর্ত্ত প্রতীক। মধুসূদনের জীবন আমদানী-করা অস্থির গতির সমষ্টিগত শ্রমের উপর নির্ভর করে। মধুসূদন শিল্পপতি গোষ্ঠী শ্রম ও সমষ্টিগত শ্রমকে খাটিয়ে নিজের শক্তিবাদকে প্রচার করেছে। কাজেই তার শোষক চরিত্রে কাঠিন্যের আবির্ভাব হয়েছে। আবার এদিকে বিপ্রদাসও পরশ্রমভোগী। কিন্তু এ শ্রম সতত চঞ্চল নয় বলেই চাষী সমাজ মাটির সঙ্গে একটি স্থায়ি মায়ার নীড় রচনা করে। সে তার উৎপাদনকেন্দ্রকে নিত্য দেখে সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে। এই সুখ দুঃখের মধ্য দিয়ে নিত্য দেখার যে সূক্ষ্ম অনুভূতি তা জমিদার বিপ্রদাস এড়াতে পারেন না। কাজেই দুয়ের আসল শেকড় দুই বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী স্থল ভূমিতে নিহিত রয়েছে। তাছাড়া আর একটি বিষয় বিচার করবার এখানে, তা হল ঘোষাল পরিবারের অবস্থার বিষয়, চাপে পড়ে একটি অতিবাস্তব social alienation অনেক পূর্বেই সর্পিল ঘটনাচক্রে ঘটেছে। এই যে সমাজ বিচ্ছন্নতা, তা সামাজিক ও আর্থিক কারণেই ঘটেছে। এই কূটঘটনাচক্র বাইরে থেকে সৃষ্টিতে চাটুজ্যে পরিবারের কম হাত ছিল না। কাজেই মধুসূদনের রুক্ষ মন, কঠোর, নীরেট উগ্রবৃত্তির পেছনে যে সামাজিক ইতিহাস সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে তার স্থান যথাযথ-ভাবে দেখা উচিত। মনে হয় মধুসূদনেরা কালের অপেক্ষা করছিল, অমনি সুযোগের জন্য ওৎ পেতেছিল।

যেমন নির্বিকার তেমন লোভী এই শিল্পপতিরা। নির্বিকার

মানবিকতাবিহীন শ্রমিকখাটুনির 'পরে নিজেদের ধনের বনিয়াদ সৃষ্টি করে। মধুসূদন সেই নির্বিকার গোষ্ঠীর মানুষ, আবেগহীনতা এখানকার শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সে ধর্ম বিপ্রদাসের সঙ্গে ব্যবহারে সে প্রমাণ করেছে। কিন্তু সে যে লোভী তাও প্রমাণ করেছে, চক্‌চকে হিংস্র দৃষ্টিতে ঐ চাটুজ্যে বাড়ির পানে তাকিয়ে। যদি মেয়ে আনতে হয় ঘরে বধূ করে তবে ঐ চাটুজ্যে বাড়ির মেয়ে চাই। ইতিপূর্বে বহু মেয়ের সম্বন্ধ এসেছে মধুসূদনের কাছে, কিন্তু কিছুতেই মন ভরে না।—গুণবতী, কুলবতী, রূপবতী। শুধু মাত্র একটি স্থির দৃষ্টি; একটি লক্ষ্য, এক তারকা চিহ্নিত হয়ে আছে মধুসূদনের জীবনে, সে তার কক্ষপথে আসুক এটেই বোধ হয় মধুসূদনের জীবনের চরম ও পরম সামাজিক লক্ষ্য।

ইতিহাসের এক অদ্ভুত জটিল চক্রজাল, কি করে যে এটা ঘটে তার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ এখানে সম্ভব নয়। আমরা সে পথে যাচ্ছি না। তবে এটা ঠিক বহু বছর আগেকার মানসিক দুঃখ যাঁরা পুষে রেখেছেন, বা গল্পাকারে পরবর্তী বংশধরদের কাছে বলে গেছেন তাঁরা নিজেরাও জানতেন না যে একটি জঘন্য সামাজিক মন তাঁরা তিলেতিলে তৈরী করে যাচ্ছেন। তাঁরা ক্ষোভে হোক বা দুঃখে হোক ইতিহাসটাকে বিকৃত করে নয়ত-বা অতিরঞ্জিত করে বংশধরদের কাছে বলে গেছেন। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় পরিবার-ভিত্তিক সমাজ জীবনে এই ইতিহাসটা মানসিক গঠনে অনেকখানি কাজ করেছে। নচেৎ মধুসূদন চোখ পাকিয়ে চাটুজ্যেদের বাড়ির মেয়ে চাই—একথা বলবে কেন। মধুসূদন জিততে চেয়েছিল, তার বৈশিষ্ট্য হল ঘা-খাও বংশের ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর, এই ভয়ঙ্কর নির্মম হিংস্রতা সে অর্জ্জন করেছে। অবিশ্যি এই নির্মমতা অর্জ্জনে তার শিল্পপতিত্বের মনোভাব অনেকখানি সাহায্য করেছে, কেননা কুলি-কামিন খাটিয়ে যে পয়সা তার মধ্যে

নির্ভেজাল, নির্বিকার ব্যক্তির স্পর্শহীনতা থাকে। ফলে মানুষ পাথরের নুড়িতে পরিণত হয়। মধুসূদন ধনের সাধনা করতে গিয়ে এই মানসিক অভ্যাস-যোগে আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু সত্যিসত্যি ইতিহাস কখনও চক্রাকারে পুনরাবৃত্তির পথে আসে না, তার কারণ ইতিহাস দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে-করতে স্বরচিত উন্নততর পথে ছোটে। এটা তার কর্মের গতি, কাজেই এরই চাপে পড়ে ঘাত ও প্রতিঘাত নতুন সংস্কার সৃষ্টি হয়েছে। সেটা কারুরই ঈপ্সিত বস্তু নয়। নতুন সৃষ্টি। চাটুজ্যে ও ঘোষাল পরিবারের দ্বন্দ্বের আবর্ত থেকে কুমু নতুন সৃষ্টি। এই কুমু বিপ্রদাসেরও মানসিকতার বাইরের বস্তু। মধুসূদন ত পরাজিত প্রার্থী, নিষ্ফল আক্রোশের ফানুষ। বস্তুতই মধুসূদন জয় করতে গিয়ে পরাজয় স্বীকার করল। এর গ্লানি তাকে স্পর্শ করেছে, কিন্তু কুমুকে এক নয়া স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। এ স্বাতন্ত্র্যের রূপ আছে, স্পর্শ নেই; তেজ আছে, গৌরব নেই। যারা কুমুকে ইবেসনীয় নারীত্ব দিয়ে দেখতে চান তারা দেখতে পারেন, আমরা তা মনে করি না। কেননা ইবসেনীয় নারীত্বের যে স্বাধীনতা সে স্বাধীনতা দ্বিতীয়বার জীবন যাত্রার ইঙ্গিত করে। কিন্তু এই স্বাধীনতা তপস্বিনীর স্বাধীনতা, আমারা তাতে বিশ্বাস করি বা নাই করি, কুমুর মনে তা স্বাতন্ত্র্য এনেছে কোন-একটা-কিছু ত্যাগকে কেন্দ্র করে। কি ত্যাগ, কেন ত্যাগ, আর ত্যাগের মুখ্য উদ্দেশ্যই বা কি এর সঠিক জবাব দেয়ার চেষ্টা না করাই ভাল। কেননা কুমুর চরিত্রের ধর্মপ্রবণতার দিকটাকে আমরা পলায়নপর মনের দৃষ্টি দিয়েই দেখে থাকি। তরুণী মনের শিবের উপসনা ঘুরিয়ে বর উপসনা। এটা অতি বাস্তব সত্য। কিন্তু সমাজ পরিবেশে সে যে মানসিক অভ্যাস সৃষ্টি করেছে তাতে স্বাতন্ত্র্যবোধ একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে। উপসনাকে সে গ্রহণ করেছে নিজে সজাগ তপস্বিনী হয়ে, আমাদের দেশের সাধিকারা

বা তপস্বিনীরা আত্মনির্ভরশীল, চির স্বাধীন অকুতোভয় ব্রহ্মবিহরিণী বলে দাবী করে থাকেন। এই. রহস্যাবৃত্ত জীবন ধারার কতটা স্পষ্ট কতটা অস্পষ্ট তা তর্কাতীত নয়। কিন্তু এই জীবনধারা সেকালে অনেক নারীকে আকৃষ্ট করেছে। তবে ব্রহ্মবিহারিণী না হয়েও অনেকে মনোবিহারিণী হয়ে নিজ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে থাকতে পারে তা কুমুকে দেখে মনে হয়। কুমুকে আমাদের স্বচ্ছন্দ মনোবিহারিণী শ্রেণীতে ফেলতে কোন দ্বিধা নেই। সে যে আত্মজগৎ সৃষ্টি করেছে তা মধুসূদনের ব্যবহার ক্রিয়ার-ফলেই। এ মধুসূদনের চেয়ে অনেক দৃঢ় ও নম্র স্বাতন্ত্র্য হয়ে কুমুতে আত্মপ্রকাশ করেছে।

একটা নঙর্থক ব্যক্তিত্ব বিকাশে মধুসূদনের দান অপরিসীম বলতে হবে। বস্তুকে ভেঙ্গে তার ভেতর থেকে তীব্র, তীক্ষ্ণ কোন-কিছু সৃষ্টি করাই বোধ হয় মধুসূদনের জীবন ধর্ম। এই ধর্মের ক্ষেত্র ইতিপূর্বে যাই থাক না কেন, কুমুর মধুসূদনের প্রাসাদে প্রবেশের পর থেকেই কুমুই সেই ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল। অতি আত্ম-কেন্দ্রিক নঙর্থক ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট মধুসূদন ভাঙ্গা কাঁসার মত বাজতে লাগল। এখানে 'নঙর্থক ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট কথাটি' বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা মধুসূদন শুধুমাত্র নঙর্থক-ই যদি হতো তবে এতবড় বিশাল বাণিজ্যিক সত্তার রচনা করতে পারত না। তার বাণিজ্যিক ধর্ম ও গার্হস্থ্য ধর্মের মধ্যে কোথায় কোন প্রভেদ ছিল। কিন্তু ঘটনা এমন ভাবে শৃঙ্খলিত হয়ে রয়েছে এর থেকে অন্য একটি বিশেষ ধর্মকে ছেদ করে দেখানো যায় না। অথচ প্রভেদ রয়েছে নিশ্চয়ই। যে-মানুষ অফিস (নিজের অফিস) বেরুতে না পারলে নিজের মাইনে কাটে সে-মানুষের বাণিজ্যিক ধর্মটা যে কি তা সহজেই অনুমেয়। আমাদের মনে হয় এটা মধুসূদনের চরিত্রের বাইরের দিক। ধন সঞ্চয়ের কঠোর সাধনায় সে কাপালিকের মত নির্মম। এটা তার আত্মনিপীড়নের

ধর্ম। ধন সঞ্চয়ের একটা যুগে, এমনি ধরণের আত্মনিপীড়ন করে কেউ-কেউ আনন্দ পান। নিজের সিন্দুকে খত লিখে টাকা ধার করে এমন দৃষ্টান্ত আমাদের ধনতান্ত্রিক সমাজ বিরল নয়।

মধুসূদন নিজের অজ্ঞাতেই বোধ তুই ধর্মকে এক করে ফেলেছে অর্থাৎ বাণিজ্যিক ধর্ম আর সামাজিক ধর্ম নিজের মানসিক পঙ্গুতা হেতুই এক করে ফেলেছে। একই খাতে ভাটার টানে আবার উজান স্রোত চলেছে। এই উজান আর ভাটার টান-এর অন্তবর্তী এমন একটা সময় নিশ্চয়ই এসেছিল যখন মধুসূদন নিজের জন্য একটি প্রভাবকে মেনে নিয়েছে। যদিও অনেক অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে-করতে মানতে হয়েছিল। বিপ্রদাসের প্রেরণায় যে ব্যক্তিত্ব কুমুর মধ্যে অতি ধীরে প্রসারিত হয়েছে তার প্রভাবের রেশ মধুসূদনের কাছে অসহ্য। কিন্তু এর তীব্র অসহিষ্ণুতার প্রকাশভঙ্গী সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক কায়দায়। এর ভাব ভাষা সবই ব্যবসায়ীক মনোবৃত্তির দ্বারা আচ্ছন্ন। এই আচ্ছন্ন ও অগভীর মানবিক চেতনা নিয়ে মধুসূদন নীলার আংটি হরণ করল। এর পেছনে মধুসূদনের একটি ব্যাবসায়ীক মন আছে। কেননা নীলা সম্বন্ধে তার একটা ভীতি আছে। নীলাকে সে পরাজয়ের অগ্রদূত হিসেবেই দেখেছে। তার জাগতিক ভাল মন্দের একটি উৎস বলে এই নীলার আংটিকে দেখেছে। তাই একে অর্থাৎ নীলার আংটিকে হরণ করার নীচুতা তার মনকে স্পর্শ করেনি। এটা তার বাণিজ্যিক ধর্ম। ও ধর্মের ন্যায়-অন্যায় আর সামাজিক ধর্মের ন্যায়-অন্যায় এক নিক্তিতে মাপা যায় না। অথচ কার্যক্ষেত্রে ঘটনাটা বাণিজ্যিক + সামাজিক হয়ে দাঁড়াল। তাই আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে এই তুটো ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানো যায় না। অথচ তুটো ধর্মই স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিরাজ করছে।

রবীন্দ্রনাথ কুমুকে বিষাদ ছন্দের মাধুরী দিয়ে গড়েছেন।

কুমুব জীবনের ওপর পারিবারিক অর্থনৈতিক সমস্যার আঘাত এসেছে। সে অনেকটা প্রত্যক্ষভাবেই বুঝতে পেরেছে যে দাদা বিপ্রদাসের গুরুতব সমস্যার মধ্যে সে নিজে একটি বিষম সমস্যা। তাব বিবাহটাই সামাজিক দায়িত্বপূর্ণ বির্ষম ঘটনা এ পরিবারের সামগ্রিক সত্তাকে নাড়া দিয়ে ঘটতে বাধ্য। এই অনিবার্য ঘটনার কবাল ব্যাদন থেকে নিজেকে এড়াবার জন্য সে দৈব কৃপা ভিক্ষা কবেছিল। কিন্তু ঘটনাব ক্রমিক অনিবার্যতা, অন্যত্র কোথায থবে-থরে সাজানো হযে আছে। কুমু এটা জানত না যে তাকে এই অনিবার্য-ঘটনাব সিঁড়ি ভাঙ্গতেই হবে। তার বিধাতা তাকে এই সিঁড়ি ভাঙ্গাব দুরূহ বেদনা থেকে মুক্তি দেননি। বরং সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বে সাজানোর সিঁড়িব পথে টেনে এনে কি অসীম আঘাত, কি সুগভীর ব্যথাব পসবা তাকে বহন করতে বাধ্য করেছেন। কুমুর ব্যক্তিত্ব যদিও বিষাদেব ছন্দ মাধুরী দিয়ে গাথা তবু সে সব কিছুই মেনে নেযনি বিধাতাব দান হিসেবে। সে কোথায়ও একান্ত অবনম্র হয়ে পড়েনি। দ্বন্দ্বের আঘাতে প্রতিঘাতে আস্তে আস্তে একটিব পর একটি পদ্মেব পাঁপড়ি মত প্রস্ফুটিত হয়েছে। যখন সেই অনিবার্য ঘটনা-ক্রম বিভিন্ন বাহ্য দ্বন্দ্বেব ভেতব থেকে সত্য প্রকাশ কবল, তখন দেখা গেল দুস্তব বাধা পরিবাব। একে অতিক্রম কবাব ক্ষমতা কোন পক্ষেবই আব আযত্তেব মধ্যে নেই। মধুসূদনের বিযেটা একটা প্রতিহিংসা প্রতিশোধেব সামাজিক ঘটনা। সামন্ত-তন্ত্রের শেষে ভগ্নাংশ জমিদাবদেব মধ্যে এমনটা প্রায়শঃই ঘটত। জোব জবরদস্তি কবে একবকম মেয়ে লুঠ করে এনে বিয়ে করার ঘটনাও শোনা যায। যাই হোক কালধর্ম সেই জবরদস্তিপনাব রূপের পবিবর্তন ঘটেছে, কাজেই রবীন্দ্রনাথ আর সে পথে যাননি। তবু জবরদস্ত শিল্পপতিকে জমিদাব ভগ্নাংশের কাছে একটা মানসিক পরাজয়েব ব্যবস্থা করেছেন। মধুসূদন কুমুব মৌন ভাব দে

আরও ক্ষিপ্ত। মনের গভীর তলায় এই মেয়েটির মন পাবার জন্যে একটা আকাঙ্ক্ষা জেগেছে বলেই ওর এই তীব্র নিষ্ফল ক্ষোভ।

মধুসূদন কাজের লোক তার এই হিস্টিরিয়া-ওআলী মেয়ের শুশ্রূষা করার অবকাশ নেই। অর্থাৎ স্ত্রী যদি অসুস্থ হয়ে পড়েও তবু তার (শিল্পপতির) তাকে দেখবার অবকাশ নেই। এমনিভাবে শিল্পপতির অবকাশ অর্থের জোগান দিয়ে ঢাকা আছে। অবকাশের ওপর থেকে সে ঢাকনা তুলে নেবার সাহস সম্ভবত মধুসূদনের নিজেরও নেই। কেননা সে নিজের ক্রীতদাস। অন্যকে ত ক্রীতদাস করেছে-ই পরন্তু নিজেও সেই ক্রীতদাস-ব্যবস্থার মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। একবার নিজে অসুস্থ হয়ে নিজের বরাদ্দের টাকা কেটেছে, কাজেই এই আত্ম-ক্রীতদাস মন যখন একবার পরাজয় স্বীকার করেছে—বিশেষ জমিদারের ঘরের মেয়ের কাছে, তখন শেষ সম্বল থাকে লক্ষ্মীর দলিল, কাঁচা সম্পদের (এখানে টাকা অর্থে) একমাত্র প্রতীক চিহ্ন। এখানে বাক্যই ভয় দেখবার পক্ষে যথেষ্ট বলে মধুসূদন মনে করেছিল, "তুমি তোমার দাদার চেলা, কিন্তু জেনে রেখো, আমি তোমার সেই দাদার মহাজন, তাকে এক হাটে কিনে আর-এক হাটে বেচতে পারি।" এই মন্তব্যের পাশ্চাৎপট কি ? এটা দেখা গেল যে আপৎকালে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পবিবার ; একে আত্মরক্ষা জন্য হাত বাড়িয়েছে, অন্য পক্ষ সেই প্রসারিত হাতকে শেকলে বাঁধবার জন্য সব ব্যবস্থাই করেছে। জমিদারকে শিল্পপতি কব্জা করলে। বিপ্রদাসের ছাত্রবন্ধু ঠিক বন্ধুর মত উপদেশ দিল। নতুন রাজা হয়ে মধুসূদন খোশমেজাজে আছে এই ফাঁকে তার কাছ থেকে সুবিধা মত ধার পাওয়া যেতে পারে। কাজেই অবসরভোগী সমাজের প্রতীক বিপ্রদাস অতিব্যস্ত, অতি আত্ম কেন্দ্রিক, সঞ্চিত কাঁচা পয়সার মালিক মধুসূদনের কাছে হাত পাতলেন। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো এক জমিদার আর

এক জমিদারকে টাকা ধার দিচ্ছে না। মধুসূদনের সব অর্থই বানিজ্যিক সূত্রে পাওয়া। রবীন্দ্রনাথ ভগ্নাংশ জমিদারকে শিল্পপতি মধুসূদনের কাছে হাত পাততে বাধ্য করলেন। কেননা শ্রেণী হিসেবে তারাই হল নতুন সম্পদের থলেদার, কাজেই নতুন শ্রেণী পুরাতন শ্রেণীকে ধ্বংস করবে তার বিচিত্র কি। এখানে শ্রেণী-গ্রাসের দ্বন্দ্বটি রাইজেনফের ভাষায় কেমন ফুটে উঠেছে দেখা যাক।

"The bourgeoisie destroyed all the old economic forms, (এখানে জমিদারীকে বুঝতে হবে।) and therewith all the property relations appertaining to those forms.

* * *

In place of the feudalist form of property, the bourgeoisie installed its own form of property.*"

উপন্যাসে সম্পত্তি বিবর্তের ছবি ফুটিয়ে তোলার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু জমিদারী যে বুর্জোয়ার হাতে বাঁধা পড়ল তার যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে। আর সেই ইঙ্গিতটাই হল সমাজ বাস্তবের বড় কথা। রবীন্দ্রনাথ বিপ্রদাসকে অসীম দুঃখের ভারবাহী একটি জীবে পরিণত করেছেন। তার কাছ থেকেসামন্ত যুগের আত্মপ্রত্যয় ও দুর্ধর্ষ মনোবৃত্তি কেড়ে নিয়েছেন। ফলে বিপ্রদাস শৌর্যবিহীন কেরাণী যুগের আবির্ভাবের আদি জনক হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু সম্পত্তিবিহীন ছোটখাট তালুকদার ও জমিদারের শ্রেণীরা যেন এই জাতীয় নবীন পয়সা-ওয়ালা শক্তির কাছে মার খেতে চলেছে। চাটুজ্জে এবং ঘোষালদের পরিবারের মধ্যে যে সামাজিক ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল তাতে সহনশীলতা, সহযোগিতার কোন প্রশ্নই ছিল না। বিভিন্ন ঘটনা ও বচনের মধ্যে দিয়ে ফিরে যা এসেছে তা হচ্ছে

* The Communist Manifesto by K. Marx and F. Engels—Explanatory Notes by D. Ryazanoff. Page—139. Martin Lawrence Ld. London.

দম্ভ আর অধিকার সাব্যস্ত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, মধুসূদন তারই মূর্ত্ত প্রতীক।

কুমুর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হল সে স্বাধীন, নিজের স্বাধীনসত্তা ভোগ করতে চায়। নীলার আংটিকে কেন্দ্র করে যে চিন্তা স্রোত কুমুর মনে এসেছে এবং তার ব্যবহারের মধ্যে যে দৃঢ়তা ও নারীত্বের একাগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে তা মুখ্যত পরিবারভিত্তিক সভ্যতার মধ্যে সম্ভব। কে এবং কাদের বাড়ির মেয়ে। বাড়ির বড় বৌ যে, এক কথায় রাজরাণী সে হঠাৎ তেজের সঙ্গে বাসন মাজতে নেমে গেল এটা অভিজাত পরিবারের মধ্যে বেশ বিষদৃশ্য বলে মনে হবে। কুমুর মনের তেজকে রক্ষার করার জন্যই এই পারিপার্শ্বিক রচনা। হিন্দু-বিয়েতে লিখিত কথায় সমান অধিকার থাকলেও স্বামী নামক দেবতার এক অলিখিত ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই অলিখিত ক্ষমতার জোরেই রাজা মধুসূদন 'অতি' স্বামী হয়ে উঠেছিল। স্ত্রীর আত্মসমর্পণ ও স্বামীর অটেল অধিকার—এইটেই 'অতি' স্বামিত্ববাদের উত্তুঙ্গ পর্ব্বতে ওঠবার একমাত্র পথ। মধুসূদন—আত্মকেন্দ্রিক মধুসূদন—এই সেরা পথটা বেছে নিয়েছিল। কিন্তু মধুসূদন কখনও জানত না যে কুমু নন্দরাণীর তেজঐশ্বর্যের অধিকারিণী। সেই তেজঐশ্বর্য-শালিনীর নারীর কাছে বিপ্রদাসের পিতার বিষাদ ক্লিষ্ট পাণ্ডুর প্রভাব একেবারেই নিভে গিয়েছিল।

নারী হিসেবে কুমুর সমস্ত দিনটা কোন অতিন্দ্রীয় সত্তাধারী দেবতার পানে উৎসর্গীকৃত হয়ে আছে। যখন স্ত্রীর ভূমিকায় নামতে চায় তখন পারিবারিক আভিজাত্য, বিপ্রদাস প্রভাবক্লিষ্ট জীবন মরিয়া হয়ে ওঠে। সেখানে ইবসেনীয় নারী খাড়া হয়ে ওঠে না। কুমুর দাদা হয়ত এটেই পছন্দ করত। কিন্তু মধুসূদন ব্যবহারিক সমাজসত্তার মানুষ, সে তার বাড়িতে শুধু বাড়িতে নয়

প্রাসাদে অন্য কোন প্রভাব স্পষ্ট দেখতে রাজী নয়। তার অবচেতন মনে বিপ্রদাস অধমর্ণ, ঋণগ্রহীতা। রাজা মধুসূদন ঋণদাতা। রবীন্দ্রনাথ কেন যে এই বিরুদ্ধ, পরস্পর বিরোধী element-কে একত্র করার চেষ্টা করেছিলেন তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় না। তবে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি industrialist শ্রেণীর ওপর হাড়ে হাড়ে চটেছিলেন। কেননা পুরোনো জমিদার বংশের ধংসের ওপর industrialistদের অনেক আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। মধুসূদনের ক্ষেত্রে অবিশ্যি একথা পুরোপুরি খাটে না। আবার পুরোনো জমিদাররা অনেকেই industrialist হয়েছেন। রাজা মনীন্দ্রনন্দী কয়লার শিল্পপতি হয়েছিলেন। আবার পুরোনো জমিদাররা শিল্পপতি হতে গিয়ে অনেক খুইয়েছেন তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের 'সরোজিনী প্রয়াণে'। দৃষ্টান্ত দুটোই আছে।

শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন, মনে হচ্ছে ইউরোপ ও মার্কিন সাহিত্যেও এমন একটা জোয়ার বইছে যেটা সত্যিকারের সমাজবাস্তববাদ থেকে বহু দূরে। সমাজবাস্তববাদ মানব জীবনকে একটি বিশেষ রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যে-ভঙ্গীতে জীবনকে বুর্জোয়া সাহিত্যে চিহ্নিত করা হচ্ছে তা আসলে অবাস্তব এবং মানব জীবনের সর্বাঙ্গীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে বিশেষ অন্তরায়। মানবজীবন যে শুধু প্রবৃত্তির কারাগারে বন্দী নয় এবং তার পরিপূর্ণ বিকাশ শুধু মাত্র শ্রম ও সমাজ পরিবেশের সহযোগিতার উপরই নির্ভর করে, এই কথাটা সমাজবাস্তববাদীদের বলবার সময় এসেছে। কেউ প্রকৃতবাদের মধ্য দিয়ে, কেউ যৌনতৃপ্তির মধ্য দিয়ে মানব জীবন দেখাবার চেষ্টা করেছেন। ফলে মানবজীবন গোটা সমাজব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দর্পণের একটির অংশের মত প্রতিভাত হয়েছে। এর ফলে কোন-কোন চিন্তা জগতে ব্যক্তির প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের হাতে পড়ে সমাজ পরিবেশ নিরপেক্ষ একটি ব্যক্তির খণ্ডাংশ মনের ভাব ব্যাঞ্জনায়, প্রবৃত্তির বিক্ষোভে, বিলাসে পরিণত হয়েছে। পাঠকের মনে হবে এই বিশাল সমাজ ব্যবস্থার কোনই অস্তিত্ব নেই, আর সমাজ ব্যবস্থার মাঝে অতি দুরূহ শোষক-শোষিত সম্পর্ক যে জন্ম নিয়েছে তারও কোন অস্তিত্ব নেই।

এই অতিমৌলিক প্রভেদব্যবস্থাকে আড়াল করে অবাস্তব কাল্পনিক সাহিত্য-সত্তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছিল বহুকাল। বেশ গোটা কয়েক শতাব্দীর গল্পে, উপন্যাসে এই কাল্পনিক সত্তার রূপ ও রস বিতরণের ব্যবস্থা হয়েছিল। শিল্পবিপ্লব না-শুরু-হওয়া পর্যন্ত সমাজের আসল চেহারাটা ঠিক পরিস্ফুট হয়ে

ওঠেনি। কৃষি সভ্যতার যুগে মানব জীবন উৎপাদন কেন্দ্রের কাছে থেকে শ্রম বিনিয়োগের সুযোগ পেয়েছিল। কৃষি উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে পৌঁছে দিয়ে দেশ-দেশান্তর পরিভ্রমণ করার তেমন সুযোগ ছিল না। পরিবহন ব্যবস্থা এত জটিল, ব্যাপক ও সুষ্ঠু ছিলনা যার ফলে বাজার অনেক সময়ই স্থানীয় ছিল, বিনিময় ব্যবস্থা সহজ ছিল।

বিনিময় ব্যবস্থায় জটিলতার ফলে মানব শ্রমের বিভিন্ন উৎপাদিত দ্রব্যের প্রকৃতি গেল বদলে, বাজার ব্যাপক ও উৎপাদিত বস্তু বিচিত্রতা পেল। শ্রমের বিভিন্নতা ও শ্রেণীবিন্যাস পূর্ণ হল, এবং এই কার্যকারণ শৃঙ্খলার পথে শোষিত শ্রেণী জীবনের উদয় হল। ধাবা ক্রম হিসেবেই সামাজিক মনের বিভিন্ন শ্রমের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন রূপ ফুটে উঠতে লাগল। সমাজ পরিবেশের এই ইন্ধনগুলির কথা আজ আর নূতন করে বলতে হয়না। যেমন ধরুন, যদি কোন একটি ব্যক্তি অফিসে কেরাণীগিরীর কাজ (শ্রম) করেন তবে আমবা তার বাড়ীর সমাজ পরিবেশ ধরে নিতে পারি; শ্রমঅনুযায়ী বেতন পাবেন না, বাড়ীতে মা, সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী নিয়ে বিব্রত বোধ করবেন। বাজার চওড়া, আর ব্যয়ের ফাঁক আর কিছুতেই ভরাট করা যাচ্ছে না। বাঙ্গালা সাহিত্যে অনেক লেখক এই সমাজ পরিবেশের মধ্য থেকে নায়ক বেছে নিয়ে গল্প বা উপন্যাস রচনা করেছেন। যখনই দৈনন্দিন জীবনের চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে তখনই দেখা দিয়েছে বৈষয়িক ঘাট্‌তি এবং তা থেকে উদ্ভূত দুঃখ-দৈন্য। এবং কেউ-কেউ এই অসীম দুঃখের মধ্যে পড়ে নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে দ্বিচারিণী করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। দেহের শুদ্ধতার নাকি কোন মূল্য নেই। সমাজ পরিবেশের আর একটি দৃষ্টান্ত দেই,—কোন একটি লোক পাটকলের কাজ করে। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি খাটে, overtime খেটে সংসাব প্রতিপালন

করে। যখনই আয়েতে ঘাট্‌তি দেখা দেয় তখনই সুদখোর মহাজনের দ্বারস্থ হয় এবং সুদখোর মহাজন তাকে সর্বস্বান্ত করে, হয় তাকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য করে, না হয় আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে। ঘরে যদি ছোটখাট প্রিয়দর্শনী যুবতী বধূ থাকে তবে তাকে বারবনিতা গৃহে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। হয়তবা নিজেও ভোগের ব্যবস্থা করে। এখানেও পরপর দুটো ব্যক্তি দুটো সমাজ পরিবেশ রাখা হল, এক-একটি সমাজ পরিবেশ এক-একটি ব্যক্তির মুখোমুখী রাখা হল এবং এর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব আপনা থেকেই সৃষ্টি হতে লাগল।

এই যে দুটো শ্রেণীর বিষয় পরিচয় দেয়া হল তাতে দেখা যাচ্ছে, এরা সমাজ পরিবেশেব চাপে পড়ে তাদের শ্রেণীসত্তা হারিয়ে এক শ্রেণী থেকে আর এক শ্রেণীতে আশ্রয় নিচ্ছে। পক্ষান্তরে আর একটি শ্রেণী ধনমদমত্ত বিলাসে আয়সী হয়ে উঠেছে এবং পরশ্রম-ভোগী জীবনের তথাকথিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতির পরিচয় সাহিত্যের মধ্যে রেখে যাচ্ছেন। এদের চরিত্র চিত্রন করতে বাঙ্গালা সাহিত্যের লেখকরা কেউ বড় একটা পরাম্মুখ নন। আর একটি শ্রেণীর লেখক বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা যাচ্ছে, অতীতকে মুখর করে তুলতে ব্যস্ত, সেই বিন্যাসের মধ্যেও সেই পরশ্রমভোগী বিলাসী অলস শ্রেণীর উত্থান ও পতনের কাহিনী সবিস্তারে বিচিত্র ধারায় স্থান পেয়েছে। বৃহত্তর অনভিজ্ঞ পাঠক-গোষ্ঠীর কাছ থেকে একটা যশের বাহবা কুড়িয়ে নিয়ে সাহিত্যে একদল ভাবানুবেগ নব্যপুনরুত্থানবাদী হয়ে উঠেছেন। ঐতিহ্যবাদের প্রাণ সঞ্চারের নামে পচা গলিত শবের আয়ুর্বেদীয় বা উনানী চিকিৎসা হচ্ছে। এদের কাহিনী হল sex, wine and woman. অর্থাৎ নারী, মদ ও যৌনবিলাস। আপাতত বাঙ্গালা সাহিত্যে গল্প, উপন্যাসের তিনটি সত্তার খেলা খুব প্রবল আকারে চলছে। প্রথম

ভাবানুবেগ পুনরুত্থানবাদী, দ্বিতীয়টি সতত-চঞ্চল অর্থনৈতিক উত্থান-পতনের ফলে যৌনবিকৃতি ও অসামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড পঙ্গু মানুষ, নব্য যৌনবাদও। তৃতীয়টি অলস জীবনের প্রতি স্পৃহা, পলায়নপর মন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে মোড়াই মানুষের কেচ্ছা।

এখানে আর একটু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, যদি কোন জীবন কলের চাকরী করে ধর্মঘটের দ্বারা কর্মচ্যুত হয় তবে তার পরিবারকে পথে বসিয়ে অধঃপাতের কাহিনী রচনা করা হবে। কিন্তু সে যে সাহসিকতার সঙ্গে শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে তার মহত্ত্ব সাহিত্যে স্থান পাবেনা। একটা জমিদার বা শিল্পপতি যদি জঘন্যতম পাপ করে তবু পরিচয় রেখে যেতে পারবে সাহিত্যে। সেই পাপের মহিমাকে মহত্ত্বর স্তরে উন্নীত করার জন্য শ্রেণীবোধ পাওয়া যাবে লেখকের সাহিত্য সাধনার মাঝে। কিন্তু যে সৎসাহসী চরিত্র ধর্মঘটের মারফৎ জীবনের অন্তিম দ্বন্দ্ব ঘোষণা করে, সব রকম ত্যাগ স্বীকার করে এগিয়ে যাবে—তার চরিত্রের উদারতা, সমাজবোধ, আদর্শবাদ সাহিত্যের বিশেষ অংশ কিছুতেই জুড়ে থাকবেনা। যত নিপুণভাবে পাপের চরিত্র চিহ্নিত হয় ততই সামাজিক মনে পাপের নঙর্থক দিকটা অবলুপ্ত হয়। আমরা একথা বলছি না যে, সাহিত্যের সামগ্রিক সমাজ-জীবনের পরিচয় দিতে গেল—পাপীকে টেনে আনা হবেনা, বা তার চরিত্র চিত্রিত হবেনা। নিশ্চয়ই তার প্রয়োজন আছে কিন্তু যেটা কোন অবস্থাতেই সমাজ মেনে নেবে না—তা হচ্ছে সমাজ পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানো—পাপের গরিমা। যেন পাপই বিশেষ সত্তা।

আজকের যুগের সমাজ চেতনার আর একটি অধ্যায় : আমরা কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারি না। শিল্প বিপ্লবের যুগে, শ্রেণী-শোষণের যুগে, ইউনিয়ন, ধর্মঘট একটি চেতনার বিশেষ বিকাশ,

অর্থনৈতিক অবদমনের চেতনা, শোষণের বহিঃপ্রকাশ। এর আভ্যন্তরীণ বিরোধ জীবনকে, শ্রমশীল জীবনকে, তার সমাজ জীবনে মহত্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দিচ্ছে না। বাইরে থেকে একটা আরোপিত পঙ্গুতা সমাজদেহের উপর চাপানো হয়েছে। ইউনিয়ন একটি কর্মবহুল সমষ্টি জীবনের পরিচয়। বিদ্রোহ, একটি সমাজকর্ম—এ সবার অন্তরালে যে বিপ্লবী চেতনা সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাকে নোতুন করে গঠন করার প্রয়াস পাচ্ছে তাকে সাহিত্যে চিত্রিত করাই হচ্ছে—সমাজবাস্তববাদী সাহিত্যের আদর্শ। কিন্তু সেটি হবার নয়। এ বিষয়-বস্তুকে কেন্দ্র করে চরিত্র সৃষ্টিতে একটি অ-লিখিত নিষেধ আছে। সে বিধিনিষেধ শ্রেণী চেতনার। সে নিষেধ আসে ইঙ্গিতে আর আভাসে—সম্পন্ন সমাজ শিল্প-পতিদের কাছ থেকে। আর আসে প্রকাশকদের কাছ থেকে—এরা অবশ্যি একই সূত্রের বিভিন্ন ভাঁজ মাত্র।

যে-সব ঘটনা এখানে উল্লেখ করেছি তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় মানব মনের চিরন্তন দ্বন্দ্ব—শ্রমের উদ্বৃত্ত অবসর ভোগী জীবনকে কেন্দ্র করে, আর অবসরবিহীন অতিশ্রমী জীবনের ঘাটতি বৈষয়িক জীবনকে কেন্দ্র করে—রচিত হয়েছে। এই উদ্বৃত্ত শ্রমের দান হল অবসর উপভোগ, সম্ভোগ। আর ঘাটতি বৈষয়িক শ্রমের দান হল নিরাশা, স্থিতিহীনতা, অবসরবিহীন দুর্যোগের রাত্রি। এ দুয়ের বিরোধ অনিবার্য। এই বিরোধের অনিবার্যতাকে বুর্জোয়া সাহিত্যিকেরা সুকৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছেন। তার অর্থ, মানব জীবনকে অখণ্ডরূপে দেখতে চাইছেন না। বরং সাহিত্যকে বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে বিপথগামী করার চেষ্টা চলছে। সাহিত্যের মূল সূত্র আনন্দ—এই দর্শনকে প্রচার করে প্রকৃত বাস্তব জীবন থেকে পলায়নের পথ খুঁজে বের করা হয়েছে। ভিক্টোরীয় যুগের দুঃসাহসিকতা, মামলা-মোকদ্দমা,

দলিলজাল, আইন জগতে মক্কেলের সম্পত্তি বেনামীতে ক্রয়, অনুন্নত শ্রেণীকে লেঠেলবাজীতে নিযুক্ত করে জমিদারী দখল ও বৃদ্ধি—মুখর অতীতপন্থী লেখকেরা এদিকে তাকান না। কিছু স্বাদেশিকতা, কিছু সরকারী দাক্ষিণ্য ভোগ করে যে সমাজটি বেঁচে ছিল সেই সমাজেই বৈঠকী মেজাজের সাহিত্য ভাল চলে এবং এর রস তারাই উপভোগ করতে পারেন। এরা দুই পা দুই স্থানে রেখেছেন, শহরে সাহেবসুবার সঙ্গে খাতির-মোদ্দাত, খানাপিনা—আবার গ্রামের জমিদারীতে গিয়ে প্রজা ঠ্যাঙানো। এই দুইরূপ রক্ষার কাজে যে শ্রেণীটি হাত পাকিয়েছিল সেই শ্রেণীরই মুখপাত্র হিসেবে এক শ্রেণীর সাহিত্যিকেরা পাঠক মনোরঞ্জনের তন্ত্রধার হলেন। আমরা অবিশ্যি একে সামাজিক শ্রম বিন্যাসের একটি উদ্বৃত্ত স্তর বলেই মনে করি। কেননা বাঙ্গালী সমাজে পরশ্রমভোগী জমিদার, তালুকদার শ্রেণীর অবক্ষয় তখনও পুরোপুরী শুরু হয়নি। তাই মদ ও নারী একটা বিশেষ সমাজ জীবনের পক্ষে গৌরবের আসন দখল করেছিল। অলস উদ্বৃত্ত শ্রেণীর জীবনে এটাই হল গৌরবের।

ঘটনাটা বাঙ্গালা দেশের উপন্যাসের প্লটও হতে পারত, তা হল না অন্য কারণে—সে কারণ এখানে না হয় ব্যাখ্যা নাই করলাম। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে একটি বিলাতি শিক্ষিত আইনজীবী জমিদার নেতা অন্যের ঘরণীকে নিয়ে বিলাসব্যাসনে মত্ত ছিলেন। পরে তাই নিয়ে বেশ মামলা বেধে যায়। কারণ এখানে ঘরণীটি ভজা বাগদী বা পাঁচু শেখের ঘরণী নয়—অতিউচ্চশিক্ষিত ঘরের ঘরণী। তাই ব্যাভিচারের কাহিনী বিচারালয় পর্যন্ত আসে, বেশ মোটা খেসারৎ দিয়ে তার মীমাংসা হয়। এ ঘটনাটা এখানে উল্লেখ করার বিশেষ কারণ এই যে, শ্রেণীটি যখন উচ্চ তখন **social tension**-টা সাহিত্যে স্থান পায় না। একই পরশ্রমভোগী

in chorus. Words are sung appropriate to the pantomime. The actions figured are those of daily life, those that are absolutely essential in the struggle for existence."*

একথা ভাবতে অবাক লাগে যে, গ্রীক নাটকের অতি প্রত্যুষে পশু নির্বাক অভিনয়ই ছিল মুখ্য বস্তু। যে পশুটি এই নাটকের উপাদান, সে নাকি ছিল গ্রীক সমাজজীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ। তার বর্তমান নাম হল ছাগল। (tragos)। গ্রীক ভাষায় (tragedy) কথাটির জন্ম এখান থেকে।

জীবনের বেদীমূলে যে একটি সত্য আমাদের বারবার নাড়া দেয়—তা আমরা বর্তমান সভ্যতার শীর্ষদেশে বসে অনেক সময় অনুভব করতে চাই না। এই অনুভব না-করতে চাওয়ার নাম বাস্তবকে অস্বীকার করা, আর পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয়। তাহলে এই সত্যটি কি? ইতিপূর্বে যে সব প্রমাণ আমরা উপস্থাপিত করেছি, তা থেকে এটা বেশ বোঝা যায় যে, সাহিত্যের সত্যটি শ্রম দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। বর্তমান যুগেও এই সত্যটি শ্রম দ্বার আচ্ছাদিত। এমন একদিন সমাজে ছিল যেদিন শ্রমই সব রসের উৎস বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল—তা না হলে নাটকে যৌথভাবে ফসলকাটার প্রতিফলনের অর্থ হয় না। শিল্পে—বিশেষ করে অঙ্কন শিল্পে, পশু শীকারের দৃশ্য হুবহু আঁকবার কোন অর্থ হয় না। আর এই ফসলকাটা, পশু শীকার একদিন জীবনের মুখ্য শ্রম বলে প্রতিভাত হয়েছিল। মানব জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা ও বিকাশের পক্ষে এই শ্রমই ছিল অপরিহার্য। আরো

Quoted in Fundamental Problems of Marxism by G. Plekhanov—pp. 47-48. Ed. by D. Ryazanov. Martin Lawerence Ltd.

গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করলেই বোঝা যাবে যে, দেহ ও সমাজ গঠন বিকাশের যুগে শ্রমই ছিল আদিম ইন্ধন, সব শক্তির মূলাধার। সমাজের একটি বিশেষ বিকাশশীল উন্নত স্তরে—বস্তু উৎপাদনের অন্তর্নিহিত যে সৃষ্টিশীলতা রয়েছে, সেটা আত্মখণ্ডিত হয়ে একসময় বিরোধের ভূমিকা গ্রহণ করে। কারণ আর একটি উৎপাদিকা শক্তি বিরুদ্ধবাদী হয়ে ওঠে বলেই। এবং দুইয়ের দ্বন্দ্ব থেকে এক-একটি নোতুন সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি হয়, যেমন সমান্ত থেকে বুর্জোয়া, বুর্জোয়া থেকে সমাজতান্ত্রিক। এরই অন্তর থেকে জন্ম নেয় সমাজ মন, শ্রেণীর মন।

এবার একটা দৃষ্টান্তে আসা যাক। একটি লোক কামারের কাজ করে। তার হাঁতুড়ি, তার যাঁতা-হাপর সবই যন্ত্র হিসেবে তার জীবিকার উপাদান হয়ে কাজ করছে। সমাজের সঙ্গে তার সম্বন্ধ হল উৎপাদন ব্যবস্থার সম্বন্ধ। গ্রামে বসে যাদের কাজ করে তারা আবার অন্যের সঙ্গে আর একটি উৎপাদন ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে। চাষীর ধান কাটতে যে কাস্তের প্রয়োজন তার চাহিদা মেটায় কামার। এই দুয়ের সামাজিক সম্বন্ধ একটি বিশেষ সমাজ-অর্থনৈতিক পরিস্থিতে থাকে। কিন্তু যখনই উৎপাদন যন্ত্রের আর এক ধাপ উন্নতি হয় তখনই চাষী ও কামারের সম্বন্ধের মধ্যে চিড় খায়। চাষী যখন কলের লাঙ্গল, কাস্তে ইত্যাদি ব্যবহার করতে থাকে তখনই বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধের একপাশে উন্নতযন্ত্র অধিকর্তা আর একপাশে কামার। এর মাঝে যে বিরোধ রয়েছে অথবা একটা শ্রেণীস্বার্থ রয়েছে তা থেকেই এক ধরণের মানসিকতার জন্ম হয়। এই মানসিকতা ফুটে ওঠে সামাজিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। সমাজ যতই উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্ভাবন করে উন্নত ও ব্যাপক স্তরে এগিয়ে যাচ্ছে ততই দ্বন্দ্বও কর্মকেন্দ্রিক শ্রেণী সৃষ্টি হচ্ছে। এবং অব্যবহিত

ফল হিসেবে আর একটি শ্রেণী সৃষ্টি হচ্ছে, তারা হচ্ছে অলসপুষ্ট শ্রেণী। তারা অন্যের উদ্বৃত্ত শ্রমের ওপর বেঁচে আছে। এখানে আলোচনাটিকে সামাজিক অর্থে অর্থনীতির গোড়ার দিকে না নিয়েও এটা নির্বিঘ্নে বলা যেতে পারে অলসপুষ্ট শোষণভিত্তিক শ্রেণীটি মনস্তত্ত্বের দিক থেকে কল্পনাবিলাসী। যতই শিল্পে সংকট দেখা দিচ্ছে অর্থাৎ শোষক শোষিতের সঙ্কট দেখা দিচ্ছে, ততই শোষণ ক্ষমতা, দম্ভ, হিংস্রবৃত্তি—পলায়নপর ভাববিলাসিতা সাহিত্যে সৃষ্টি হচ্ছে। সেকালের শিল্পীরা রাজরাজড়ার, বড় যোদ্ধা, ব্যারণ ইত্যাদির ছবি আঁকতেন। এরা সবাই সমাজ শোষণ ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। রূপ, যশ, শৌর্য, বীর্য নিয়ে গল্পের নায়ককে ধনিক শ্রেণীর হতেই হবে। অর্থাৎ যে অলসপুষ্ট শোষণের পাণ্ডা তাকেই নায়ক হিসেবে গ্রহণ না করলে পাঠকের মন ভরবে না। মোটামুটি স্থিতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে পাঠক তার মনে ধনিক শ্রেণীর ঐ নায়ক মোহ বিস্তার করে। কেননা, পাঠক তার অবচেতন মনে অমনতর একটি জীব হতে চায়। আদর্শবাদ, ত্যাগ, ভালবাসা ঐ ধরণের হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু আমাদের পূর্বকথিত উন্নতযন্ত্র অধিকর্তা ও কামারের সঙ্গে কর্মাকেন্দ্রিক সমাজ সম্বন্ধের যদি চিড় খায় এবং এই সম্বন্ধের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে যদি গল্পের মধ্যে দিয়ে শোষণের মূল সুত্রটি ধরে দেখানো হয়, তবে অনেক পাঠকের মনই তথাকথিত রস থেকে বঞ্চিত হবেন। কেননা, ভাববাদী সাহিত্য পাঠককে এই সমাজবাস্তববাদী রস থেকে আড়াল করে রেখে, তার বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি গঠনে বাধা দিয়েছে। এই বাধা দানের কাজই হচ্ছে বুর্জোয়া সাহিত্যের ধর্ম। এই বাধা অপসারণের কাজ হল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজ।

Lenin যেমন বলেছেন, Without revolutionary theory,

there can be no revolutionary movement তেমনি চিন্তজগতের বৈপ্লবিক সূত্র না এনে সাহিত্যে বিপ্লব সম্ভব নয়। কেননা এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব মুখ্যত শক্তিশালী সমাজব্যস্থার বিরুদ্ধে কাজ করবে। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবে সমাজবাস্তববাদী চিন্তাধারার কয়েকটি সূত্র স্থির না করলে সমাজ, পরিবেশ ও মানবজীবন বিচারের নবরূপায়ণ সম্ভব হবে না। এর সামগ্রিক সত্তা গোটা জীবনবিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। এই যে সমষ্টিগত সামঞ্জস্য ও সমতা বিধানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সেইটেই হচ্ছে সমাজবাস্তববাদী সাহিত্যের মূল প্রেরণা। কিন্তু এ থেকে বিচার, বিশ্লেষণ, হৃদয়বত্তা মানব মনের মহৎ আকাঙ্ক্ষা কোন কিছুই বাদ যাবে না। George Lukacs বলেছেন, "The central category and criterion of realist literature is the type, a peculiar synthesis which organically binds together the general and the particular both in characters and situations."*

এখানে general এবং particular কথাটির উপর বিশেষ জোর দেবার অর্থ হল এই যে, general বলতে সমাজ পরিবেশকে বোঝায় যা সর্বাবস্থাতেই সমষ্টিগত কিছু, আর particular বলতে বোঝায় শ্রেণী মানবজীবনকে—কিন্তু এর দ্বন্দ্ব বিধান থেকে চরিত্রের জন্ম, সহযোগী পরিস্থিতির স্ফুরণ। এখানটায়ই সমাজবাস্তববাদী সাহিত্যের মূল সূত্রটি খুঁজে পাওয়া যাবে।

এটা অবশ্য স্বীকার করত হবে যে, আজও বাঙ্গালার সাহিত্যিক গোষ্ঠীর মধ্যে সমাজ শ্রেণী চেতনা এত প্রবল নয় যে একে সাহিত্যের দরবারে বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করতে পারে। তবু সমগ্র বিশ্বের

* Studies In European Realisim by George Lukacs p. 6. Hillway Publishing Co. London.

ঘটনা ও তার প্রতিক্রিয়ার আধার সমাজ যে পথে চলছে সে পথে এই বৈপ্লবিক চেতনাকে আড়াল করে রাখা সম্ভব নয়। গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্ত্তী কাল পর্যন্ত বুর্জোয়া সমাজ অতি ধীরে আপনার নিঃশেষ কাল গণনা করে আসছে। ধনতন্ত্রী সমাজের অলস কল্পনাবিলাসের তুঙ্গী অবস্থায় সমাজবাস্তববাদী সাহিত্যের জন্ম লগ্ন ঘনিয়ে আসছে। আজ বিছিন্ন ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে—বিশেষ করে গল্প, উপন্যাসে এক আধটু স্ফুরণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু একটা দার্শনিক ভিত্তির উপর এই সমাজবাস্তববাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে, চিন্তাধারার স্পষ্ট যুক্তি সৃষ্টি না করতে পারলে, কোন্-কোন্ ক্ষেত্রে উগ্র স্বাতন্ত্র্যবাদ, কল্পনা বিলাসের অসারতা প্রমাণ করতে না পারলে, এই দর্শনচিন্তার স্থায়ী আসন লাভ করা যাবে না।

"The totality of these productive relations forms the economic structure of society, the real basis upon which a legal and political superstrueture develops and to which definite forms of social conciousness correspond. The mode of production of material life determines the general character of the social, political and intellectual processes of life." Karl Marx

উপরি-উক্ত মন্তব্যের শুধু আংশিক বিচার আমরা করব। এর সর্বাঙ্গীণ সত্যতা সম্বন্ধে আজ আর তেমন মতবিরোধ নেই। যেটা সব সময় স্বীকৃত হয় না সেটা হচ্ছে 'intellectual processes of life.' আমাদের দেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিক সমাজ যে সর্বতোভাবে উৎপাদন-ববস্থার উপর নির্ভরশীল তা ভাবতে তাদের

কষ্ট লাগে। কারণ তারা 'superstructure' অর্থাৎ সমাজের অতি উচ্চে যে অলসক্লিষ্ট স্তরটি রয়েছে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেই—একটু মানসিক আবিলতা অনুভব করে। সাহিত্যিক সমাজের মধ্যে একটি শ্রেণী আছেন যাঁরা মনে করেন তাঁরা প্রগতিবাদী, তাঁদের মনের সংস্কারে যে প্রগতিবাদের ছাপ আছে তা আর কিছু নয় তৎকালীন সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু ভাল-মন্দ বলা, এই হল প্রগতিবাদ। অর্থাৎ কোন সাহিত্যিক গোষ্ঠীর একটি বিশেষ অবস্থিত সামাজিক পরিবেশে জনগণের কথা তাঁদের মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু তার আসল নেতৃত্ব ভাঙ্গা জমিদার, তালুকদার শ্রেণীর হাতে। এদের ভগ্নদশার মূলে যে ইংরেজের শাসনব্যবস্থা এবং তা থেকে উদ্ভুত শ্রেণীস্বার্থের বিনাশ এটা সহজেই অনুমেয়।

গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাঙ্গালা দেশের জমিদার সম্প্রদায় ইংরেজ শাসনব্যবস্থার প্রতি বিমুখ হতে শুরু করে। ইংরেজ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন দেশের কাছে ঋণী হয়ে পড়ে।* এদিকে জার্মানীকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তার যেসব উপনিবেশ পাওয়া গেল সেখানেও নতুন পুঁজি নিয়োগ করা প্রয়োজন। আরও বিভিন্ন কারণে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশে কিছু শোষণব্যবস্থা তীব্রতর করতে হল। গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতবর্ষে প্রায় সর্বত্রই পণ্যবস্তুর দাম বেড়ে গিয়েছিল, তার ফলে জমিদার শ্রেণী বিব্রত বোধ করে এবং ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য মোটামুটি পুরস্কার পাওয়া ত দূরের কথা, পণ্যমূল্যের বৃদ্ধিজনিত দুর্ভোগ এই শ্রেণীটিকেও সইতে হয়েছিল। এই দুর্ভোগের চিত্রের মধ্যে মেহনতী চাষী-শ্রমিকদের কোন

*As early as 21 July 1917, Wilson predicated that "when the war is over we can force them to our way of thinking, because by that time they will, among other things, be financially in our hands"—p. 27. Imperialism and Revolution by David Horowitez.

স্থান নেই। তাদের ক্রয় ক্ষমতা কোন স্তরে নেবে গিয়েছিল তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পাওয়া যায় না। উচ্চবিত্ত, জমিদার, সামন্ত শ্রেণীর শাসকরা ইংরেজ শাসনকে অপশাসন বলতে শুরু করল। সহরবাসী উচ্চবিত্তের চাকুরী না পাওয়ার আন্দোলন, ইংরেজ শাসনের অংশীদার হবার আশা, জমিদার শ্রেণীর ওপর কর বৃদ্ধির চাপ একধারে এসবের প্রতিক্রিয়া শুরু হল। অন্যধারে ইংরেজ বণিকগণের তুলা ক্রয়ের একচেটিয়া বাজার যে মিশর, সেখানেও পাশা শ্রেণীটি বিদ্রোহ করেছে, সেখানেও রাজনৈতিক দাবী দাওয়া নিয়ে বিরোধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে সব উপনিবেশ হস্তগত হয় তাকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাবার আগেই এই বিরোধ-বিদ্রোহ দেখা দেয়। ফলে একচেটিয়া বাজার চোট খায়। ম্যাঞ্চেষ্টারের সুতো-কাপড়, ডাণ্ডির পাটের বাজার, লিভারপুলের নুন, শেফিল্ডের ছুরি কাঁচি ও অন্যান্য সবই জমিদার ও সামন্ত শ্রেণীর বিক্ষোভের ফলে বাজারে নির্বিঘ্নে চলতে পারল না। এদেশের মানুষ যেদিন বিলাতি কাপড় পুড়িয়ে মনের জ্বালা মিটিয়েছে তখন কেউই ভাবতে পারেনি যে, দেশী পুঁজিবাদীদের কাছে এর থেকে অনেক বেশী দামে কাপড় কিনতে হবে। স্বাদেশিকতার নামে জাতীয় স্থিতস্বার্থের পুঁজিবাদের পূর্ণ বিকাশকে প্রতিষ্ঠিত করাই হল উচ্চ মধ্যবিত্তের আন্দোলন। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে, ফরাসী বিপ্লবে যে শ্রেণী নেতৃত্ব নিয়ে তাদের শাসন কায়েম করেছিল, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সেই শ্রেণীর পূর্ণ বিকাশ লাভ সম্ভব হয়েছে। তারাই নেতৃত্বের জন্য আঁকুপাকু করছে।

এখন প্রশ্ন হল, এর সঙ্গে সাহিত্যের যোগসূত্র কোথায়? মার্কস যে political superstructure-এর কথা বলেছেন এবং intellectual processes of life-এর উল্লেখ করেছেন তার ব্যাখ্যা জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে পাওয়া যাবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের

পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত গল্প, উপন্যাসগুলি পড়ে দেখুন, নায়ক উচ্চমধ্যবিত্ত নব্য শিক্ষিত বিলাত ফেরৎ; তবে তাদের দেশের জন্য মন পড়ে আছে; এদিকে আপনি দোর্দণ্ড প্রতাপ জমিদারের ভগ্ন দেউলে অতীতের ক্রন্দনও খুঁজে পাবেন। উদগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দম্ভও পাবেন, শহরে বেকার যুবকের দুঃসহ জীবন যাত্রার চিত্র পাবেন। একালের সম্পন্ন গেরস্থ ঘরের ছেলে কলকাতায় চাকুরীর আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার বিশ্বমন্দা বাজার শুরু হয়েছে। দ্রব্যমূল্য সস্তা কিন্তু কিনে খাবার পয়সা অনেকেরই নেই, চাষীর পণ্যের দাম পড়ে যাচ্ছে। ফ্লাউড কমিশন বসিয়ে চাষীর কত ঋণ আছে তার পরিমাপ করা হল। কিন্তু ঋণ মকুব হল না বা চাষীর উন্নতিও হল না। বাঙ্গালা দেশের চাষী সমাজ কিন্তু তখনও তেমন শ্রেণী সচেতন নয়। তার কারণ, জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে যদি চাষী বিদ্রোহ হয় তাহলে জমিদার, জোতদার, তালুকদার আর শহরের আইনজীবী সমাজ বিপন্ন হয়ে পড়বে। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু ছোটখাট শ্রেণী আছে যাদের ঐতিহাসিক কোন ভূমিকা নেই। অথচ আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক। এরা নিম্নমধ্যবিত্ত। এই শ্রেণীটি দুটি দিকের সম্ভাবনা নিয়ে বিরাজ করে। এ ছাড়া আমলাতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ স্ব-বিরোধ ইংরেজের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করে। কাজেই এই যুগে সামন্ততন্ত্রের ভগ্নাংশ নিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবার সাহিত্যের প্রয়োজন ছিল। এবং বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত শিক্ষিত পাঠক এই কাহিনী পড়েই সাহিত্যে প্রগতিবাদী হতে চেয়েছিলেন। শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠী' আর 'কল্লোলর যুগে'র ছিটেফোঁটা মেহনতী মানুষের কথায় অনেকেই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে হঠাৎ মেহনতীর মানুষের কিছু-কিছু কথা এলো কেন? ইতিহাস কি বলে? সমগ্র ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে রেখেছিল। তার কারণ ভারতবর্ষ মুখ্যত হিন্দুদের দেশ বলেই হিন্দুরা অনেক জমির মালিক, পুঁজির মালিক ছিল। বিগত দিনের সাম্রাজ্যবাদী মোগল শাসকদের কাছ থেকে রেহাই পবার জন্যই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের হিন্দু রাজারা, সামন্ত নেতারা বেশী খাতির করত। সেই হিন্দু রাজাদের শাসনে হিন্দু প্রজাদের যে অবস্থা ছিল মুসলমান প্রজাদেরও সে অবস্থাই ছিল। শোষণের ক্ষেত্রে কোন ভেদাভেদ নেই, এর কোন হেরফেব হয়নি। আর ঐতিহাসিক নিয়মে তা হবারও নয়। কেননা সামন্ততন্ত্রের শোষণের যে ধারা তা ধর্মনির্বিশেষ। এর প্রধান কারণ হল, কৃষি সম্পদের ওপর ভিত্তি করে যে শোষণব্যবস্থা, তা হাল, গরু ও বর্গাদারী স্বত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এ ডিঙিয়ে বেশী দূর যেতে পারেনা। জমি চাষ করবে কিন্তু চিরস্থায়ী অধিকার পাবে না। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসক এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে হিন্দু সামন্ত রাজার বিরুদ্ধে মুসলমান প্রজাদের ক্ষেপিয়েছে। সাবা ভারতবর্ষ জুড়ে এই খেলা চলেছে। কিন্তু প্রজাকে কোন সময় জমির অধিকার কেড়ে নেবার পরামর্শ দেয়নি। সেখানে ধর্মকে এবং ধর্মগত শ্রেণীকে দেখিয়ে দিয়ে বিরোধের জাল প্রশস্ত করা হয়েছে। এই যুগে বাঙ্গালা দেশে এক নতুন ধরণের সাংবাদিকতা সৃষ্টি হল। প্রায় সমস্ত সংবাদ-পত্র জগৎ হিন্দু-পুঁজি দ্বারা কবলিত হওয়ায় জনগণের প্রকৃত সমস্যার খবর কেউ জানতে পারত না। সংবাদপত্র জগতে মধ্যবিত্তের সমস্যার কথা, নিম্নমধ্যবিত্তের সমস্যার কথা, এর সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন, আর হিন্দুসমাজের অগ্রসর শ্রেণীর জনগণের আন্দোলন, শুদ্ধি আন্দোলন—এই সবই কিন্তু

সেই superstucture-এর কাজ—ওপর তলার বিক্ষোভ। এবারে নীচের তলার দিকে তাকান। ১৯২০ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে মেহনতী মানুষেরা কতগুলো ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন করেছে। আসামের চা বাগানের ধর্মঘট, চাঁদপুরে 'কুলি'দের ওপর অত্যাচারের ফলে ষ্টীমার ধর্মঘট, পরবর্তীকালে লিলুয়ার ধর্মঘট এবং তারও আরো অনেক পরে খড়্গাপুরের ধর্মঘট। যতদূর মনে পড়ে ১৯২১ সালে প্রথম সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা গঠিত হয় এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তার প্রথম সভাপতি হন। ১৯২৬ সালে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন আইন হয়। এই যে মেহনতী মানুষের শ্রেণী সংগ্রাম তা কিন্তু সাহিত্যে প্রতিফলিত হল না। যে জমিদার শ্রেণী সাধারণ চাষী শ্রেণীকে অন্নহীন করে আসামের চা বাগানে যেতে বাধ্য করেছে, এবং সমাজের যে অংশ চা বাগানে ঢুকে অমানুষে পরিণত হয়েছে, তাদের বেঁচে থাকার আন্দোলনও সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়নি অথবা এই শ্রেণীটির মধ্যে যে বিপুল বৈপ্লবিক শক্তি নিহিত রয়েছে এবং যে শ্রেণীটির আন্দোলনের ফলে সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভব তা বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রধান সুর হয়ে ওঠেনি। সংগ্রামী জনতার কোন চিত্র আজও তেমন নামজাদা (?) লেখকদের কলম থেকে বেরোয়নি। এর কারণ কি? আজকের দিনে ধর্মঘট, ঘেরাও একটা আন্দোলন বটে। সাংবাদিকেরা প্রভুর পানে তাকিয়ে আন্দোলনের নঙর্থক দিক ফলাও করে লেখেন। বিজ্ঞাপন-ভিক্ষুক দৈনিক সংবাদপত্র বেশীদূর এগোতে পারে না। তাই বৃহত্তর জনসাধারণ এই আন্দোলনের প্রকৃত বৈপ্লবিক শক্তি অনুভব করতে পারে না। কিন্তু একদিন যেমন বাঙ্গালা দেশের জমিদাররা: বাগ্‌দি, হাড়ি, কুড়ি, ডোম, মুচি ইত্যাদি শ্রেণীর হাতে লাঠি দিয়ে জমি দখল করেছিল এবং তাদের মধ্যে

অসমসাহসী, আস্থাভাজন, সৎ চরিত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল তেমনি আজও শিল্পে ধর্মঘট কালে অসমসাহসী সৎ, ত্যাগী বহু চরিত্র বেরিয়ে এসেছে। এঁরা কিন্তু সমাজ জীবনে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করছেন। তথাকথিত প্রগতিবাদী সাহিত্যিকেরা কিন্তু এদের মধ্যে কোন 'যুগ-যন্ত্রণা' দেখতে পান না। বরং মেরুদন্দ হীন, ভীরু কামুক চরিত্রের মধ্যে 'যুগ-যন্ত্রণা' দেখতে পান। নারীর মধ্যে ঐ একটিমাত্র সম্ভোগ কর্ম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান না। কেন প্রকৃত সমাজ-চরিত্রকে বাদ দিয়ে এই সব কলুষ চরিত্র সৃষ্টি করা হয় তার গুরুতর কারণ রয়েছে। আজ সময় এসেছে এই কারণ অনুন্ধান করার। কেননা, অবিরাম দ্বন্দ্বের ফলে শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণীস্বার্থ উভয়ই বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শিবিরেব ভাগাভাগিও বেশ স্বচ্ছ হয়ে এসেছে।

সাহিত্যের যে অংশে সমাজ পুরোপুরি বাস্তবানুগ প্রতিফলিত না হয়েও মানব কল্পনা সৃজনশীল হয়েছে, সমৃদ্ধশালী হয়েছে, সে অংশটি রূপকথার রঙীন রসে পরিপূর্ণ। প্রকৃত কল্পনা বিস্তার সেখানে ব্যাহত হয়নি, তার কারণ তখন সমাজের শ্রেণী শোষণের যাঁতাটা পুরোপুরি কাজ করতে পারেনি। তখনকারকালের সমাজ নেতৃত্বেব শ্রেণী শোষণের যাঁতাটা পুরোদমে চালু না করতে পারার বোধ হয় একটি বিশেষ কারণ ছিল, তাকে যৌথ শ্রমের ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। অর্থাৎ শ্রমটি ব্যক্তির বা কোন বিশেষ গোষ্ঠীব সুখ-সুবিধার জন্য ব্যবহারের তেমন সুযোগ ছিল ছিল না। ফলে এমন একটি সহজাত বসের আসর সৃষ্টি হয়েছিল যাতে সবাই আনন্দ পেত। এবং শ্রোতারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একই বক্তার গল্প রস গ্রহণ করত। প্রকৃতির পরিবেশে গাছ-পাথর-পাখী সবই যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠত। আইসল্যাণ্ডের লোকদের বিশ্বাস ছিল যে, পাখীর ভাষা বুঝতে হলে জিভের

তলায় বাজপাখীর জিভ রেখে চলতে হয়। যতদিন রূপকথার মাঝে পশুপাখী, গাছ-পাথর, নদী উপাদান হিসেবে রসের জোগান দিচ্ছিল ততদিন সমাজের শ্রেণীবিন্যাস ধরা পড়েনি। এবং বোঝা যায় মানব মনে শোষণের তীব্রতাও তখন বৃদ্ধি পায় নি। যেদিন থেকে শ্রেণী এলো, সমাজে শ্রমবিন্যাস ব্যবস্থা এলো, সেদিন থেকেই পৌরাণিক উপকথায় রাজার পুত্তুর এলো। এবং এই 'পুত্তুরেরা' এসেই পৌরাণিক উপকথার চেহারা বদলে দিলো। এর মধ্যে ওপরতলার ছায়া পড়ল। কিন্তু এর মধ্যেও প্রকৃত বাস্তবের কিছুটা আছে। Problems of Soviet Literature সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় গোর্কী বলেছেন, 'In idealizing the abilities of men, and having, as it were, a premonition of their mighty future development, mythology was, fundamentally speaking, realistic. Beneath each flight of ancient fancy it is easy to discover the hidden motive, and this motive is always the striving of men to lighten the labour. It is obvious that this striving originated among men who had to perform physical labour." পৌরাণিক রূপকথার গল্পে ষড়যন্ত্রের উল্লেখ আছে। এবং রাজ্য বিজয়ের কালে অস্বাভাবিক শক্তিধরেরও আবির্ভাব হয়েছে। যুগের পর যুগ দাসত্বের অঙ্গীকারে সম্মত হয়ে রাজ্য বিজয় মেনে নিয়েছে, শিল্পী অতি সত্বর রাজপুত্রর সুরম্য প্রাসাদ গড়ে দিয়েছে ; রাজ পরিবারের ষড়যন্ত্রের ফলে, বিমাতার চক্রান্তে আসল রাজকন্যা ঘুঁটে-কুড়ানীর বেশে দিনাতিপাত করেছে। এবং দেখা যায়, অসম্ভব দৈহিক শ্রমের গ্লানি থেকে

* p 194—Peoples Publishing House Edition.

মুক্তি পাবার জন্য মানুষের অসাধ্য বস্তু এক শক্তিশালী দেবীর আরাধনা করেছে, শেষ বিচারে সত্য প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ কুচক্রীর বিনাশ ও আসল সত্যের প্রকাশ। এই যে অসম্ভব শক্তির কল্পনা সবই সেই "striving of men to lighten the labour" অর্থাৎ মানুষের শ্রম লাঘবের চেষ্টা।

"Social and cultural progress develops normally only when the hands teach the head, after which the head, more grown more wise, teaches the hands, the wise hands once again, this time even more effectually promote the growth of the mind." Problems of Soviet Literature—Gorky.*

সমাজ জীবনের এই যুগে লিখিত ভাষার বা সাহিত্যের তেমন কোন প্রভাব ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু একটা ব্যাপক শ্রমবিন্যাসের মধ্যে দিয়ে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল এটা বেশ বোঝা যায়। ঠিক এই যুগেই রূপকথা তার আসন মেহনতী মানুষের মনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল। কেননা রূপ-কথায় যেমন পরীর গল্প আছে তেমন আবার সাপের গল্প, বাঘের গল্প সবই স্থান পেয়েছে। শিকার সন্ধানের যুগে এই সব প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে মেহনতী মানুষ তার মত করে দেবতাদের চরিত্র সৃষ্টি করেছে। আমাদের দেশের লোকগাথায় বুড়ো শিবকে চাষের ক্ষেতে নিয়ে তাকে দিয়ে চাষ বাসের ব্যবস্থা হয়েছে। এই সব ছড়া, গল্প, লোককথা—সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রেণীবিন্যস্ত নাগরিক সমাজ থেকে অনেক দূরে যারা বাস করত, তারাই শুধু এর রস উপভোগ করত। অতএব এর সঙ্গে আদি-কালের সমাজ বাস্তবতার একটা নিকট সম্বন্ধ রয়েছে। শুধু মাত্র

* p 198—Peoples Publishing House Edition.

এদের মধ্যে শ্রেণীর দ্বন্দ্বের মনোভাব সূত্রপাত হয়নি। সে অনেক পরের আন্দোলনের কথা, পরে আলোচিত হবে। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসে আপনজন জেনে কিভাবে শ্রেণী-সহানুভূতি জাগে এবং তা সাধারণ পাঁচালীগাথায় কতটা স্থান পায় তারই একটি দৃষ্টান্ত এখানে রাখব।

আমাদের দেশের সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে এমন দৃষ্টান্ত মেলে। শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যই, প্রত্যক্ষ দুঃখ থেকে রেহাই পাবার জন্যই মানুষ আবিষ্কার করেছে দেবতাকে। অর্থাৎ কোন একটি শোষিত মানুষের মনে হল যে তার দেবতার শক্তি নেই। সেই শক্তি অন্য কারুর মাঝে প্রবল পরাক্রমে আত্মপ্রকাশ করুক এবং সেই শক্তি দুঃখের কারণ শোষককে শায়েস্তা করুক অথবা আমার প্রত্যক্ষ দুঃখ হরণ করুক। এই দাবী ও মনোবেদনা প্রতিটি দুঃখভোগীর অবচেতন মনে থাকে। যে কালে ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিরপেক্ষ বলে ভাবা হত, সেকালেই তথাকথিত ঐশ্বরিক শক্তি-সম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব হত, তিনি পরবর্ত্তী কালে হতেন অবতার।

তিনি অবতার হয়ে সমস্ত জাগতিক দুঃখের (অর্থাৎ খাওয়া-পরার অভাব ইত্যাদির) হাত থেকে রেহাই দেবেন, এই ছিল সমাজ-চেতনা-বিহীন মানুষের মনের অবস্থা। মানুষ যখন অন্যকে শোষণের পাত্র হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল তখন থেকেই একটি শ্রেণীর বিরুদ্ধে, একটি পরাক্রমশালী শ্রেণীর বিরুদ্ধে, অদৃশ্য ভগবানের কাছে অভিযোগ চলতে লাগল। এই অভিযোগ যুগে-যুগে বিভিন্ন রূপে এসেছে। এদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে এই অভিযোগ কিরূপ নিয়েছিল দেখা যাক। লিখিত ভাষার যুগেই পাঁচালীর রূপ নিয়েছে বটে, তবুও এতে প্রকৃত সমাজ নৈরাশ্যের পরিষ্কার ছবিটি

ফুটে উঠেছে। এবং সে নৈরাশ্য খাওয়া-পরার অভাবের জন্য। সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে আছে—

"মহাপ্রভু গোবিন্দের মহিমা অপার
কাল পাইয়া সেই পূজা করিল প্রচার ॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রূপে ধরিয়া কপটে।
বসিলেন গিয়া প্রভু জাহ্নবীর তটে ॥"

এমন সময় সেখানে আর একটি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ এলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কৃপায় গঙ্গা এবং ব্রাহ্মণ সমাজে যে শোষণের ভূমিকা নিয়েছিল তাতে ভিক্ষাবৃত্তি একটি মহৎ বৃত্তি বলে প্রচারিত হয়েছিল। বৈষ্ণব সমাজে যারা মাধুকরী বৃত্তি নেবে তাদের ভিক্ষা একমাত্র সম্বল। বৌদ্ধ যুগেও ভিক্ষা ধর্মীয় মহিমা লাভ করেছিল। আসলে এই ভিক্ষাবৃত্তি সমাজব্যবস্থা শোষণের একটা ফল মাত্র, তা অনেকেই স্বীকার করেননি। প্রথমে হয়ত ধর্মের নামে যৌথ চাঁদা আদায় হিসেবে এ বৃত্তির ব্যবহার হয়েছিল। পরবর্তীকালে অর্থ দীনতার এ দায় হয়ে দাঁড়াল সমাজের এক মহা ব্যাধি। সে যাই হোক। এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ গঙ্গা তীরে এলেন। আর একদিকে ব্রাহ্মণবেশী গোবিন্দের সঙ্গে সেই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হল।

"হেথায় আসিল এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ।
গোবিন্দ বলেন প্রভু কোথা আগমন ॥
ব্রাহ্মণ বলেন গোঁসাই কি জিজ্ঞাস মোরে।
আমা হেন দুঃখী নাই ভুবন সংসারে।"

কথা ঠিকই। যদি ভিক্ষে করে সংসার চালাতে হয় তবে তাকে দুঃখী হতে হবে বই কি। কিন্তু এর মধ্যে ধর্মের মহিমা ও অস্বাভাবিক শক্তিধরের কথা কোথা থেকে এলো? কিন্তু ভগবানের অথবা সেই অসীম শক্তিধরের করুণা নাহলে ত কিছু হবার উপায় নেই।

সেই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ নিজের দুঃখের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন :

"আপনি আর ব্রাহ্মণী পরে আর কেহ নাই।
দরিদ্র করিয়া মোরে সৃজিলা গোঁসাই॥
সর্ব্ব দিন ভিক্ষা করি না পোষে উদর।
নিবারণ নহে ক্ষুধা পোড়ায় অন্তর॥"

এবার বিশ্লেষণ করে দেখুন। ব্রাহ্মণ বেশে স্বয়ং গোবিন্দ আছেন। তারপর এলেন আর এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। তার দুঃখ (মানে খাওয়া-পরার অভাব) লাঘবের জন্য গোবিন্দ নিজ মূর্তি ধরলেন। তার নাম হল সত্যনারায়ণ অবতার। সত্যনারায়ণের পূজা ও প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে তার (ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের) সব দুঃখ অপসৃত হল। একেবারে বৈদ্যুতিক বাতিতে টিপ আর আলোর ঝরণা—এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই অস্বাভাবিক অচিন্তানীয় ঘটনা সবই কিন্তু সেই শোষণের হাত-থেকে রেহাই পাবার জন্য।

গোর্কী বলেছেন, গল্পে, পুরাণে দেখা যায় ভগবান সহধর্মী ও সহকর্মীরূপে দেখা দিয়েছেন মেহনতী মানুষের কাছে।

"God, in the conception of primitive man was not an abstract concept, a fantastic being, but a real personage, armed with some implements of labour, master of some trade, a teacher and fellow workmen."

যে দৈহিক শ্রমের কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, তা যেমন সমাজ-জীবনকে গঠন করেছে, তেমন আবার সাহিত্যে নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে। মুখ্যত দুটি কারণে শ্রমশক্তি সমাজ বাস্তব-বাদী সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। একটি হল, সমাজ ব্যবস্থায় নিপীড়িত যারা তারা জীবন-ধর্মের মাঝে শ্রমের এমন একটি উৎস খুঁজে পেয়েছে যা তাদের প্রেরণা দিয়েছে রস সৃষ্টিতে। আর একটি হল, নৈরাশ্যের কথা—শ্রমক্লান্ত জীবনে শুধুই বিফল

আশার বুনুনি। সত্যনারায়ণ পাঁচালী থেকে উদ্ধৃত অংশকে অনেকটা সেই নৈরাশ্যের প্রতিফলন বলা যায়। কিন্তু নীচের উদ্ধৃত অংশকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এর মধ্যে রস সৃষ্টির প্রেরণাও আছে আবার শ্রমশক্তিকে ভিত্তি করে বিচিত্র রস বিলাসিতাও আছে। যেমন,

"বৈশাখ মাসে কৃষাণ ভূমিতে দিলা চাষ।
আষাঢ় মাসে শিবঠাকুর বুনিল কার্পাস॥
কার্পাস বুনিয়া শিব গেল কুচনীপাড়া।
কুচনীপাড়া হইতে দিয়ে এলো সাড়া॥
কার্পাস তুলিয়া দিলে গঙ্গার ঠাঁই

*   *   *

গঙ্গা কাটিল সুতা মহাদেব বুনিল তাত॥*";

এই ছড়ার মাঝে সমাজ কর্মের যে সন্ধান মেলে তা মুখ্যত শ্রম বৈচিত্র্যের। এখন বিচার করে দেখতে হবে, এই শ্রমবৈচিত্র্যের মধ্যে কোন শ্রেণী মন আছে কিনা। সত্যনারায়ণের পাঁচালীর মধ্যে ছড়াকার যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিজয়ের পর লৌকিক দেবতাদের অবির্ভাবের কথা। এবং যে দারিদ্র্য ও দুঃখ মানুষ সমাজ-জীবনে ভোগ করছে অর্থাৎ শোষণের জন্য ভোগ করছে—তার একমাত্র প্রতিকার হল নোতুন একটি কাল্পনিক দেবতার আবিষ্কার সূত্রে ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত জীবনের বৈষয়িক সম্পদ ভোগ করা।

ঠাকুর দেবতার সমাজীকরণ (socialisation) পদ্ধতি শুরু হয়েছে দৈনন্দিন শ্রমের মধ্য দিয়ে। নিত্যদিনকার সমস্যার সঙ্গে যেমন মনের পর্দার উঁচুনীচু বিস্তারের যোগাযোগ আছে, তেমন

*মালদহে শিবের গাজন। ১৫৭ পৃঃ বঙ্গসাহিত্য পরিচয়—দীনেশচন্দ্র সেন।

আছে আর একটি স্পৃহা, সে হল ধর্মীয় প্রভাবকে শ্রমের রসে ডুবিয়ে দেয়া। সমাজ-কর্মের সঙ্গে মানসিকতার এই যে সম্বন্ধ তা আমাদের অন্তরে অতি নিবিড় হয়ে রয়েছে। এ থেকে আমরা কতগুলো ভাষা সৃষ্টি করেছি। এবং সেই ভাষাগুলো বিশ্লেষণ করলে এর অন্তর্নিহিত ভাব সমষ্টি ধরা পড়বে। সমাজবাস্তববাদী সাহিত্যে এই ভাষার একটি বিশেষ দান আছে এবং এরা ভাবের ক্ষেত্রেও অনেক বৈচিত্র্য এনেছে।

ভাববাদী সাহিত্যের একটি বিশেষ লক্ষণ হল, কোন শ্রেণী-বিন্যাসকে স্পষ্ট না করে তোলা। ফলে মানবজীবন অনেকটা পরিমাণে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। সমাজ পরিবেশটা যে একটা resultant force—অর্থাৎ কতগুলো কারণ সমষ্টির পরিশিষ্টের মতো কাজ করে এবং তার অভ্যন্তরে কার্যকারণ সম্বন্ধ ওতপ্রোত-ভাবে জড়িয়ে থাকে এই তথ্যটি ভাববাদী সাহিত্যের মধ্যে মেলে না। রবীন্দ্রনাথের অমিত, লাবণ্য ও কেটি মিটার যে শ্রেণী থেকে এসেছে সে শ্রেণীতে প্রেমালাপ পাইনের বনে শোভা পায়। এরা নিছক ব্যক্তি হয়ে ওঠে অথবা অবসরভোগী কুমুর দাদার জীবনে এস্রাজ বাজানোর অভিলাষ পূর্ণ হতে পারে। এই সমাজের এই দুটি শ্রেণীর জীবনধারার সঙ্গে সমাজ-কর্ম নেই। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনকে বিভিন্ন অর্থ-সমাজনৈতিক কর্মের মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে গড়ে তোলার যে মানস, তার পরিচয় নেই। জীবন-কর্মের মূল বেদীটাকে বাদ দিয়ে হস্তীদন্তসৌধের দিকে তাকানো হচ্ছে। এখানে এস্রাজের মাঝে যে বিষাদের সুর তার সঙ্গে জীবনের নির্মম বাস্তবতার পরিচয় কম, তাই অর্থ-সমাজ কর্মের সূত্র থেকে প্রবাহিত হয়ে একটি পরগাছাবৃত্তিতে পরিণত হয়েছে। ঠিক এরই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পটি পাশাপাশি রেখে পাঠ করুন। এখানে জীবন কত নির্মম অথচ

বাস্তব অর্থ-সমাজ কর্মের মধ্যে নিবদ্ধ রয়েছে। তথাকথিত ভাববাদী সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের সমাজবাস্তববাদী সাহিত্যে এই জাতীয় অর্থ-সমাজ কর্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকা উচিত। মানুষের সব দুঃখের মূলেই যে একটি অর্থনৈতিক ক্লিষ্টতা রয়েছে সেই মূল বৈজ্ঞানিক তথ্যটিকে সামনে রেখে সাহিত্যসৃষ্টিতে রস ক্ষুণ্ণ হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

'অমিত, লাবণ্য বা কুমু এদের জীবন যে সমাজসংস্থানের মধ্যে লালিতপালিত হয়েছে তার সঙ্গে পরিচয় আমাদের সব সময়ই মেলে। কিন্তু এরই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে লেখা শোষিত শ্রেণীর গল্পটিকে তুলে ধরলে অর্থ-সমাজ কর্ম ও জীবনধর্ম কি তা বেশ বোঝা যাবে। এবং আমরা যাকে social contradiction বলি, অর্থাৎ সামাজিক সংস্থানের বিপরীতগামী ধারা বলি, তাও বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এবং এর মাঝে সেই চিরন্তন দ্বন্দ্বটি যে কোথায় রয়েছে তাও বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। 'শাস্তি' গল্পের অংশবিশেষ এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

"জজসাহেব তাহাকে বুঝাইয়া কহিলেন, "তুমি যে অপরাধ স্বীকার করিতেছ তার শাস্তি কি জানো?"

চন্দরা কহিল, "না।"

জজ সাহেব কহিলেন—"তাহার শাস্তি ফাঁসি।"

চন্দরা কহিল—"ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তাই দাও না সাহেব! তোমাদের যাহা খুসী করো আমার ত আর সহ্য হয় না!"

যখন ছিদামকে আদালতে উপস্থিত করিল—চন্দরা মুখ ফিরাইল।

জজ কহিলেন—"সাক্ষীর দিকে চাহিয়া বলো এ তোমার কে হয়?"

চন্দরা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কহিল, "ও আমার স্বামী হয়।"

প্রশ্ন হইল—“ও তোমাকে ভালোবাসে না ?”

উত্তর। “উঃ! ভারি ভালোবাসে।”

প্রশ্ন। “তুমি উহাকে ভালোবাস না ?”

উত্তর। “খুব ভালোবাসি !”

ছিদামকে যখন প্রশ্ন হইল, ছিদাম কহিল, “আমি খুন করিয়াছি।”

প্রশ্ন। “কেন ?”

ছিদাম। “ভাত চাহিয়াছিলাম বড় বৌ ভাত দেয় নাই।”

দুঃখিরাম সাক্ষ্য দিতে আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর উত্তর করিল—“সাহেব আমি খুন করিয়াছি।”

“কেন ?”

“ভাত চাহিয়াছিলাম ভাত দেয় নাই।”

* * *

জেলখানায় ফাঁসীর পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, “কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর ?”

চন্দরা কহিল, “একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।”

ডাক্তার কহিল—“তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব ?”

চন্দরা কহিল,—“মরণ—”

* * *

আমরা আলোচনার ক্ষেত্রে যে কথাটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করছি তা হচ্ছে ‘অর্থ-সমাজনৈতিক’, আর একটি কথা ‘সমাজকর্ম’।

উপরি-উক্ত গল্পে আছে দুখিরাম এবং ছিদাম সেদিন জমিদারের কাছারিবাড়ি কাজ করতে গিয়েছিল। অর্থের জন্য এই কাজ করতে গিয়েছিল বললে ভুল হয়। এজাতীয় কাজ অনেকটা ‘বেগার’ খাটার মত। কাজ করবে, তার উপযুক্ত বেতন পাবে না।

আবার মজা হল কাজ না করার অধিকারও সামাজিক মানুষের নেই। কাজেই পুরো খাটুনি এবং আধা-পেটে থাকা, খাটুনির যথাযথ বেতন না পাওয়া, এ ধরনের দাসবৃত্তি বা জবরদস্ত গোলামী সমাজে একদিন প্রচলিত ছিল। এই প্রচলিত ব্যবস্থার খানিকটা অংশ রবীন্দ্রনাথ গল্পে চিত্রিত করেছেন। আমরা এটাকে বলছি অর্থ-সমাজনৈতিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার সঙ্গে দাসবৃত্তি, বা জবরদস্তি খাটুনির অংশ পুরো রয়েছে। চিত্রটি এইরূপ :

"বর্ষায় চর ভাসিয়া যাইবার পূর্বেই ধান কাটিয়া লইবার জন্য দেশেব দরিদ্র লোকমাত্রেই কেহবা নিজের ক্ষেতে, কেহবা পাট কাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে ; কেবল কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবরদস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারি ঘরের চাল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে জল পড়িতেছিল, তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটা কতক ঝাঁপ নির্মাণ করিতে তাহারা সমস্ত দিন খাটিয়াছে। বাড়ি আসিতে পায় নাই, কাছারি হইতে কিঞ্চিৎ জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজিতে হইয়াছে, উচিত মত পাওয়ানা মজুরী পায় নাই ; এবং তাহার পরিবর্তে যে-সকল অন্যায় কটু কথা শুনিতে হইয়াছে, সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক্ত।" বস্তুত সমাজের তলাকার শ্রেণীটি এমনি একটি অর্থ-সমাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে চিরদিন বাস করে। উচিত মত পাওয়ানা মজুরী না পেয়ে কাজ করা তাদের সমাজ-কর্মের অঙ্গীভূত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা বহুদিনের অত্যাচারের ফলে তারা বুঝে নিয়েছে তাদের ও-রকমের কিছু-কিছু খাটুনি খাটতেই হবে। নচেৎ বড়লোকের অত্যাচারে তাদের জীবন, সামাজিক অস্তিত্ব বিলোপ পাবে। ওটা অভ্যস্ত জীবনের অঙ্গ হিসেবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই সমাজকর্মের পলির নিচে আর একটি স্তর আছে তাকে আমরা বলেছি অর্থ-সমাজনৈতিক কর্ম। অর্থাৎ

অর্থের অভাব বোধ থেকে যে নিঃস্বতা সৃষ্টি হয়েছে, সেই নিঃস্বতা ও নিপীড়নমূলক বাধ্যবাধকতাই হল অর্থ-সমাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল উপাদান।

এটা মেহনতী মানুষের জীবনে যেমন একান্ত হয়ে ওঠে, অবসর-ভোগী উচ্চশ্রেণীর জীবনে তেমন একান্ত হয়ে ওঠে না। এই শ্রমের আবশ্যিক প্রভাব-ক্লিষ্ট শ্রেণী আর প্রভাব-ক্লিষ্ট না-হওয়া শ্রেণী, এদের মাঝে ব্যাবধান শুধু 'শোষণে'র। কোন শ্রেণী কি অবস্থায় বিরাজ করছে তার উপর নির্ভর করে সমাজজীবনের তথাকথিত শান্তি ও শৃঙ্খলা অথবা সামাজিক ভারসাম্য। এখন কথা হচ্ছে সাহিত্যে এই সামাজিক ভারসাম্য, শৃঙ্খলা ও শান্তির অবকাশ কোথায়। কিন্তু আমরা যাদের ভাববাদী অবাস্তব সাহিত্য বলি তাদের মধ্যে এই সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার বিপুল চেষ্টা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' থেকে শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজে' এই ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু মেহনতী মানুষ দুখিরাম রুই আর ছিদাম রুই—এদের সমাজ জীবনে কোন ভারসাম্য নেই। তার কারণ শোষণের যাঁতাকল এমন প্রবল, যে তাঁরা অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মানসিক শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে, জমিদারের কাছারিবাড়ির পেয়াদা এসে জবরদস্তি ধরে নিয়ে গেল। সেখানেও কোন প্রতিবাদের সুর তাঁদের জীবনে নেই। আবার সমস্ত দিন জলে ভিজে কটু কথা শুনে যে কাজ করে এলো তারও পুরো পাওনা নেই। বরং সব দিক ওজন করে দেখা যায় গালিগালাজের দিকেই পাল্লা ভারি। শেষপর্যন্ত সামাজিক ভারসাম্য ঘরে এসে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। ক্ষুধার্ত ক্লান্ত মানুষ যখন চারটি ভাত চাইল তখন আসল ভয়াবহ সত্য প্রকট হয়ে পড়ল। ঘরে কেউই চাল রেখে যায় নি। অতএব রান্না করে ভাত সাজিয়ে রাখার প্রশ্ন ওঠে না।

আব ভাত রাখার প্রশ্ন তখনই উঠতে পারে যদি স্ত্রী কোথা থেকে দাসীবৃত্তি করে ইত্যাদি। এই মন্তব্যের কুৎসিৎ দিকটা দুখির.ামেব মনকেও উন্মত্ত করে তুলেছিল। ক্ষুধিত ক্লান্ত মানুষ একেবারে বাঘের মত লাফিয়ে উঠে যে কাণ্ডটি করল তাতে জীবনেব চবম সামাজিক ভারসাম্য চিবতরে বিনষ্ট হয়ে গেল।

ববীন্দ্রনাথ যদি এখানে শ্রেণীগত বৈষম্য ভুলে গিয়ে একটু বিদ্রোহেব সুব ধ্বনিত করে তুলতেন তাহলেই গল্পের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা একটি বিশিষ্টতা লাভ করত। কিন্তু তা না হয়ে বিষয়টি অন্য রূপ নিল। নিদারুণ অভাবেব মুখে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ মানুষের জিঘাংসাবৃত্তিব আদিম খেলা দেখালেন। অবিশ্যি চন্দরার চরিত্রের গভীব অভিমান, স্বামীব প্রতি নিগূঢ় ভালবাসাব লক্ষণ, অতি সূক্ষ্মভ বে পবিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু সামাজিক মানুষ যেন অতি নির্মম দুরূহ অবস্থাব মধ্যে একটি নিছক অবনমিত মন নিয়ে গড়ে উঠেছে। এজন্য কবিব মনে কোন বিদ্রোহের ভাব নেই বা দুখি ও ছিদামেব মনে সেই বিদ্রোহের বীজ পুতে দেননি, যাতে করে পববর্তী সাহিত্য অনুপ্রাণিত হতে পাবে। অবশ্যি গল্পে অন্যান্য গুণ যথেষ্ট রয়েছে, কিন্তু একটি মৌলিক সত্যের অভাবে গল্পটা চিরন্তনরূপ পেল না বলেই আমাদেব বিশ্বাস। নচেৎ এই গল্পটি সমাজবাস্তববাদী সাহিত্যে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকতে পারত।

"Fielding, in discussing the theory of novel, always emphasised its epic and historical character. 'You cannot, he insists, show a man complete unless show him in action. The novelist, he writes in one of the introductory chapters to 'Tom Jones', is not a mere chronicler, but an historian............The novelist, as opposed to the chronicler, must use the

method "of those writers who profess to disclose the rvolutions of countries." *

Ralph Fox সমাজতন্ত্রী সাহিত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উপরি-উক্ত সূত্রটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই সূত্রটি উল্লেখের সমধিক গুরুত্ব এখানে প্রতিপাদিত হয়েছে এই কারণে যে আজকাল—বিশেষ করে বাঙ্গালার গল্প ও উপন্যাস সাহিত্যের—বেশীর ভাগ লেখক ঐতিহাসিকের ভূমিকা না নিয়ে নিছক কাহিনীকার হয়ে উঠেছেন। এখানে 'ঐতিহাসিক' কথাটি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। কেননা যেসব লেখার মধ্যে বিপ্লবের বা একটা পরিবর্তনশীল অনন্ত গতিধারার উল্লেখ পাওয়া যায় তাকেই কাহিনীর পর্যায় থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই সূত্রের প্রয়োগ করলে অবিশ্যি অনেকের লেখাই আমাদের আলোচনা থেকে বাদ দিতে হবে। কিন্তু বাঙ্গালার জল, বায়ু, ও সামাজিক জীবনযাত্রার কথা চিন্তা করে এই সূত্রের পূর্ণ প্রয়োগ খানিকটা পরিমাণে শিথিল করতেই হবে। বাঙ্গালার একটি বিশেষ যুগের সাহিত্যের উপজীব্যবস্তু ছিল বামুন, কায়েত, বৈদ্যি। এই তিনটি শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংস্থান ছিল জমিদারী, তেজারতী, আইন ব্যবসায় আর কেরাণীগিরি, ছোটখাট তালুকদারদের সঙ্গে জমিদারদের লড়াই। শ্রেণীস্বার্থ বনাম সামাজিক স্বার্থ, নব্য শিক্ষিতের যৌথপরিবার ত্যাগ, সমাজ ত্যাগ, ব্রাহ্মধর্মের প্রসারে নব্য নাগরিক জীবনের প্রতি অনুরাগ, শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মবোধ করে নব্য উঁচুমার্গের শ্রেণী-চেতনার জাগরণ।—এই যে পর্যায়ক্রমে সামাজিক ও কৃষ্টিগত ধারাগুলো চলে এসেছে এর সঙ্গে কিন্তু কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের যোগ নেই। প্রচলিত

* Novel and the People—Ralph Fox, p 85, First Indian Edition, 1944, Eagle Publishers, 309 Bowbazar Street, Calcutta.

সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নবগঠিত শ্রেণীর নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার যে আকুল চেষ্টা তা কেরাণী জীবনের দুঃখবাদের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

আঠারোশ' আটান্নতে যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের ওপর অতবড় একটা আঘাত এলো তা কিন্তু বিশেষ-ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে উল্লেখিত হয়নি। উচ্চবিত্ত বাঙ্গালী, এবং একটা বিশেষ সামরিক কর্মচারী সম্প্রদায়, যারা লাঠির জোরে জমিদার হয়ে বসেছিল—তারা সবাই বহুদিন পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শুভ ফল পেয়ে শান্ত ছিল। শিক্ষিত বাঙ্গালী (এদের বেশীর ভাগ বামুন কায়েত, বৈদ্যি! আর একটি সামাজিক শ্রেণী আছে যারা এই তিন ভাগের মধ্যে পড়ে না।) ইংরেজের সঙ্গে বিদেশে গিয়ে নিজেদের অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। ফলে ইংরেজ স্থিতস্বার্থ ও উচ্চবিত্ত বাঙ্গালীর স্থিত-স্বার্থ সমসম রূপ ধারণ করেছিল। বাঙ্গালার বিপুল শ্রমশক্তি যাদের মধ্যে লুকিয়ে ছিল তাদের এতটুকু স্থান গল্প উপন্যাসের পাতায় ছিল না বললেই হয়। তারা সাহিত্যের মধ্যে সমষ্টিগত একটি স্বরূপ নিয়ে দেখা দেয়নি। অথচ পূর্ব-বাঙ্গালার পাটচাষী, ধানচাষী, উত্তর বঙ্গের চা-শ্রমিক, পশ্চিম বঙ্গের খনিশ্রমিক, আর দক্ষিণ বঙ্গের দুর্দান্ত মধু আহরণকারী ও মৎস্যজীবী—এরা কেউই বাঙ্গালা সাহিত্যের রস জোগাতে পারল না। বরং মধ্যযুগের মঙ্গল সাহিত্যের মাঝে এই সব শ্রেণীর কিছু-কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বুর্জোয়া সম্প্রদায় কলম ধরার পর এদের একদম নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। শুধু জমিদারী মোকদ্দমার দলিল-দস্তাবেজের মধ্যে এদের পরিচয় মেলে। অবিশ্যি সাহিত্যে এদের স্থান না-থাকার মধ্যে আর একটি কারণআছে ; সেটি হচ্ছে, অভিজ্ঞতা। তালুকী-মুলকী স্থিতস্বার্থ বৃদ্ধি হবার পর এই শ্রেণীটি

একেবারে বিপুল সমাজদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কেবলমাত্র খাজনা আদায় ও অসল জীবনযাত্রার ইন্ধন যোগানো ছাড়া এদের কোন কাজ ছিল না। কাজেই সমাজসংযোগ যাকে বলে তা সম্ভব ছিল না। কিন্তু পাশাপাশি বাস করে কৃষি উৎপাদন শ্রমশক্তির অধিকারী সমাজকে জানব না—এটাও কোন সার্থক যুক্তি নয়। এদেশে মুসলমান শাসকগোষ্ঠী ছিল, তাদের পতনকে এরা মনে-মনে অভিনন্দন জানিয়েছে। এবং পরবর্তীকালে এদের (মুসলমান সমাজের) সুখদুঃখের প্রতি গভীর ঔদাসীন্য প্রকাশ করেছে। এই ঔদাসীন্য ও পরিহাসবৃত্তির ফলে ঐ সমাজের আবার ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজের প্রতি প্রতিশোধপরায়ণতা দেখা দেয়। কালক্রমে তা এক গুরুতর রাজনীতির রূপ নেয়, যাকে সাদা কথায় আমরা বলি 'সাম্প্রদায়িকতা'। পরবর্তীকালে উভয় সম্প্রদায়ের একরোখা সামাজিক চেতনা সংবাদ সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হতে থাকে। অবিশ্যি তার আগে রাজনৈতিক আন্দোলন (১৯০৫, ১৯২১) ঘটে।

তাই বাঙ্গালার গল্প উপন্যাস সাহিত্যে 'সিপাহীবিদ্রোহ'-এর মূল ঐতিহাসিক ইন্ধনটি তখনও তেমন ফুটে ওঠেনি। সমসাময়িক কালে না-হোক পরবর্তী কালের গল্পে বা উপন্যাসে সেই বিপ্লবের সুর তেমন করে খুঁজে পাওয়া যায় না। গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ থেকে শুরু করে বর্ধমানের রাজাদের আমলের সূর্যাস্ত আইন—সবই উচ্চবিত্তের স্বার্থরক্ষার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল এবং সে স্বার্থ ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীকে ঘিরে। বাঙ্গালার এ সমাজ-অর্থনৈতিক কারণগুলি সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি। তার ফলে বাঙ্গালায় এপিক জাতীয় সাহিত্য তেমন গড়ে ওঠেনি। বর্তমান কালের কথা আলাদা। কেউ-কেউ এপিকের ঢং-এ কিছু উপন্যাস সৃষ্টি করছেন। কিন্তু তার মধ্যে Fielding-এর revolutions of countries

ফুটে ওঠেনি। তার ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যে গল্প বা উপন্যাসে বৃহত্তর সমাজজীবন না এসে পারিবারিক জীবন এসেছে। নিছক পারিবারিক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা মনোবৃত্তি নিয়ে গল্প লেখার মানেই হল একটা স্থিত অবস্থার প্রতি অতি-অবচেতন মনে লেখকের নিগূঢ় সম্বন্ধ অনুভব করা। বাঙ্গালার গল্প বা উপন্যাস সাহিত্যে পারিবারিক গঠন নিয়ে যে সামাজিক মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে তার শিল্পকলা ও সৌন্দর্য নিয়ে এখানে আলোচনা করছি না। তার স্থান অন্যত্র নির্দিষ্ট হয়ে আছে। কিন্তু এই, যুগের, বিশেষ করে সমাজতন্ত্রী সাহিত্যের যুগে লেখক, এমন একটি সত্যের সন্ধান করবেন যার মুল উৎস হল বিপ্লব। এই চেতনাটুকু লেখকের মনে না এলে তিনি প্রকৃতপক্ষে সমাজের বাস্তব শ্রেণী-সংস্থানের রূপটা ধরতে পারবেন না। এটা সব সময়ই দেখা গেছে যে, যে-শ্রেণী শাসনব্যবস্থা সৃষ্টি করে সাহিত্যের, বিশেষ করে গল্প ও উপন্যাস সাহিত্যে, চরিত্রগুলি সেই শাসক শ্রেণীর অনুকূলে সৃষ্টি হয়। এর দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য ও বাঙ্গালা সাহিত্য থেকে তুলে দেখানো যায়। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে-সাথে সাহিত্যের (বিশেষ করে গল্প এবং উপন্যাসের) হাওয়া বদল হতে দেখা যায়। তার কারণ এ এক-একটি শ্রেণীর স্বার্থে গড়ে ওঠে। এবং সে শ্রেণীর চরিত্র তখন উপন্যাসে স্থায়ী আসন পেতে বসে। এই সম্পর্কে তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। প্রথম যুদ্ধের সময় থেকে রচিত কাহিনী (chronicle) যে দ্বন্দ্ব ও আশা আকাঙ্ক্ষার চিত্র এই কাহিনীতে চিত্রিত করা হয়েছে, তা সবই ইংরেজের বিরুদ্ধে নব্য জাতীয়তাবাদের অনুকূলে। যেখানে সশস্ত্র বিপ্লবের ইঙ্গিত এসেছে, সেখানেই তারাশঙ্করের নায়ক পিছু হটতে লেগেছে। এবং রক্তাক্ত বিপ্লবের পরিণতির দিকে সন্দেহ প্রকাশ করে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। তারাশঙ্করবাবুর চিন্তার দীনতার চিহ্ন আরো অনেক

লেখায় আছে, তবু মাটির মানুষের (যেমনটা ছিলাম তেমনটি থাকি—এভাবের লেখা) স্বাদ তাঁর লেখায় বেশ পাওয়া যায়। 'ধাত্রী দেবতা' যে মূল উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হয়েছিল তা এ বই-এর মুখবন্ধেই পরিস্ফুট। এই বই প্রকাশের ইতিহাসটি বড় কৌতুকাবহ। 'ধাত্রীদেবতা' লেখার মূল প্রেরণা কোথায় তা এ বই-এর মুখবন্ধ পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যাবে। একটি জমিদার 'সম্প্রদায়কে' যে মহৎ ভূমিকায় নামানো-ই এর মুখ্য উদ্দেশ্য মুখবন্ধ পড়লেই বুঝতে পারা যাবে। অভিজ্ঞ পাঠকের মূলসূত্রটি বুঝতে এই মুখবন্ধ বিশেষ সহায় হবে বলে আশা করি।

" 'ধাত্রীদেবতা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ সনে, আশ্বিন মাসে। তার পূর্বে শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী' মাসিক পত্রিকায় 'জমিদারের মেয়ে' নামে একখানি উপন্যাসের পত্তন লেখক করেছিলেন। ১৩৪১ সনে 'বঙ্গশ্রী'র মাঘ ও ফাল্গুন দুই সংখ্যায় মাত্র 'জমিদারের মেয়ে' প্রকাশিত হয়, তারপর উপন্যাসটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। তার বেশ কিছুদিন পর 'জমিদারের মেয়ে' নব পরিকল্পনায় ও নবকলেবরে 'ধাত্রীদেবতা' নামে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। ধারাবাহিক ভাবে ১৩৪৫ সনের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে ১৩৪৬ সনের ভাদ্র সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে সমাপ্ত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় কোন পরিবর্তন বা সংযোজন হয়নি। পরবর্তী কোন সংস্করণের পরিবর্তন হয়নি।"

সন তারিখ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এই বই জাতীয় আন্দোলনের যুগেই আত্মপ্রকাশ করেছে। অতএব উচ্চবিত্তের আন্দোলনের মধ্যে উচ্চবিত্তের মহত্বের ছাপ পড়বেই। বস্তুতপক্ষে তাই ঘটেছে তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা'তে। সাহিত্যের (সমাজতান্ত্রিক নহে) -ধারাবাহিকতার দিক থেকে এ জাতীয় আদর্শবাদ দেখা দেবেই, কিন্তু তারাশঙ্করেরও বহু পূর্বে শরৎচন্দ্র একটি আন্দোলনের পদধ্বনি

শুনতে পেয়েছিলেন। এবং সেটা সামাজিক সুস্থ সহজ মানুষের নির্মম আত্মঅবমাননাকারী মেহনতী মানুষে পর্যবসিত হবার অনিবার্য অবস্থা-ক্রম, চিত্রটিকে আবার নোতুন করে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

"অনেক রাত্রে গফুর মেয়েকে তুলিয়া কহিল, 'আমিনা চল আমরা যাই'।

সে দাওয়ায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, 'কোথায় বাবা?'

গফুর কহিল, 'ফুলবেড়ে চটকলে কাজ করতে।' "

গফুর সামন্ততন্ত্রী ভূমিব্যবস্থা থেকে ছিট্‌কে একেবারে কলকারখানার মজুরে পরিণত হল।.

এই আকস্মিক সমাজ-সংস্থান পরিবর্তনের পেছনে যে শোষণের পর্যায়ক্রম রয়েছে, তার ইতিহাস আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আর দশটা ঘটনার ক্রমপরিণতি দিয়ে এই আকস্মিক সমাজ-শ্রেণী সংস্থানের পরিবর্তন ধরতে পারা যায়। যে-মানুষ একদিন সাধারণ চাষী গেরস্থ ছিল, জমিদারই তার প্রধানতম শোষক ছিল, এবং সে (চাষী) ছিল উৎপাদন ব্যবস্থার একমাত্র সূত্র। এর অর্থনৈতিক অবদমিত অবস্থার ওপর জমিদার ছিলেন মহাপ্রভু এবং চাষীর কোন সামাজিক মানবিক মর্যাদা ছিল না। এই অবস্থাটা সামন্ততন্ত্রের যুগে একটি শ্রেণীর জন্য বরাবরই নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু এর পরিবর্তন ঘটল শিল্প বিপ্লবের যুগে। চাষীর শ্রম-স্বাধিকারের পর্যায় এলো বটে, কিন্তু সেখানেও শ্রমের বাজারে সে অন্নদাস। কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও অত্যাচার থেকে, শিল্পবিপ্লবের ফলে যে শ্রম মুক্তি লাভ করেছে তাকেই—সেই মুক্তিকেই, সে (গফুর) চরম ও পরম বলে মেনে নিল। অর্থাৎ পূর্বতন শ্রেণীসংযোগ ছেড়ে আর একটি শ্রেণীসংযোগকে মেনে নিল।

এই মেনে নেবার মধ্যে গফুরের হাত খুবই সামান্য ছিল। সমাজ-অর্থনৈতিক পরিবেশ তাকে এমনভাবে অবস্থান্তর করেছে যে এর থেকে অন্য কিছু বেছে নেয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এক কথায় দুর্দ্ধর্ষ ধর্ম্মান্ধ সমাজ-ব্যবস্থার যুগে গফুরের মত লোকেরা চিরদিন নিজেদের বলি দিয়ে এসেছে। এখানে সমাজবাস্তববাদী সাহিত্যের নৈতিক দায়িত্ব হল এমন একটি চেতনশীল মনকে গড়ে দেওয়া যে, ভবিষ্যৎ গফুরেরা সব সময়ই মনে করবে তারা সমাজের একটি সজ্ঞান অস্তিত্ববান অংশ। তাদের সচেতন প্রতিবাদের সঙ্গে সমাজব্যবস্থার অদূর বা সুদূর পরিবর্তন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এরই নাম সাহিত্যে বিপ্লবী চেতনা বলা যেতে পারে।

কিন্তু সাহিত্যে হাওয়াটা যে অমনি-অমনি বদলায় না, তা আশা করি সবাই অনুভব করতে পারবেন। এই হাওয়া বদলের জন্য বৈপ্লবিক চিন্তা নিয়ে আন্দোলন করতে হয় এবং সেই আন্দোলন যে বৈপ্লবিক ভাবাপন্ন হবে সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের শেষের দিকে কলের কাজে যাবার একটি ইঙ্গিত আছে। সামন্ততন্ত্রী ভূমিব্যবস্থা থেকে ছিটকে পড়ে গফুরের একেবারে কারখানার মজদুর হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই যে পরিবর্তন বা সামাজিক সংস্থানের নতুন সংযোজন জীবনে ঘটেছে এর একটি বৈপ্লবিক দিকও আছে। অভ্যস্ত সমাজব্যবস্থা থেকে নতুন সমাজব্যবস্থা গ্রহণ করতে যে পারিপার্শ্বিক ব্যক্তিকে বাধ্য করছে সেই পারিপার্শ্বিকই একটি অতি গুরুতর ও প্রভাবশালী অর্থনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কাজেই সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে ব্যক্তি যখন উৎক্ষিপ্ত হয়ে একেবারে শহুরে শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে তখন তার চেতনা দুই রকমে সৃষ্টি হতে পারে। এক হল যে, যা আছে তা মেনে নেবার মনোভাব। আর দুই

হল অভ্যস্ত ব্যবস্থাকে মেনে না নেবার মনোভাব। এই যে ব্যক্তির মধ্যে আমরা দুটি মনোবৃত্তি পেলাম, এর সঙ্গে বৈপ্লবিক চিন্তা অন্দোলন ধারার একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। অর্থাৎ বৈপ্লবিক চিন্তধারা বা অবস্থিত ব্যবস্থার আমূলপরিবর্তন ছাড়া এই নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না। শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থায় সংযুক্ত যে ব্যক্তির মনোবৃত্তি মেনে-নেয়ার ভাব থেকে জন্ম, সে ব্যক্তি বৈপ্লবিক চেতনার সংস্পর্শে আসেনি। এবং আসেনি বলেই তার চিন্তাধারা স্থিতাবস্থা মেনে নিতে চাচ্ছে। সেইজন্য বৈপ্লবিক আন্দোলন যত ব্যাপক ও গভীর হবে ততই ব্যক্তি—সে যে কোন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকুক-না-কেন—বৈপ্লবিক চেতনা লাভ করবে।

কাজেই সাহিত্যে সাহিত্যিককে নিছক কাহিনীর বিবৃতিকার না হয়ে তাকে সেই বিপ্লবের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হবে। বস্তুত সমাজবাস্তববাদী সাহিত্য কিন্তু এই বিপ্লবের সন্ধান করে বেড়াবে। এবং এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে সেই বিপ্লবকে সাফল্য-মণ্ডিত করে তোলা। Fielding তাঁর মন্তব্যে যাকে বলছেন—you cannot show a man complete unless you show him in action.—এই মন্তব্যের মূলে নিশ্চয়ই একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। সমাজে চরিত্র যা আছে তা নিয়েই যদি সন্তুষ্ট থাকতে হয় তবে তাকে মানবিক ক্রিয়ার গতিময়তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে না। অতএব চরিত্র মানবিক গতিময় ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়েই আপনার সত্তা প্রকাশ করবে। তবেই তা সত্যিকারের চরিত্র হয়ে উঠবে। সমাজ-পারিপার্শ্বিক ভেঙ্গে গড়বার গঠনমূলক বৃত্তি তার বৈপ্লবিক চিন্তাকে সৃজনশীল করে তুলবে। এবং একটি অনন্ত গতিধারা চরিত্রের অন্তর থেকে ফুটে বেরুবে। এর দার্শনিক ভিত্তি এঙ্গেলস্-এর কথায় বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, "The great

basic thought that the world is not to be comprehended as a complex of ready made *things*, but as a complex of *processes*, in which the things apparently stable no less than their mind-images in our heads, the concepts, go through an uninterrupted change of coming into being and passing away, in which, in spite of all seeming accidents and of all temporary retrogression, a progressive development asserts itself in the end......"*

এই গতিময়তার সক্রিয়-লীলা রবীন্দ্রনাথের 'গোড়া'র মধ্যে পাওয়া যায়। কেউ-কেউ গোড়ার এই গতিময়তাকে অস্থির চেতনা বলেছেন, কিন্তু আমরা বলি গোড়ার আদর্শবাদ আজকের নিরিখে যাই-ই বলে তার বিচার হোক-না-কেন, কিন্তু গোড়া যে কোথায় স্তব্ধ হয়ে যায়নি, তার গতি মন্থর হয়ে যায়নি, এর বহু লক্ষণ তার চরিত্রের মধ্যে আছে। সেই অন্ধসংস্কারের যুগেও যে তার মধ্যে একটি সমাজচেতনা এসেছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। তার পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথের বহু লেখায় বৃহত্তর সমাজ আর তেমন করে ধরা দিচ্ছে না। জীবন-চরিত্রের বিকাশটা ক্রমশই পরিবারভিত্তিক হয়ে উঠল। একটা পরিবারের চৌহদ্দির মধ্যে কোন চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে গেলেই কতগুলি স্থিতাবস্থা মেনে নিতে হয়, এবং আর একটি নির্মম সত্য অতি অজ্ঞাতসারে প্রকাশ হয়ে পড়ে। সে হল এই যে, পরিবারকে বৃহত্তর সমাজের অংশ-বিশেষ না দেখিয়ে নিতান্তই একটি unit হিসেবে দেখানো হয়।

*Ludwig Feuerbach—F. Engels—p. 54, Martin Lawrence, London

যে-পরিবারের মহিমা বা অবনমিত ব্যবস্থা চিত্রিত হচ্ছে তার কোন সমাজপরিপ্রেক্ষিত নেই। অর্থাৎ চরিত্রগুলি হঠাৎ ছবির পর্দায় এসে তাদের রাগ, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, ভালবাসা, অভিমান, ঈর্ষা, ব্যর্থতা, বেদনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, হতাশা, সফলতা, বিফলতা, বিরহ, মিলন, বিচ্ছেদ—এবং মন দেয়া-নেয়ার ক্ষেত্রে ভুল-বোঝাবুঝি অভিব্যক্ত করে। মোটামুটি গল্প উপন্যাস সাহিত্যে এই সব ভাব নিচয়-ই প্রকাশ পেয়ে থাকে। কিন্তু এই সব ভাবের অদান-প্রদানের মধ্যে সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতের সূক্ষ্মভাবে যে একটি দান আছে তা সমালোচকরা খতিয়ে দেখতে চান না। তার কারণ সমাজ-বিজ্ঞানকে পেছনে রেখে সাহিত্য সৃষ্টির জন্যই তা সম্ভব হয়েছে। তিরিশ বছরের এক একটি দশকের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে গল্পের চরিত্র, উপন্যাসের চরিত্র মিলিয়ে দেখুন, প্রকৃতপক্ষে চরিত্রটা কোথা থেকে তার আসল রস যুগিয়ে আসছে দেখতে পাবেন।

বিশ থেকে চল্লিশ দশকের মধ্যে যে সব গল্প বা উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছে তার অধিকাংশ গল্পে বা উপন্যাসে নিম্নমধ্যবিত্তের পারিবারিক জীবনের সমস্যা, পুত্রকন্যারা অবৈধ প্রেম নিয়ে ব্যস্ত, বেকার সমস্যা হেতু প্রেমের ব্যর্থতা, যৌন জীবনের গ্লানি তখন এসে গিয়েছে; যুদ্ধের হিড়িকে যৌনজীবন তখন একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পেয়েছে, এবং প্রয়োজন মেটাতে,—অর্থের এবং দেহের প্রয়োজন মেটাতে—সমসামাজিক বন্ধন তখন আর কোন বন্ধন নয়। ইতিপূর্বে রবীন্দ্র-গল্পে হিন্দু সমাজের জাতসর্বস্ব, শ্রেণীসর্বস্ব, কৌলিন্য, তা ভাঙ্গিয়ে খাওয়া, শরৎচন্দ্রের অনেক গল্পে জাত মেরে একঘরে করার কাহিনী, মেয়ের বিবাহ না-দেবার অপরাধে অসমর্থ পিতার দুঃখের কাহিনী—এ সবই কিন্তু অনেকস্থলে সমাজ গতিহীনতার চিহ্নদ্বারা চিহ্নিত হয়ে আছে। হিন্দু সমাজের

ব্রাহ্মণের কূলপ্রথা সাহিত্যে এতখানি স্থান জুড়ে থাকার অর্থই হল দেশে রেলগাড়ী এলেও বৃহত্তর বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ তার চির-পরিচিত চৌহদ্দি ছেড়ে বাহির বিশ্বের দিকে তাকায়নি। সাম্রাজ্যবাদের অনেক কার্যের মধ্যে একটি কার্য হল—অন্তত ইংরেজি শিক্ষিত বাঙ্গালীর একটা শ্রেণীকে—ঘরছাড়া করা। রেলগাড়ির পথ ধরে পশ্চিম দেশ থেকে শ্রমজীবীদের বাঙ্গালায় আগমন হয়েছিল। কিন্তু যারা এলো তারা বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনে কোন রেখাপাত করতে পারল না। তার কারণ সেই শ্রমজীবীরা তখনও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠতে পারেনি বা কোন আন্দোলনের মারফৎ সমাজ জীবনের ওপর কোন গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারেনি। তার ফলে এদের মধ্যে যে সুপ্ত বিপ্লবী চেতনা রয়েছে তারও পুরোপুরি উদ্বোধন হয়নি। এই মানসিক পঙ্গুতা বাঙ্গালা সাহিত্য নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যের কথা বলতে পারব না, তবে বাঙ্গালা সাহিত্য যদি এদের সুপ্ত বিপ্লবী বৃত্তি নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারত তবে বাঙ্গালা সংস্কৃতির নব দিগন্ত ফুটে উঠত।

‘গণদেবতা’ (১)

ইতিপূর্বে আমরা যে সমাজকর্ম ও অর্থনৈতিক কর্ম দুটি বিশিষ্ট শ্রেণীভাগ করেছিলাম তা বিভিন্ন ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে কিভাবে পরস্পরকে (সমাজকর্ম ও অর্থনৈতিক কর্মকে) প্রভাবিত করে এবং দুয়ের অন্তর্নিহিত সংযোগ সাহিত্যের মধ্যে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তারই আংশিক একটি বিশ্লেষণ এখানে আলোচনা করা হবে। অর্থনৈতিক কর্মের মধ্যে দিয়ে শ্রেণীর উত্তরণ ও বিসর্জন ঘটে তারও কিছু আলোচনা এখানে রাখা হবে। তবে পূর্বাহ্নেই বলে রাখা ভাল যে সব আলোচনাই পূর্ণাঙ্গ নয়। কেননা প্রেক্ষাপট একটু বিস্তৃত বিধায় সংক্ষিপ্ততা অনিবার্য কারণেই ঘটতে বাধ্য। আমাদের প্রথম বিচার্য বিষয় : শ্রেণীচেতনা ও তার উদ্ভব কিভাবে সাহিত্যের মধ্যে সম্ভব। আমাদের প্রথম উত্তর হল : অর্থনৈতিক কর্মের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব। বাস্তবক্ষেত্রে যা ঘটেছে সাহিত্যেও তাই ঘটছে। প্রসঙ্গত এখানে অর্থনৈতিক কর্মের কথাটাই বলতে হল। “সামান্য কারণে একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। গ্রামের কামার অনিরুদ্ধ কর্মকার এবং ছুতার গিরীশ সূত্রধর নদীর ওপারে বাজারে—সহরটায় গিয়ে একটা করিয়া দোকান ফাঁদিয়াছে।”

কৃষিসমাজের একটি অপরিহার্য শ্রম এই দুইটি জীবের ওপর নির্ভরশীল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যে-কৃষিকর্ম হয় তার অধিকাংশই পল্লীর শ্রমজীবী শ্রেণীর ওপর নির্ভর করে। চাষের মরশুমে এরা লাঙ্গলের ফলা তৈরী করে দেয় এবং কাস্তে কুড়ুল যা কিছু গেরস্থের গৃহাশ্রমের প্রয়োজনে লাগে তাও এরা করে দেয়। শ্রেণী হিসেবে কামারশ্রেণী কৃষিকাজ করার সঙ্গে বিশেষভাবে সংপৃক্ত, এই অর্থনৈতিক কর্মের জন্য সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায়

'চাকরান' জমির ব্যবস্থা আছে। এদিকে জাগতিক শিল্পসভ্যতা প্রসার লাভ করার ফলে বাজারের উঠ্তি-পড়্তি শুরু হয়েছে, তার পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া অনিরুদ্ধকেও রেহাই দেয়নি, ফলে অনিরুদ্ধের প্রচলিত জীবনযাত্রায় ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় বিরোধ বেঁধেছে। পরিবারের আয় ঘাটতিহেতু যে অভাব তা অনিরুদ্ধের পরিবারেও দেখা দিয়েছে। অনিরুদ্ধের মন নোতুন-পথে মোড় ফিরছে। আয়ের সন্ধানে, চিরাভ্যস্ত মামুলি শ্রম ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করে বাজারে-সহরে একটা দোকান ফেঁদেছে। এখন দেখতে হবে তার শ্রেণী-চেতনা কোন সূত্র থেকে সৃষ্টি হবার সুযোগ পাচ্ছে। কোন কেন্দ্র থেকে জীবনবঞ্চনার ঢেউটি এসে তাকে অস্থির করে তুলেছে। শিল্পসভ্যতার অনিবার্য আঘাতের ফলে যে সব জীবন সর্বপ্রথম বিপর্যস্ত হয় তারা হল গ্রাম শ্রম-জীবী—কামার, কুমোর, ধোবা, নাপিত, ছুতোর, মুচি, ডোম। হিন্দু সমাজের বারোমাসের তের পার্বণে এরা শ্রমদান করে থাকে। বিনিময় ঐ 'চাকরান' জমি। বাঙ্গালার ভূমিব্যবস্থায় শ্রমজীবীদের প্রচলিত শ্রমধারার বিনিময় ঐ ভূমিস্বত্ব ভোগের ব্যবস্থা এককালে ছিল। তথাকথিত উচ্চবর্ণের শ্রেণীরা এদের শ্রম নিয়ে নগদ বিদায় না করে সম্পত্তি দিয়ে 'খোরপোষের' ব্যবস্থা করত। সামাজিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এই যে অর্থনৈতিক শোষণ—এটা গ্রাম শ্রমজীবীদের একটা বিশেষ পর্যায় অবধি গা-সহা হয়ে গিয়েছিল। এই 'চাকরান' ভূমিব্যবস্থার অন্তরালে অতি সূক্ষ্মভাবে যে একটি শোষণের কাজ চলছে—তা এরা (শ্রমজীবী সমাজ) অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আঘাতটা না পাওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারেনি। এ বিশ্বের ছিরু-পালেদের ঐশ্বর্য বিলাসের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্ভব। কিন্তু অনিরুদ্ধ কামার, গিরীশ ছুতোর, পাতু মুচির সম্পদ বৃদ্ধি ত দূরের কথা

বরং ক্রমহ্রাস প্রাপ্তিরই ব্যবস্থা হচ্ছে। গ্রাম্য মজলিসের সম্পন্ন চাষীরা এই শ্রমজীবীদের চেপে ধরছে কেন তারা গ্রামে কাজ না-করে সহরে-বাজারে দোকান খুলেছে বা সেখান থেকে অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করছে। এখানে সেই নির্মম শোষণের চিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। "ছিরে' বা শ্রীহরি গর্জিয়া উঠিল"............ জান, জমিতে জল থাকতে ফাল পাঁজানোর অভাবে চাষ বন্ধ রাখতে হয়েছে? তোমারও জমি আছে, জমির মাথায়-মাথায় একবার ঘুরে দেখে এস দেখি, 'পটপাটির' ঘাসের ধুমটা। ফালের অভাবে—চাষের সময় একটা পটপাটির শেকড় ওঠে নাই। বছর-সাল তোমরা ধানের সময় ধানের জন্যে বস্তা হাতে করে এসে দাঁড়াবে। আর কাজের সময়ে তখন সহরে গিয়ে বসে থাকবে—তা বললে হবে কেন?" ছিরুপালের ওই স্পর্ধিত মন্তব্যের পর মজলিসের সবাই মায় 'গণদেবতার' নায়ক দেবু ঘোষ—সেও সায় দিল।

"এবার আমাদের (শ্রমজীবী শ্রেণীদের) কথা শুনুন", অনিরুদ্ধর 'আমাদের' শব্দটি প্রয়োগ এখানে প্রণিধানযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই শব্দটির অভ্যন্তরে একটি শ্রেণীভিত্তিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। একই ধরনের দুঃখভোগ হেতু সে (অনিরুদ্ধ) আপাতত গিরীশকে কাছে পেয়েছে। অনিরুদ্ধ ......বলিল, "আপনাদের ফাল পাঁজিয়ে দিই, হাল লাগিয়ে দিই চাকায়, কাস্তে গ'ড়ে দিই—পাঁজিয়ে দিই, আপনারা আমাকে ধান দেন হাল-পিছু পাঁচশলি ধান। আমাদের গিরীশ সূত্রধর.......

আজ্ঞে—হ্যাঁ। আমি, মানে কর্মকারের হাল-পিছু পাঁচ শলি, আর সূত্রধরের হাল-পিছু চার শলি করে ধান বরাদ্দ আছে। আমরা কাজও করে এসেছি, কিন্তু চৌধুরী মশায়—ধান আমরা হিসেব মত পাই না।

পাওনা ?

আজ্ঞে না।

গিরীশও সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল "আজ্ঞে না। প্রায় ঘরেই দু'আড়ি চার আড়ি ক'রে বাকী রাখে—বলে দুদিন পরে দোব—কি আসছে বছর দোব—তারপর আর সে ধান আমরা পাই না।"

শোষণের এই চিত্রের পর শ্রমজীবীদের মনের কথাটা শুনুন। "আজ্ঞে আমাদিগে মাপ করুন আপনারা। আমরা আর পারছি না।"

গ্রাম্য শ্রমজীবীদের শ্রমটি উপযুক্তভাবে চাষের মরশুমে প্রয়োগ না-করার ফলে কৃষিউৎপাদন ব্যবস্থায় সঙ্কট দেখা দিয়েছে। তারাশঙ্কর কিন্তু এই সঙ্কটকে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখেননি, বা দ্বন্দ্বকে ভিত্তি করে গোটা উপন্যাসকে গড়ে তোলেন নি। অথবা শ্রেণীবিরোধ উপন্যাসের উপজীব্য হয়েও দেখা দেয়নি। অথচ উপন্যাসের শুরুই হল অর্থনৈতিক কর্মেকে কেন্দ্র করে। যে-শ্রেণীটি এই 'গণদেবতা'য়—মুখ্যভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে সেই শ্রেণীটি সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার সংলগ্ন নিপীড়িত শ্রেণী। ভারতবর্ষে কলকারখানা স্থাপিত হবার পর—শিল্পের উৎপাদন উপযোগী কাঁচামলের বাজার সৃষ্টি হয়। এর পর ধানচালের দর তেমন আর জোরদার হয় না। কেননা cash crop-এর যুগ আসে। পাটচাষী, চা-শ্রমিকরা, বা কয়লা উৎপাদনকারী শ্রমিকরা যে পরিমাণ কাঁচা পয়সা চোখে দেখতে পেতো বা ব্যবহারের সুযোগ পেতো একজন বংশানুক্রমিক পেশাদার শ্রমিক তা পেতো না। অথচ বাজার 'আক্রা' হবার জন্য তাকে দুর্ভোগ ভোগ করতে হত। এই জাতীয় বংশানুক্রমিক পেশাদার শ্রমজীবীদের জীবনে তাই ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধির কোন সুযোগ ছিল না। অস্থিরচিত্ত প্রকৃতি-রাণীর দানটাও তেমন সুপ্রতুল ছিল না।—তার অর্থ দুচার বিঘে জমিজমার চাষবাসের কোন মূল্যই ছিল না। কেননা 'সুকো' আর

'বান' কোন্ বছর কি ভাবে আসবে তা তারা (গ্রামের পেশাদার শ্রমজীবীরা) জানত না। তার ফলে ছোটখাট জোত-জমা পরিবারের অর্থনীতি সব সময়ই তীব্র সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলত। এই অর্থনৈতিক সঙ্কট মুক্তির জন্য কামার, ছুতোর, মুচি—এরা শ্রেণী হিসেবেই কিছু কাঁচা পয়সার কাজ করত। যে-সব শিল্পের সঙ্গে বহির্বাণিজ্যের যোগাযোগ ছিল সে-সব শিল্পের শ্রমিকরা ক্রেতা হিসেবে বাজারে যে টাকা-পয়সা লেনদেন করতে পারত ঠিক সেই জাতীয় টাকা-পয়সার লেনদেন একজন গ্রামের বংশানুক্রমিক পেশাদার শ্রমিকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অথচ এদের জীবনের দুঃখজনক পরিস্থিতি হল এরা বাজারে ক্রেতা হিসেবে সবার পিছে। বাজারে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বেড়ে যায়, এবং এরা বাধ্য হয়ে সেই বস্তু কিনে আনে। কিন্তু আয়ের সঙ্গতির সঙ্গে সমতা রক্ষা করে এইসব পরিবারের অর্থনীতি কিছুতেই চলতে পারে না। কাজেই পারিবারিক ও সামাজিক জীবন অতীব দুঃখবহুল। অনিরুদ্ধ কামার, গিরীশ ছুতোর, পাতু মুচি এরা কেউই পারিবারিক জীবনে আয়-ব্যয়ের সমতা আনতে পারে না। এই অনির্দিষ্ট অবস্থার জন্যই এরা শ্রেণী হিসেবে ভারী ভীরু হয়ে পড়ে। এদের অর্থনৈতিক জীবনের বনিয়াদ হল বছরভোর শ্রমদান করা, আর তার বিনিময়ে কিছু জমিজমা ভোগ করা। কিন্তু বাজারে নিত্য-ব্যবহার্য বস্তুর দর ওঠানামা ফলে এই শ্রেণীটির অর্থনৈতিক জীবন একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে। কালক্রমে এই গ্রাম্যশ্রমজীবী শ্রেণীটি সমাজের ভগ্নাংশের মত কাজ করে। তারাশঙ্কর এই ভগ্নাংশের জীবনকে চিত্রিত করতে গিয়েছেন। এইসব চিত্রের অন্তিম লক্ষ্য স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গড়ে ওঠে। কিন্তু তারাশঙ্কর এর মাঝে বিশেষ ইঙ্গিত আনতে পারেন নি। তিনি 'গণদেবতা'র নায়ক দেবু ঘোষকে একটি সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীক

হিসেবে চিত্রিত করতে পারেননি। অথচ দেবু প্রতিবাদ করেছে। অবস্থার পাকে-চক্রে অনন্য উপায় হয়ে প্রতিবাদ করেছে, এবং প্রতিবাদের ফলে শাস্তি ভোগও করেছে। প্রতিরোধ অর্থাৎ সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন করেনি। প্রতিবাদের শ্রেণীচেতনা একরূপ আর সক্রিয় প্রতিরোধের শ্রেণীচেতনা অন্যরূপ।

সাহিত্যে এই জাতীয় শ্রেণীচেতনায় উচ্চবিত্তের কোন ক্ষতি হয়নি। অথবা তারা আতঙ্কিত হয়েছে সাহিত্যের মধ্যে তা প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেনি। গ্রামে কলেরা লাগল, শহর থেকে ডাক্তার গেল কলেরা রোগীকে পরিচর্যা করতে। 'ধাত্রী দেবতা'য় এরকম ডাক্তারের মহৎ চরিত্র আছে। আবার জমিদার-নন্দন আরো মহত্তর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন নিজে সেবার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে। এইসব 'মহৎ' চরিত্র শোষণের ক্ষেত্রে কত মহৎ তা বাঙ্গালার জমিদারী সৃষ্টির ধারাবাহিক ইতিহাস পাঠ করলে বুঝতে পারা যায়। জমিদারের মহত্ব সৃষ্টি করতে কতগুলি সমাজ-কর্ম সাহিত্যে স্থান পেয়েছে, যেমন ধর্মমন্দির প্রতিষ্ঠা, স্কুল প্রতিষ্ঠা, পুকুর কাটানো, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা। ব্রিটিশযুগের সাহিত্যে প্রতিষ্ঠার এমন পরিচয় মেলে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠার অন্তরালে প্রজার খাজনার সঙ্গে **'ঈশ্বর বৃত্তি'** আদায়ের ইতিহাস গোপন রয়েছে। তা বড় একটা জানা যায় না। তারাশঙ্করের 'গণদেবতা'য় প্রথম এই জাতীয় 'ঈশ্বর বৃত্তি'র উল্লেখ পাওয়া যায়।

"বাবুরা (জমিদারেরা) হালে ঈশ্বর বৃত্তির প্রচলন করিয়াছেন টাকায় এক পয়সা ; টাকা দিতে গেলেও দিতে হইবে—টাকা পাইতে গেলেও দিতে হইবে। ঐ টাকায় পার্বণ উপলক্ষে যাত্রা থিয়েটার হয়।" বাঙ্গালাদেশের জমিদারদের যত 'মহৎ' কাজ এযাবৎ সৃষ্টি হয়েছে তার প্রায় সবটার পেছনে এমনি করে জুলুমের 'ঈশ্বর বৃত্তি' বরাবরই ছিল। কিন্তু জুলুমের বিরুদ্ধে কোন

শ্রেণীসচেতন অর্থনৈতিক আন্দোলন বড় একটা গড়ে ওঠেনি। এটা গেল পশ্চিমবাঙ্গালার কথা।

পূর্ব বাঙ্গালার ভূমিব্যবস্থা যা-হোক না-কেন শোষণের ক্ষেত্রে উভয় বঙ্গে কোন মৌলিক প্রভেদ নেই। পূর্ব বাঙ্গালার উন্নত নদীর পলিতে যে সব নতুন নতুন চর সৃষ্টি হয়েছে সেখানে যে দুর্ধর্ষ হিন্দু-মুসলমান জনসমাজ গড়ে উঠেছে তারাও জমিদারের বিশেষ ধরনের শোষণ থেকে মুক্ত নয়। সে অঞ্চলের শোষণের ধারা একটু বিভিন্নতা লাভ করেছে মাত্র। বাঙ্গালা সাহিত্যে তার বড় একটা উল্লেখ নেই। অথবা তেমন কোন নিখুঁত চিত্র বড় একটা পাওয়া যায় না। তা ছাড়া বাঙ্গালা সাহিত্যে পূর্ব বাংলার সমাজচিত্র স্বল্প পরিমাণে ফুটে ওঠার আর একটা বড় কারণ হল, তৎকালীন লেখকগোষ্ঠী সে সামাজিক পারিপার্শ্বিক নিরীক্ষণ করার কোন সুযোগ পান পাননি। গঙ্গার পশ্চিম তীরের যে সমাজ, কলকাতার উচ্চবিত্তের যে সমাজ, তা-ই উপন্যাস-গল্পে বেশির ভাগ স্থান পেয়েছে। কিন্তু জমিদারের প্রজা শোষণের মৌলিক চরিত্র এক। স্থানিক বিভিন্নতা সর্বদেশে যেমন থাকে এ দেশেও তার কোন ব্যতিক্রম নেই। জমিদারের মেলার পত্তন, মেলায় দেশী দেহোপ-জীবীনীদের আকর্ষণ করা, বাজী, জুয়োখেলার সুযোগ করে দেয়া, ঘোড়দৌড়ের প্রবর্তন করা, যাত্রা, কবি, রামায়ণ, রয়াণী (মনসার গীত), জারি গানের ব্যবস্থা করা, এ সবই কিন্তু ধর্মমিশ্রিত শোষণ ব্যবস্থার ফলে সম্ভব হয়েছে। জমিদারের 'পুণ্যাহ'র দিনে খাজনার সঙ্গে 'পুণ্যার' খরচ আদায় হতো। এবং সেই টাকায় যে সব উৎসবের কথা বলেছি তাই পরিচালিত হত। এর কোন আয়ব্যয়ের হিসাব কেউ জানত না বা জমিদারও কোনদিন প্রজাসাধারণকে জানাত না। কালক্রমে ঐ টাকাটা জমিদারের আয়ে পরিণত হয়েছে, যাত্রা বা মেলা বন্ধ হয়েছে—এমন বহু খবর

পূর্ব বাঙ্গালার জমিদারীর ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যাবে। তা ছাড়া ইউরোপে যেমন serfdom ছিল, গোগোলের Dead Soul বইতে যার পরিচয় মেলে, তেমন পরিচয় বাঙ্গালা সাহিত্যে বড় একটা মেলে না। অথচ এ দেশে সামন্ততন্ত্রী পরিবারের পুরুষানুক্রমে কেনা গোলাম ছিল। তারা বংশপরম্পরায় এই জমিদার পরিবারে বা সামন্ত রাজপরিবারে কাজ করে যেতো। জমিদার পরিবারের বিশ্বস্ত 'ভৃত্য' হিসেবে কাজ করত। এমন দৃষ্টান্ত আছে। এদের দৈহিক শক্তি ও লাঠিবাজির ফলে জমিদারের বা তালুকদারের ধন সম্পত্তি রক্ষা হত। একালে রাজনীতিতে যেমন Palace clique বলে একটা কথা প্রচলিত আছে, সেকালেও জমিদার পরিবারের মধ্যে কূট ষড়যন্ত্র চলত এবং মূল কর্তাকে হত্যা করা, বা বিষপানে হত্যা করা—এসব হত। কিন্তু এইসব ষড়যন্ত্রের মধ্যে দেখা যায় সেই 'গোলামেরা' সবচেয়ে বেশি মহত্বের পরিচয় দেয়। এবং তা নিয়ে সাধারণ মানুষ সাহিত্য রচনা করে। পূর্ব-বাঙ্গালার কোন একটি জমিদার পরিবারকে (ভাওয়ালের রাজার মামলা নয়) আশ্রয় করে কিছু লোকসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল, তার খানিকটা এখানে তুলে দিচ্ছি :

"কীর্তিপাশা গ্রামে যে ছিল বাবু রাজকুমার,
ও তার
কীর্তি যত বলব কত বলতে চমৎকার।"

এই বাবু রাজকুমারকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাকে নিয়ে লোকসাহিত্য রচনা করেছিল :

"কান্দে পুষ্প ধাই,
পাছার (আছাড়) খাই,
বাছা রাজকুমার।
কারে দিয়া গেলা তোমার প্রসন্নকুমার ?

এই পুষ্প ধাই হচ্ছে রাজকুমারের 'ধাই মা'। এঁরা পরিবারে অনেকটা মায়ের মতনই সম্মান পেয়ে থাকেন। শোনা যায় এই পুষ্প ধাই-ই রাজকুমারকে ছোটবেলায় প্রতিপালন করেছিল। পুষ্প ধাই যখন গভীর বিলাপ করছে, তখন রাজকুমার বিষের জ্বালায় অস্থির। কেননা যে বিষ প্রয়োগ করে তাকে হত্যা করার ব্যবস্থা হয়েছে, সে বিষের ক্রিয়া তখন পূর্ণবেগে শুরু হয়েছে। রাজকুমার কিন্তু তখন তার উৎকণ্ঠিত চরম অন্তিম মুহূর্তে আর কাউকেই ডাকছেন না। সেই বিশ্বস্ত ভৃত্য চিরজীবন শোষিত যে জন তারই কথা মনে হচ্ছে :

"দারুণ বিষের জ্বালা (দারুণ বিষের জ্বালা) (ধুয়া)
শরীল কালা,
সহিতে না পারি,
এমন কালে কোথায় রইল রাজুয়া ভাণ্ডারী।"

এই 'রাজুয়া ভাণ্ডারী' হল দাস শ্রমিক। দেখা যাচ্ছে আপৎকালে সেই দাস শ্রমিকেরই ডাক পড়ছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এদের মহত্ত্বের কথা তেমন করে কিছু বলা হয় নি। পরিবার বা জমিদারী গঠনে এদের যে একটা বিশেষ দান আছে তা স্বীকৃত হয় নি। কেনা গোলামের মুক্তির ইতিহাস বাঙ্গালা সাহিত্যে একমাত্র অনুবাদ গ্রন্থ 'টমকাকার কুটির'। এই সব সাহিত্যে তথাকথিত 'মানবিকতা' ঠাঁই পেয়েছে। অথচ এই 'মানবিকতা' সমাজ ও শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়। সামাজিক মানুষের মান মর্যাদা সবই নির্ভর করে কে কোন শ্রেণীতে বিরাজ করে তার ওপর। আর শ্রেণী হলেই ধরে নিতে হবে একটি 'income group'—অর্থাৎ উপার্জনকারী গোষ্ঠী অথবা অবসরভোগী শ্রেণী। সে যাই হোক, সামাজিক আচার-আচরণ তাও শ্রেণী নির্ভরশীল। এক-এক শ্রেণীর এক-এক আচরণ। কথাসাহিত্যেএর প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী।

'চরিত্রহীনে'র বেহারী আর 'দেবদাসে'র ধর্মদাস, দাস ও প্রভুত্ব প্রথার অনুরূপ, এই দুইটি চরিত্রের মধ্যে সামাজিক মানবিকতা অনেকখানি স্থান জুড়ে রয়েছে। ফলে দাসত্বের বন্ধনটা তত প্রখর হয়ে ওঠে নি। তা ছাড়া সমাজ সংশ্রব নিগূঢ় বিনিময় বন্ধনে পরিণত হয়েছে। তাই ক্ষেত্রবিশেষে শ্রেণীচেতনা স্বল্প পরিসরের মধ্যে—'সতীশ-বেহারী', অন্যক্ষেত্রে 'দেবদাস-ধর্মদাস' সঠিকভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথের 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' 'পুরাতন ভৃত্য' সামন্ততন্ত্রী সমাজের পারিবারিক জীবনের 'ভৃত্য'নির্ভরশীল সমাজ-সমর্থিত চরিত্র। পরশ্রমভোগী ভৃত্যনির্ভরশীল জীবনযাত্রার চিত্র যতই সাহিত্যে প্রতিফলিত হচ্ছে ততই সাহিত্যের মধ্যে শ্রেণীসমন্বয়ের দর্শনটি পাকাপোক্ত হয়ে বসছে। ফলে বিপ্লবী চেতনা, সর্বহারার ব্যক্তিত্বের বিকাশ হচ্ছে না। এখানে একটি প্রশ্ন, আমরা কি সাহিত্যে এইশ্রেণীসমন্বয়ের পথটি এড়িয়ে চলতে পারি? বুর্জোয়া সাহিত্যের একটি মহান সুযোগ হল এই যে, 'যেমনটি দেখিলাম, তেমনটি লিখিলাম। সাহিত্যে এই জাতীয় চিন্তা, দর্শনবাদের দিক থেকে এক মারাত্মক বিষ-মাখানো দর্শন। ফলে পাঠক শুধু উপরিতল চেতনা লাভ করে ও আনন্দ উপভোগ করে।

সাহিত্যরস আস্বাদনের এই যে মাদকতা, এ সৃষ্টিতে কি প্রাশ্চাত্ত্য সাহিত্য কি আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্য কেউ-ই কম কশুর করে নি। একটা দেশকে শুধু আফিম বিক্রি করে যেমন আফিমখোর করা যায়, সাহিত্যেও এই আপাতমধুর মানবিকতার আশ্রয় নিয়ে পাঠককে মোহগ্রস্ত করে যায়। প্রকৃত চেতনাকে বাদ দিয়ে মায়াবাদ সৃষ্টি করা যায়। সমাজ-শ্রেণীচেতনাকে বৈপ্লবিক স্তরে উন্নীত না করে মাতাল, বেশ্যাসক্ত, পকেটমার, জুয়াচোর চরিত্র সৃষ্টি করা যায়। আর যেটা সবচেয়ে মারাত্মক

চরিত্র সৃষ্টি, সেটা হচ্ছে পৌরুষের নামে নিপীড়িত শ্রেণীর সম্পদ হরণ, নারীভোগ বিলাস। তারাশঙ্কর এইসব চরিত্র নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন, 'গণদেবতা'র ছিরুপালের আদর্শ হল ত্রিপুরা সিংহ। তার পরিচয় এই :

"ত্রিপুরা সিংহের শক্তির কথা সে একেবারে রূপকথার মত ;—ত্রিপুরা সিংহের জমির পাশেই ছিল বহুবল্লভ পালের একখানা আওউল জমি—কাঠা দশেক তাহার পরিমাণ। সিংহ ঐ জমির জন্য একশো টাকা দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বহুবল্লভের দুর্মতি অতিরিক্ত মায়া! সে কিছুতেই দেয় নাই। শেষ বর্ষার সময় একদা রাত্রে সিংহ নিজে একা কোদাল চালাইয়া দুইখানি জমিকে কাটিয়া আকারে প্রকারে এমন এক অখণ্ড বস্তু করিয়া তুলিল যে পরদিন বহুবল্লভ নিজেই ধরিতে পারিল না, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কোথায় কোন-খানে ছিল তাহার জমির সীমানার চারটি কোণ। বহুবল্লভ মামলা করিয়াছিল। কিন্তু বহুবল্লভ তো পরাজিত হইলই—উপরন্তু কয়েকদিন প'র বহুবল্লভের তরুণী-পত্নী ঘাটে জল আনিতে গিয়া আর ফিরিল না। ঘাটের পথে সন্ধ্যার অন্ধকারে কে বা কাহারা তাহার মুখে কাপড় বাঁধিয়া কাঁধে তুলিয়া লইয়া গেল। ...... মেয়েটা এখন বুড়ো হয়েছে, সিংজীর বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে। একটা নয়, এমন মেয়ে সিংজীর বাড়িতে পাঁচ-সাতটা।"

"Social relations are closely bound up with productive forces. In acquiring new productive forces men change their mode of production; and in changing their mode of production, in changing the way of earning their living, they change all their social relation." *

অনিরুদ্ধ, গিরীশ ও পাতু মুচির জীবনে এই প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তারা শ্রমবিনিময়ের মধ্য দিয়ে, অথবা উৎপাদন সমর্থিত সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে যে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল, কালক্রমে তাতে চিড় ধরেছে। দুটো কারণে: প্রথম ও প্রাথমিক কারণ হল উৎপাদন সমর্থিত সম্বন্ধে বাইরের শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় চিড় খেয়েছে; দ্বিতীয় কারণ হল সমাজের উচ্চ শ্রেণী-ই পাতু মুচির উৎপাদন সমর্থিত সম্পর্কের লুব্ধ বিরুদ্ধবাদী হয়ে কাজ করছে। অনিরুদ্ধর সমাজ-অর্থনৈতিক জীবনে কোন্ শক্তি সবচেয়ে বেশী আঘাত হেনেছে তার বিশ্লেষণ প্রথমে করা যাক।

"আমরা চাষের সময় কাজ করতাম লাঙলের-গাড়ীর—অন্য সময় গাঁয়ের ঘর-দোর হ'ত—আমরা পেরেক-গজাল গড়ে দিতাম—বঁটি কোদাল-কুড়ুল গড়তাম। গাঁয়ের লোকে কিনত। এখন গাঁয়ের লোক সে সব কিনছেন বাজার থেকে। সস্তা পাচ্ছেন—কিনছেন।" তা হলে দেখা যাচ্ছে অনিরুদ্ধ শ্রমজীবন একদিন সম্পূর্ণই গাঁয়ের ক্রেতাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। সে বৃহত্তর বাজারের বা

* Chap. II (Second Observation) p. 86 People's Library—2 The Poverty of Philosophy : Karl Marx.

তার প্রতিযোগিতার কথা ভাবত না। অথবা ভাববার মত সমাজ-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন আসেনি। কিন্তু যেদিন পরিবর্তন এলো সেদিন অনিরুদ্ধর জীবনকে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে, খানিকটা তার মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে এলো। তার মন এই পরিবর্তনের জন্য কখনই প্রস্তুত ছিল না। অথবা যে শক্তি তাকে আক্রমণ করছে তার সম্বন্ধে অনিরুদ্ধর সচেতনতা ছিল না। একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে এই অ-সচেতন অবস্থায় প্রায় সব পল্লীর শ্রমজীবীদেরই কাটাতে হয়েছে। হঠাৎ শহুরে বাজার থেকে কোন নতুন ধরনের নিত্যব্যবহার্য বস্তু এলে তারা প্রথমে বিস্ময় বোধ করত। নতুন সৃষ্ট বস্তুর কলাকৌশল সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম না করতে পারা পর্যন্ত খানিকটা ভয়মিশ্রিত মানসিক অবস্থায় সময় কাটাত। এই কালপ্রবাহের মধ্যে কোন-কোন শ্রমিক কর্মী নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারত। কোন-কোন শ্রমিক কর্মী সেটা পারত না বলেই সে নিজস্ব পদ্ধতিতে আয়ের পথ রুদ্ধ দেখতে পেত। তখন ভয়াবহ অবস্থান্তর দেখে সে অন্য পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হত। প্রসঙ্গত একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে যে, বাঙ্গালা দেশের অনেক গ্রামে বাজারে ওস্তাদ কর্মকার ছিল যাদের দ্বারা বন্দুক সারাই-কার্য সম্ভব হত। বন্দুক ইত্যাদি উৎপাদন কার্যে মুখ্যত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ভূমিকা প্রধান। কিন্তু এমন একটা সময় ছিল যখন বাঙ্গালার গ্রামে অনেক লোহা ঢালাইয়ের কাজ হত। বীরভূম অঞ্চলে এমন দেশী প্রথায় লোহা ঢালাইয়ের কাজ হত বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়। আজ অবিশ্যি বৃহৎ বৈজ্ঞানিক লোহা ঢালাইয়ের কারখানার যুগে এদের কোন মূল্য নেই এবং থাকা সম্ভবও নয়, কিন্তু পল্লী শ্রমজীবীদের—যাদের মধ্যে অনিরুদ্ধকেও ধরতে হবে—সামগ্রিক ইতিহাসে এদের দানকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

সেকালে ভাল সুতীক্ষ্ণ সড়কি, বল্লম, তলোয়ার, টাঙ্গী, রামদাও এদের হাতুড়ির তলায় বিভিন্ন গড়নকে আশ্রয় করে রূপ নিত। এটা আমাদের ভাবতে অসুবিধা নেই যে, এই শ্রমজীবী শ্রেণী সেকালের সামন্ত রাজাদের দ্বারা প্রতিপালিত হত। অর্থাৎ এদেরকে সমাজ সমর্থিত শোষণ প্রথায় বেশী খাটিয়ে কম 'পয়সা' দেবার ব্যবস্থা ছিল। এখানে 'পয়সাটা' স্থাবর জমি অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ভূমিদান এবং তার পরিবর্তে বংশপরম্পরায় অনিয়ন্ত্রিত অনির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমকে কিনে রাখা—এই-ই ছিল সেকালের রেওয়াজ। এই রেওয়াজকে ভেঙ্গেচুরে একটা নতুন রূপ দেয় শিল্পবিপ্লব। শিল্পবিপ্লব মানুষ শ্রমকে মুক্ত অঙ্গনে এনে দিয়ে দরকষাকষির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। পল্লীতে লোহা পিটিয়ে তার পরিবর্তে পর্যাপ্ত-না-হোক অন্তত মোটামুটি ভরণপোষণের ব্যবস্থা অনিরুদ্ধের হল না বলেই সে জংশন ষ্টেশনে নতুন শ্রমবিনিয়ম সম্বন্ধ স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে পথে বাধাস্বরূপ দাঁড়াল চণ্ডীমণ্ডপের সমাজ। বাধা দিয়ে আটকাতে পারে নি অনিরুদ্ধকে। সে স্বার্থান্বেষী সমাজ-কর্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। চণ্ডীমণ্ডপের বিচারের দিনে নিজের নবজাগ্রত ব্যক্তিত্ব নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে গিরীশ ছুতোর ছিল। সে-ও সমধর্মী, সমভাবেই শোষিত হয়েছে। এই দুই চেতনশীল শ্রমজীবীর মিলন, অপূর্ব মানসিক তেজ, চণ্ডীমণ্ডপের সমাজকর্তাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। তারাশঙ্করের এই বিদ্রোহের চিত্রটি অপূর্ব। কিন্তু শক্তির আধারে বৈপ্লবিক স্পৃহা সজাগ না থাকায় অন্যদিক থেকে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। তবু অনিরুদ্ধ ও গিরীশকে সমাজ শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার কৃতিত্ব দিতেই হবে। যে-মানুষ তথাকথিত শিক্ষিত নয়, যে বিপ্লব বা বিদ্রোহের কোন দীক্ষা লাভ করেনি, সে-মানুষ অম্লান বদনে সত্যের তেজে তেজীয়ান হয়ে উঠল;

জীর্ণ পঙ্গু অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাই তাকে এই রুখে দাঁড়াবার প্রেরণা জুগিয়েছে। জংশন ষ্টেশনে নব্যধরনের শ্রমপ্রথা মুক্তির স্বাদ এনে দিয়েছে।

যে-যুগে শ্রমবিনিময়ের পরিবর্তে স্থাবর সম্পত্তি সামাজিক নিরাপত্তার ছিল কাম্য বস্তু, সে-যুগে শ্রেণীবোধটাও ছিল ভিন্ন ধরনের। স্থাবর সম্পত্তির ওপর একমাত্র নির্ভরশীল হওয়ার জন্য স্বত্বভোগী শ্রেণীর মনোবৃত্তির মধ্যে একটা সুনিশ্চিত ভাব জন্ম নিয়েছিল। এই সুনিশ্চত ভাববোধের মধ্যে কৃতজ্ঞতার ফোটাটা খুব উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করত। জীবনযাত্রা অনেকটা যান্ত্রিক প্রথায় প্রচলিত বাধা পথে চলত। তাই সমাজ-জীবনে একই ঘটনা বার বার ফিরে আসত, ধর্মোৎসব, বিবাহ, পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ, ইত্যাদি। উৎপাদন-যন্ত্রের নব্যআবিষ্কার ও তার ব্যবসায়িক ব্যবহার বৃহত্তর সমাজকে যেদিন স্পর্শ করে সেদিন সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রমজীবীদের মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করে। কেননা, যে-পণ্য দ্রব্য হাটে-বাজারে এলো তার প্রাথমিক উৎপাদন-প্রথা এদেরই হাতে গড়ে উঠেছিল। বাজারে মুচির জুতো আর কলে তৈরী জুতো দুই বিভিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দিল। ক্রেতার মন হরণ করতে কলের জুতোই টেক্কা মেরে দিল। অতএব মুচির মনে হতাশা আর স্থায়ীত্ববিহীনতা প্রকট হয়ে উঠল। একই লোহার বস্তু যখন বাজারে কলাই-করা থালা হয়ে এলো তখন 'কাঁসাড়ী' সমাজের শ্রমিকসম্প্রদায়ের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হল। কাজেই নতুন ধরনের শ্রেণীবোধ এদের মধ্যে জন্ম নিল। এই অবস্থাটাকে পেশা পরিবর্তনের একটা বৈপ্লবিক ঘটনা বলা যেতে পারে। এই পরিবর্তনের ফলে সমাজে শ্রমজীবীদের মধ্যে যে হতাশা তা প্রথমে self-abnegation-এর মধ্য দিয়ে দেখা দেয়। সেই জন্যই পল্লী শ্রমজীবীদের মধ্যে নিজেদের কর্মের ওপর আস্থাবিহীনতা, মনে

হতাশা ও নিরাপত্তা বোধের অভাব দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু হতাশাবোধ, আস্থাবিহীনতা সমাজ-পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে বিপরীতগামী হতে থাকে। যেমন অনিরুদ্ধর ক্ষেত্রে হয়েছে। অনিরুদ্ধ একদিন স্থির করল শহরে বাজারে গিয়ে পয়সা রোজগার করতে হবে। এই বিপরীতগামী চিন্তা ও কর্ম সমাজের মধ্যে কী পরিমাণ ক্ষুব্ধ চেতনা সৃষ্টি করেছে এবং সমাজে কোন্-কোন্ শ্রেণীর স্বার্থের আঘাত পড়েছে তার কিছু-কিছু ইঙ্গিত সামাজিক দ্বন্দ্বের মধ্যে আছে। তারাশঙ্কর সে দ্বন্দ্বকে চমৎকার করে ফুটিয়ে তুলেছেন। সাহিত্যে নতুন চিত্র এনেছেন কিন্তু সুর সম্পূর্ণ অস্ফুট, এই সুরের জন্যই তারাশঙ্করের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী ফুটে ওঠেনি। কেন? কি কারণে অন্যরূপ নিয়েছে সে প্রশ্ন সবার মনেই জাগবে।

বর্তমানে পাতু মুচির বৈপ্লবিক মানসিক পরিবর্তনের কারণটা কি? আমরা বলছি, সমাজের উচ্চশ্রেণীই পাতু মুচির উৎপাদন সমর্থিত সম্পর্কের মধ্যে বিরুদ্ধবাদী হয়ে কাজ করেছে। আচ্ছা এবার দেখা যাক, বিরুদ্ধতার সূচাগ্রভাগ কোন শ্রেণী থেকে আসছে। যার ফলে পাতু মুচির এক বিরাট মানসিক পরিবর্তন ঘটল। কিন্তু পাতু নিজে অনিরুদ্ধর মত সাহসী নয় তাই পড়ে-পড়ে মার খায়। পাতুর ঘর পুড়ে সাফ্ হয়ে গেল। কাজেই এখন নতুন শ্রম করে ঘর বাঁধবার সমস্যা বড় হয়ে উঠেছে। এদের সমাজ-অর্থনৈতিক জীবনের বনিয়াদ ভারি চমৎকার। এ পাড়ার অর্থাৎ হরিজন পাড়ার প্রায় সবাই চাষীদের অধীনে দিনমজুরের কাজ করে। বৎসরের বেতন বাঁধা। উৎপন্ন ভাগের চুক্তিতে ওরা কাজ করে। কোথায় বা পেটভাতায় অথবা মাসে ভাতের হিসেব মত ধান। পুরো জোয়ানেরা উৎপন্নের এ তৃতীয়াংশ পাবে এই চুক্তিতে কাজ করে। মনিব সমস্ত চাষের মরশুমটা এদের ধান দিয়ে সংসার চালায়, ফসল উঠলে সুদ সমেত সে ধান কেটে নেয়। সুদের হার

শতকরা পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকা। অজন্মার বছরে এই ঋণ শোধ না হলে সুদ-আসল এক করে তার ওপর সুদ টানা হয়। এ প্রথার মধ্যে কোথায় কোন অন্যায় কিছু আছে বলে এরা (হরিজনরা) বোধ করে না। বরং কৃতজ্ঞ চিত্তে সবই মেনে নেয়। এখানে পাতুর চরিত্র ও তার মানসিকতা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। তার সচেতন মনে সবই আছে, সবই বুঝতে পারছে তবু যেন নিঃসহায় ভাব কাটছে না।

> "সে (পাতু) জাতিতে বায়েন বা বাদ্যকর অর্থাৎ মুচি। তাহার কিছু চাকরান জমি আছে; গ্রামের সরকারী শিবতলা, কালীতলা এবং পাশের চণ্ডীতলায় নিত্য ঢাক বাজায়; সেই হেতু দেবোত্তর সম্পত্তির কিছু ধান সে পিতামহের আমল হইতে পাইয়া থাকে। নিজের দুইটা বলদ আছে—সেই হালে কঙ্কণার ভদ্রলোকের কিছু জমি ভাগে চাষ করে। এছাড়া ভাগাড়ের মরা গরু-মহিষের চামড়া ছাড়াইয়া পূর্বে সে চামড়া-ব্যবসায়ী সেখদের বিক্রয় করিত। আপদে-বিপদে তাহারাই দু'চারি টাকা দাদন-স্বরূপ দিত। কিন্তু সম্প্রতি জমিদার ভাগাড় বন্দোবস্ত করায় এ আয় তাহার কমিয়া গিয়াছে। নেহাৎ পারিশ্রমিক অর্থাৎ—তিন-চার আনা মজুরি ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। এই লইয়া চামড়াওয়ালার সঙ্গে মতান্তরও হইয়াছে। সে কি আর এ সময় সাহায্য করিবে? যে ভদ্রলোকের জমি ভাগে চাষ করে সে কিছু দিলেও দিতে পারে, কিন্তু ভদ্রলোক খত না লেখাইয়া কিছু দিবে না*** খতকে পাতুর বড় ভয়। শেষ পর্য্যন্ত নালিশ বাড়ীটি লইয়া বসিলে—সে কোথায় যাইবে?"

পাতুর ঘর পুড়ে যাবার পর যে সব চিন্তা মনে জগদ্দল

পাথরের মত চেপে বসেছিল সে হল ঃ এখন কি উপায় ? সম্ভাব্য সবরকম অর্থ প্রাপ্তির স্থান মনে-মনে সন্ধান করার পর সে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়ল। পাতুর চিন্তাধারা থেকে একটা বিষয় বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে একটা সামাজিক মানুষ সবদিক থেকে বিপন্ন শোষিত ও নিরাপত্তাবিহীন; সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয় হল 'ভাগাড়'। এদের মুচি সম্প্রদায়ের জাত ব্যবসা হিসেবে কাঁচা চামড়ার কারবার। অর্থাৎ চামড়ার ব্যবহার করে শহরের কলের মালিকরা। দালাল হিসেবে সেখরা ব্যবসায়ী—কিন্তু ভাগাড়ের মালিক হিসেবে যিনি আছেন তিনি হলেন স্বয়ং জমিদার। পাতুর চিন্তা থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে 'ভাগাড়' নামক যে স্থানটির পাতু মালিক না হলেও সেখানে বস্তু হিসেবে যা পড়ত তাতে পাতুরই একটা ভাগ ছিল। পাতুর সংসার পরিচালন ব্যবস্থায় এই সূত্র থেকে আয়টা বাঁচবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সদাশয় জমিদারের আরও জমি আছে, আমরা জানি তার আরও বহু সম্পত্তি আছে। কিন্তু অনন্ত ক্ষুধার জ্বালা এই জমিদারবাবুর, ভাগাড়ের ওপর দৃষ্টি পড়েছে। আমরা যতদূর জানি এই ভাগাড় জাতীয় সম্পত্তিগুলি সাধারণত যারা ভাগাড় মুক্ত করে তাদেরি ভরণপোষণকার্যে ব্যবহৃত হয়। জমিদার হিসেবে কাউকে নতুন করে সেই সম্পত্তি বন্দোবস্ত দেয়ার মানেই হল শোষণের একটি নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। অতএব পাতুর পৃথিবীতে বাঁচাবার মত খড়কুটোও থাকল না, ঘর পুড়ল, ছাই কুড়ল, স্ত্রীকে অকথ্য গালাগালি করে ধরে ধরে অন্তরের জ্বালা জুড়বার চেষ্টা করল। অকর্মণ্য জগন ডাক্তারের পরহিতৈষণাবৃত্তিতেও সে সায় দিল না। এমন কি দস্তখত করে সাহায্য ভিক্ষার দিকেও মন গেল না। তার মনের চিত্রটা এই ভাবে ফুটে উঠল।

"সতীশ বলিল—পাতু, আজ্ঞে আসবে না, সে মশাই গাঁয়েই থাকবে না ব'লছে।

—গাঁয়েই থাকবে না ? কেন, এত রাগ কেন রে ?

—সে মশাই সে-ই জানে। সে আপনার উপায়ে জংসনে গিয়ে থাকবে। বলে যেখানে খাটব সেইখানে ভাত।

—দেবোত্তরের জমি ভোগ করে যে।

—জমি ছেড়ে দেবে মশাই। বলে ওতে পেটই ভরে না তা উনিয়ে কি হবে ****।"

এরপর পাতুর মানসিক চিত্র আরো মূর্ত হয়ে ওঠে দুর্গার সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে।

"সত্যিই তুই উঠে যাবি নাকি ? হ্যাঁ দাদা ? ভিটে ছেড়ে উঠে যাবি ?

পাতু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল—"তাতেই আবার এই অবেলাতে তালপাতা কেটে আনলাম, দুগগা ! নইলে জংসনের কলে কাজ—ঘর সব ঠিক করে এসেছিলাম দুপুর বেলাতে।"

দু'হাত ছাঁদাছাদি করিয়া তাহারই মধ্যে মাথা গুঁজিয়া পাতু মাটির দিক চাহিয়া রহিল।"

এই বিষাদক্লিষ্ট মনের কাছে সান্ত্বনার বাণী এলো দুর্গার কাছ থেকে।

"পিতি-পুরুষের ভিটে ছেড়ে কেউ কখন যায় নাকি ?***।"

পাতুর মনের সমগ্র চিন্তাধারাটা কিন্তু শুরু হয় সেই দেবোত্তর সম্পত্তি ও ভাগাড় নিয়ে। এই ভাগাড় এবং দেবোত্তর সম্পত্তি সঙ্গে যে উৎপাদন সমর্থিত জীবন সংশ্লিষ্ট ছিল তাইতে সে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করেছিল। কিন্তু এই দুটি মৌলিক উৎসের ধারা যখন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তখন জীবন—মানে সমাজ জীবন—তার কাছে অর্থহীন প্রহেলিকার মত মনে হল। মায়ের সঙ্গে বিরোধ, স্ত্রীর সঙ্গে বিরোধ,

অত্যাচারী ছিরুপালের দৈহিক উৎপীড়ন, পাতুর মুচির আর্থিক দৈন্য ক্লিষ্ট চেতনাকে কণ্টকিত করেছে। তাই অভ্যস্ত সমাজ-জীবন, তার উৎপীড়ন ভোগ, আয়ের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র সবই যেন পঙ্ককুণ্ড বলে মনে হয়েছে পাতুর কাছে। সচার-আচার হরিজনদের জীবনের কোন বৈচিত্র্য নেই, খাট খাও, সন্তান উৎপাদন কর, মদ খাও তাতেও কেউ আপত্তি করবে না। প্রয়োজনে অবৈধ যৌনসংযোগ যদি হয় তা নিয়েও বড় একটা কেউ মাথা ঘামায় না। তবে উচ্চবিত্ত সমাজের-প্রভাব থেকে এরা একেবারে মুক্ত নয়। পাতু রোজ দুর্গার কাহিনী শোনে যে সে জমিদারের কাছে গেছে। আরও দশজনে জেনেছে, এই জানাটায় হরিজন সমাজের আপত্তি। এই আপত্তিটা কিন্তু উচ্চবিত্ত সমাজ থেকে ধার করা নয়, মৌলিক মর্যাদা বোধ থেকে এসেছে। এই সমাজের সহজ স্বাধীন জীবনযাত্রাকে উচ্চবিত্তেরাই কলুষিত করেছে, আবার শালিনতার অভাব বলে উচ্চবিত্তেরাই এদের ঘৃণা করেছে। এই ঘৃণা থেকে এই সমাজের মধ্যে একটা আক্রোশজাত চেতনা সৃষ্টি হয়েছে, এবং অবচেতন মনে উচ্চ-বিত্তের অনুকরণের জন্য আগ্রহ বেড়েছে। যে ধরণের সামাজিক অনুশাসন উচ্চবিত্তেরা যখন-তখন স্বার্থের বশে সমাজের উপর প্রয়োগ করে ঠিক সেই অনুকরণে হরিজন সমাজেও অনুশাসন প্রবর্ত্তিত হয়েছে।

"স্বজাতিরা কথাটা লইয়া ঘোট পাকাইয়া তাহাকে (পাতুকে) প্রশ্ন করিয়াছিল—তুমিও আপন মুখেই বলেছ হে ; চৌধুরী মশায়ের কাছে বলেছ, জমিদারের কাছারিতে বলেছ। ব'লেছ কি না ?

—হ্যাঁ বলেছি।

—তবে ? তুমি পতিত হবে না কেনে, তা বল ?"

হরিজন সমাজে পতিত করার চেষ্টাও সাধারণত দল বেঁধে হয়। কেননা, ওদের মধ্যেও যারা একটু অর্থবান অথবা দল বাঁধবার মত

গায়গতরে শক্তি রাখে মোটামুটি তারই নেতৃত্ব করে। তবে বংশ মর্যাদার অভিমান যেমন উচ্চবিত্তের আছে ওদেরও তেমনি আছে। কিন্তু সামাজিক জীবন যাত্রার দুঃখজনক দিকটি হল এই যে, উচ্চবিত্তেরা এদের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ জীবন যাত্রার সুযোগ গ্রহণ করে, এরাও পাকেচক্রে শিকার হয়ে পড়ে।

সমাজের নীচুতালার মানুষের চেতনা যে-কোন দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়লেই উৎস মুখটি খুলে যায়, কিন্তু তাকে রুখে দেয় সজ্ঞানী শ্রেণীস্বার্থবাদীরা। বাঙ্গালা সাহিত্যে আর্টের নামে কতকগুলো চরম সত্যকে বারবারই গোপন করে রাখা হয়েছে। কথাসাহিত্যিকেরা মনে করেন, বিশেষ করে ঔপন্যাসিকেরা মনে করেন, মানুষের action উপন্যাসে লেখা তাঁদের ধর্ম নয়, শুধু সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করে যাওয়াই আর্টের, বিশেষ করে উপন্যাস আর্টের ধর্ম। আর্ট কখনই প্রচার ধর্মী হতে পারে না। এ ধরণের মতবাদ বাঙ্গালা সাহিত্যে থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে জনগণের মনের আকাঙ্ক্ষাকে বাদ দিয়েও কোন সাহিত্যই বড় হয়ে উঠতে পারে না বা চিরায়ত সাহিত্যের খ্যাতি অর্জন করতে পারে না। যেহেতু জনগণই নিপীড়িত শ্রেণী সেই হেতুই সমাজবাস্তববাদী সাহিত্যের মুখ্য কাজ হবে আন্দোলনের বিস্তৃতি, বিন্যাস ও বিশ্লেষণ। তারাশঙ্করের কলমে জনগণের আশাআকাঙ্ক্ষা এসেছে, তিনি সেই আশাআকাঙ্ক্ষাকে মুক্তি দিয়েছেন। তবে সেটা চাপ সরু গলি পথে, সুবিস্তৃত রাজপথে জনগণকে আসতে দেননি। অন্তত 'গণদেবতা'কে দেননি। অথচ খবর বলার ভঙ্গীতে তারাশঙ্কর বললেন, "গিরীশ হাতের-ছাদের মধ্যে কল্কেটি পুরিয়া কয়েক টান দিয়া বলিল—'এদিকে গোলমালও তোমার চরম লেগে গিয়েছে। শুধু আমরা দু'জনা নই, জমিদার কজনার বিচার করবে করুক না। নাপিত-বায়েন-

দাই-চৌকিদার, নদীর ঘাটের মাঝি, মাঠ আগলদার সবাই ধুয়ো ধরেছে ও ধান নিয়ে কাজ আমরা করতে পারব না।

মুখ্যত এটা অর্থনৈতিক আন্দোলন। এককথায় মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন, এই আন্দোলনে (action)এর সুষ্ঠু পরিচয় 'গণদেবতা'তে নেই। কিন্তু ইঙ্গিত আছে। এর পূর্ণ পরিণতির জন্য যে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী তা খুঁজে পাওয়া যায় না। হয়ত তারাশঙ্কর মনের দিক থেকে খানিকটা সংস্কারপন্থী ছিলেন। তাই যখনই জনগণের মধ্যে শ্রেণীচেতনাটা বৈপ্লবিক আকার ধারণ করতে চাচ্ছে তখনই তিনি আর একটা চেতনা দিয়ে তাকে আচ্ছন্ন করতে চাচ্ছেন, এমনি করে মহৎ ও বৃহৎ সম্ভবনাকে তিনি এক কথায় পরিপূর্ণতার পথে নিয়ে যান নি।

তারাশঙ্কর মনের অন্তরালে কোথায় যে একটি গোপন দুর্বলতা 'চৌধুরী মশায়' এর প্রতি রয়েছে তা তিনি নিজেও বোধ হয় জানেন না। চরিত্র চিত্রণের বেলা দেখা যাচ্ছে ওদের মনটাই সঠিক ফুটে ওঠে এবং শ্রেণী অবনমন হয়েছে বলে খুব সূক্ষ্মভাবে একটি সহানুভূতি জাগাবার চেষ্টাও চলে। এখানে একটা কথা খুব জোরের সঙ্গে বলার প্রয়োজন আছে, বাঙ্গালার স্থিতস্বার্থী সমাজের মধ্যে আজ আর কোন বৈপ্লবিক চরিত্র নেই। তিনি যে সময় এই উপন্যাস রচনা করেছেন সে সময়-এর বহু আগে থেকেই সৃষ্টিশীল সমাজশ্রেণী ধ্বংস হয়ে গেছে। কাজেই পতনের বিন্যাস না করে যদি তিনি সাহসিকতার সঙ্গে জাগ্রত জনগণের শ্রেণীস্বার্থ চেতনার বিন্যাস করতেন তবেই সমাজের প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠত। আমরা পরবর্তী আলোচনায় 'দেবুর' চরিত্র বিশ্লেষণের বেলায় এর আর একটা দিক দেখতে পাব।

'গণদেবতা' (৩)

তারাশঙ্কর 'দেবু'র চরিত্রকে সংস্কারে মোড়াই করে সৃষ্টি করেছেন। তুলনায় অনিরুদ্ধ অনেকটা সংস্কারমুক্ত বিপ্লবী ভাবপন্ন। তা না হলে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে অমন করে পূজোর নৈবেদ্য তুলে নেবার সাহস তার হত না। চিরাচরিত সংস্কারের বশে অনিরুদ্ধ একবার নৈবেদ্যখানি দেবতার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছিল বটে। কিন্তু মূক নির্মম দেবতা তার দিকে মুখ ফিরে তাকান নি। ঘটনা পরম্পরায় দেবুর মনের সংস্কারে আঘাত লেগেছে বটে, তবে কোথায় যেন স্থিতাবস্থার প্রতি, সমাজের প্রচলিত তথাকথিত শৃঙ্খলার প্রতি, মনটা স্নেহশীল হয়েছিল। সমাজের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে যাচ্ছে, অথচ তাকে নতুন করে গড়ে তোলার সামর্থ্য তার নেই। যে ঐতিহ্য ভাঙ্গছে তার প্রতি দেবু শ্রদ্ধাশীল, মাঝে-মাঝে শোষণের বিরুদ্ধের তার অন্তর থেকে প্রবল প্রতিবাদও জেগে উঠেছে।

আমরা যাকে চরিত্রের মধ্যে গভীর দ্বন্দ্ব বলি তা দেবুর চরিত্রের খুব প্রবলভাবে 'গণদেবতা'য় প্রকটিত হয়ে উঠেছে। তার পরিচিত বিশ্ব হল গ্রাম, গ্রামের সমাজ পরিবেশ, এই পরিবেশের বিচার বিশ্লেষণের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান চণ্ডীমণ্ডপ। এই চণ্ডীমণ্ডপকে তারাশঙ্কর এক বিশেষ ঐতিহাসিক সত্তা দিয়ে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু তার নিজেরই বর্ণনার মধ্যে চণ্ডীমণ্ডপের ক্রমিক অবনতির কথা এসে গিয়েছে। অথচ এই চণ্ডীমণ্ডপের সমাজ শাসনের অন্তরালে যে সূক্ষ্মভাবে সমাজের নীচু তলার মানুষের জন্য শুধু অপমান, শাসন ও শোষণ ছিল তার পরিপূর্ণ ইঙ্গিত তারাশঙ্করের লেখায় নেই। কোন institution-এর ঐতিহাসিক সত্তাকে বিকাশশীল করে চিত্রিত করতে হলে তার সামাজিক কারণগুলো উল্লেখ করা উচিত। কেননা, সমকালীন সামাজিক

জীবনের সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপ (এখানে institution অর্থে) অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু তারাশঙ্কর যখনই কোন-কিছুর আলোচনা করেছেন তখনই সেই অতীত মুখর হয়ে সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে আত্ম প্রকাশ করেছে, যেন এদেরই গৌরবের কাহিনী প্রচার করার জন্য তারাশঙ্করের কলম ধরা। ফলে সমগ্র রচনার মধ্যে ঐতিহ্য একটি বিপুল আয়তন দুষ্কর্মের বোঝার মত চেপে বসেছে, তার তলায় পড়ে প্রকৃতি মানব মনের বৈপ্লবিক চেতনা বিকাশ লাভ করতে পারেনি। দেবুর চরিত্রের সামাজিক দিকটা পরিস্ফুট করার জন্য বারবার তিনি ভারবাহী অন্ধ অতীতকে টেনে এনেছেন। তার মধ্যে দেবুর অন্তর স্থাপন করে একটি নব্য পিছু-টানের চেতনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন।

দেবু যে পরিবারে মানুষ হয়েছে সে পরিবারের স্বল্প সম্পত্তি থাকলেও, স্থাবর সম্পত্তির ছোট বড় মালিকদের যে মানসিক ঝোঁক তা থেকে সে মুক্ত নয়। তার ঐতিহ্যের দিকে মন-বাড়ানোর ভাবটাই সেই মানসিক ঝোঁকের দিকে পরিচয় দেয়। ছোটখাট জোতের মালিকেরা সব সময়ই বড় জোতদার বা জমিদারের দ্বারা নিপীড়িত হয়। দেবুর বাবাও নিপীডিত হয়েছেন। সেই অপমানকর দুঃখময় স্মৃতি দেবুর মনে বারবার উঁকিঝুঁকি মেরেছে। কিন্তু ব্যথা যতই থাক জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়নি সে, বা সমাজের অভ্যন্তর থেকে অগ্নিশিখা জ্বেলে দিকে-দিকে ছড়িয়ে দেয় নি। তারাশঙ্কর তার চরিত্রগুলিকে সে ধাতুতে গড়তে চাননি। ফলে দেবুর চরিত্র বিপ্লবীর সম্ভাবনা ছাড়িয়ে নিছক প্রতিবাদের চরিত্র হয়েছে। কিন্তু এই প্রতিবাদকে শোষকেরা (এখানে জমিদার অর্থে) কোন দিনই তেমন ভয়-এর চোখে দেখতেন না। তার কারণ রাষ্ট্রের উচ্চতর শাসক গোষ্ঠী এদের সহায় ছিল। আইনও বেশীর ভাগ এদের স্বার্থে রচিত হয়েছিল।

প্রতিবাদ ব্যাপারটা একটা পর্যায় নিতান্তই সভার শোভা বর্ধনের মত। চেঁচামেচি চীৎকার কিন্তু ক্রিয়াশীল বিক্ষোভ নেই। তার ফলে socio-economic objective সমাজ-অর্থনৈতিক কাম্য-বস্তুকে বাস্তব গ্রাহ্য করার মত কোন আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। সমাজ-অর্থনৈতিক কাম্য বস্তুকে বাস্তব গ্রাহ্য সত্যে পরিণত করতে হলে প্রত্যক্ষ বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রয়োজন। এবং সে আন্দোলন শুরু করতে গেলেই নেতৃত্বের, সমাজচেতনা ও বৈপ্লবিক কর্মের অতি নিকট সংযোগ থাকা চাই।

দেবুর প্রত্যক্ষভাবে মর্মান্তিক সমাজচেতনা হল জমিদার খারাপ, জমিদারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন বিক্ষোভ নেই বা আমূল পরিবর্ত্তন চাই—এ সব কিছুই দেবুর চেতনার মধ্যে নেই। কিন্তু এই যে মোটামুটি জমিদার খারাপ—এখানেও তার মন জ্বলে ওঠে না। এই অবস্থাটাকে চরিত্রের স্তিমিত শিখা বলা যেতে পারে। শিখা জ্বলছে বটে, কিন্তু দাউ-দাউ করে জ্বলছে না, এক ব্যবস্থাকে পুড়ে ছারখার করে দিয়ে আর এক ব্যবস্থার নব জন্ম দান করছে না। অতএব তারাশঙ্করের 'গণদেবতা'র দেবু চরিত্রকে অঙ্কুর চরিত্র বলা যেতে পারে, পূর্ণাঙ্গ বিকাশ এই অঙ্কুর জাতীয় চরিত্রর মধ্য দিয়ে সম্ভব নয়। তার কারণ চরিত্র বিশেষ ধরণের আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। দশের মাথার ওপর যার মাথা বৈশিষ্ট্য নিয়ে সর্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় তাকে বৈপ্লবিক মনের একটি পরিচয় রাখতে হবে। সমাজের তালায় যে বিক্ষোভ সঞ্চিত হচ্ছে তারও চিহ্ন তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে পরিস্ফুট হবে। কিন্তু দেবুর চরিত্রে অনেক ক্ষেত্রে সেই চিহ্ন বর্তমান নয়, কেন অনিরুদ্ধ কর্মকার তার স্ত্রীর দেয়া-নৈবেদ্য চণ্ডীমণ্ডপ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, কেন হিন্দু সমাজের ধর্ম সংস্কারে লালিত-পালিত মানুষ চণ্ডীমণ্ডপে এসে পুজো দিতে পারে না; এবং কেনই-বা তার

পূজোর উপচার এককথায় ফিরিয়ে দেওয়া হয় ;—যাদের দ্বারা এই ফিরিয়ে-দেয়া কাজটি সমাধা হয়েছে তাদের দলে 'গণদেবতা'র নায়ক দেবুও আছে। সামজিক বন্ধন তার সেই দলীয়-শক্তির সঙ্গে সুদৃঢ়ভাবে জড়িত বলতে হবে।

চণ্ডীমণ্ডপকে কেন্দ্র করে যে সমাজের শাসন ও শোষণ বহুকাল থেকে চলছিল, তারই মাহাত্ম্য বর্ণনায় তারাশঙ্কর অনেকখানি সময় নিয়েছেন। বহুকাল পরে আবার চণ্ডীমণ্ডপ অলোকজ্জ্বোল হয়ে উঠেছে, এবং গ্রামের মজলিস্ সেখানেই জমে উঠল, অতীতের সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আবার সেই পরম অতীত এলো তার পূর্ব গৌরব ফিরে পেতে। পঞ্চাশ বছর পূর্বেও নিত্য সন্ধ্যায়—চণ্ডীমণ্ডপ জমজমাট হয়ে উঠত। গ্রামের বিচার-ব্যবস্থা এখানে বসেই সমাধা হত। (কোন শ্রেণী বিচার করত এবং কাদের বিচার করত, তার উল্লেখ নেই। সেকালে উচ্চবিত্তের কাছে এতটুকু আত্ম-অধিকার গরীবের পক্ষে যাচ্ঞা করাও অপরাধ বিশেষ ছিল) অর্থাৎ বিচারের প্রহসনটা এখানে বসেই সমাধা হত। সেদিনের বিচারে যেমন অনিরুদ্ধের পূজোর নৈবেদ্য দেবতার কাছে উৎসর্গীকৃত হল না ; যেমন করে পদ্মকে অপমান করে সমাজ শীর্ষের মাতব্বররা (তাদের মধ্যে দেবুও আছে) পূজো সম্পন্ন করতে দিল না, সম্ভবত সেদিনও—অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর পূর্বেও অনিরুদ্ধর মত বহু লোক লাঞ্ছিত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে। কিন্তু আজকের অনিরুদ্ধ যে বিদ্রোহ করেছে তেমন হয়ত কেউ করেনি। আর করে থাকলেও তার ইতিহাস মুছে গেছে। তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে (তারাশঙ্করকে ধন্যবাদ যে অনিরুদ্ধকে বিদ্রোহের শিখার মত জ্বলতে দেবার সুযোগ দিয়েছেন,—এবং এটেই অনিরুদ্ধের আসল চরিত্র) যে দেশে এই সেদিনও গরীব প্রজার খাজনা বাকি পড়লে, তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে কয়েদ করে

রাখা হত, সেদেশে পঞ্চাশ বছর পূর্বে কত বিচিত্র বিভীষিকাপূর্ণ অত্যাচার যে সাধারণ মানুষের জন্য ন্যস্ত ছিল তা সহজেই অনুমেয়। ধূলোয় এবং কালগতিকে অবলুপ্ত প্রায়—বহু চিহ্ন এখনও শিব মন্দিরের দেওয়ালে চণ্ডীমণ্ডপের থামের গায় দেখা যায়। কিন্তু যেটা দেখা যায় না সেটা হচ্ছে অসংখ্য মানুষের চোখের জল, কতলোকের 'বেগার' খাটুনির ওপর ঐ চণ্ডীমণ্ডপের ভিত্তি—একথা পঞ্চাশ বছর পরের লোকেরা জানবে না। তারাশঙ্কর চণ্ডীমণ্ডপের সত্তা সৃষ্টিতে সামাজিক বিভাজনের দিকটাকেই বড় করে দেখিয়েছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা হল এই :

" Social process is directed not by the necessities of the process alone—of which society is as yet not fully conscious—but by the wills of the ruling individuals. Thus the individual will appears as alone active and creative. The aim of all society —man's attempt to become free of the forces of nature—seems in such societies to be realised by passive obedience by the ruled to the will of the ruler, who is guided by his individual desires. This is how it appears to rulers and ruled, but in fact both classes are the outcome of division of labour and derive their roles, not from Will but from their status in social production" pp. 116-117 ,(*Man and Nature*—Further Studies in a Dying Culture—Christopher Caudwell.).

মন্তব্যে যেখানে 'wills of the ruling individuals'. কথাটি উল্লিখিত হয়েছে সেইখানেই চণ্ডীমণ্ডপের প্রকৃত বিচার প্রহসনের বিষয়টি ধরা পড়ে। চণ্ডীমণ্ডপ প্রভৃতিতে কোন

শ্রেণীর বিচারকেরা বিচারকের আসন বসত। আমাদের মনে রাখা উচিত বিচারের আসনে বসতে হলে 'stutus in social production' থাকা একান্ত প্রয়োজন অর্থাৎ বিচারকেরা যে শ্রেণী থেকে আসবে তাদের social production—এখানে বিশেষ অর্থে জোত-জমা বা জমিদারী—সেকালেও বটে, এরই মুনাফার ওপর সামাজিক জীবনের মানদণ্ডের উচ্চতা ও নিচুতা স্থির হত। যদি সমগ্র সমাজব্যবস্থাকে একটি social process বলে ধরা নেয়া যায়—তবে বিচারের (এখানে চণ্ডীমণ্ডপের বিচার অর্থে) প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন সম্ভব হয়। শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে'তে সমাজপতির বিচার ষড়যন্ত্র, 'পল্লীসমাজে'র সামাজিক বিচার—এ দুটো দৃষ্টান্ত থেকে একেবারে যদি দেবদাস ঘোষ ইত্যাদির শ্রেণীর চণ্ডীমণ্ডপের বিচার ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করি, তবে দেখতে পাব শাসক শ্রেণীর ব্যক্তির ইচ্ছাই—সামাজিক বিচারের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। দেবু সাময়িককালের জন্য হলেও সেই শাসক শ্রেণীর সঙ্গে নিজস্ব সত্তা বিলিয়ে দিয়েছে। অবিশ্যি পরবর্তীকালে মানবিকতার ক্ষেত্রে যে সব দৃষ্টান্ত সে স্থাপন করেছে, তার সঙ্গে পূর্ববর্তী কর্মকাণ্ডের বিরোধ রয়েছে। দেবু সে বিরোধকে অতিক্রম করতে পারেনি। একটু স্থির ভাবে চিন্তা করলেই ঘটনাটির অতীব জঘন্য দিক সহজেই ফুটে উঠবে। হিন্দু সমাজের একটি কুলবধূ পুজোর নৈবেদ্য নিয়ে এসেছে চণ্ডীমণ্ডপে পুজো দেবার জন্য। পুজোর নৈবেদ্য গ্রহণ করা হল না, অনিরুদ্ধ অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বিদ্রোহ করেছে—এই কারণে। এখানে ধর্ম ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সমসম মর্যাদা পেয়েছে। অথচ স্মরণাতীত কাল থেকে এই পুজো দেবার অধিকার সবারই রয়েছে।

অনিরুদ্ধ জাত কামার হয়ে চাষের মরশুমে সম্পন্ন চাষীদের হালের সারাই-কাজ করে দেয়নি। কেন করে দেয়নি, চণ্ডীমণ্ডপের

বিচারকরা তার খোঁজ নেয়নি, সুতোর ওদিকটা চিরকালই অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে। শুধু এই ধনতন্ত্রী সমাজের সম্পন্ন চাষীদের মজলিসে বিচার হবে ঐটুকুর যে, জনৈক অনিরুদ্ধ কামার চাষের মরশুমে হালের সারাই-কাজটি সঠিকভাবে করে দেয় নি। বিধায়, চাষী অভিজাতদের (এখানে সম্পন্ন চাষী অর্থে) চাষ-বাস ঠিক মত হল না। অতএব এ সবের মূলে হল সেই বিদ্রোহী অনিরুদ্ধ কামার। তাকে শাস্তি দেবার প্রয়োজন আছে। শাস্তির প্রথম ধাপ হল : কামার কুলবধূর পূজো দেবার মৌলিক অধিকার হরণ করা। এক কথায় সামাজিক অপমান সুতীব্র করে তোলা। এখানে একটু ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে, অন্তত অনিরুদ্ধের ক্ষেত্রে ত বটেই। আমাদের উদ্ধৃত মন্তব্যের যে অংশে উল্লেখ করা আছে " passive obedience by the ruled to the will of the ruler,' এখানে passive obedience নেই। তারাশঙ্কর অনিরুদ্ধকে বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি করে গড়ে তুলেছেন। যদিও অনিরুদ্ধ শাসিত শ্রেণীর লোক, সে রীতিমত বিদ্রোহ করেছে, ঘৃণ্য সামাজিক ভনিতার বিরুদ্ধে। তারাশঙ্করকে এই বিদ্রোহের জন্য ধন্যবাদ। এই পূজোপর্বের থেকে বঞ্চিত করার পর দেবু ঘোষের চরিত্রের মধ্যে অনিরুদ্ধের প্রতি যে মমতা প্রকাশ পেয়েছে তা মানসিক দুঃখবাদের বিলাস মাত্র। সে মমতা সক্রিয় হয়ে ওঠেনি। নদীতে ঢেউ উঠে যেমন মিলিয়ে যায়—এও ঠিক তাই। দেবু ঘোষের শ্রীহরি পালের বিরুদ্ধে মানসিক বিরক্তির চিত্র যতই দেখানো হোক না কেন, ভূসম্পত্তিভোগী শ্রেণীর সমগোত্রীয়দের প্রতি একটি নিগূঢ় মমতা থেকে যায়। তা না হলে একই মজলিসে দেবু ঘোষও শ্রীহরি পাল অনিরুদ্ধের বিচার করে ?

আর সেই দিনই অনিরুদ্ধ সত্যবাদিতার অতি নির্মম চরম

বাণী প্রকাশ করল। যে মজলিস ছিরু মোড়লকে শাসন করতে পারে না, তাকে অনিরুদ্ধ মানে না। তার মানে নিপীড়িত শ্রেণী মানে না, এই না-মানার খেসারৎ হিসেবে প্রথমেই তুবিঘা বাকুড়ির আধা-পাকা ধান উৎসন্নে গেল। তার অর্থ অনিরুদ্ধের ধান সম্পদ কে বা কাহারা কেটে নিয়ে গেল।

চণ্ডীমণ্ডেপের প্রভুত্বের অন্তরালে আরও কিছু ন্যাক্কারজনক ইতিহাস আছে। তারাশঙ্কর অবিশ্যি সে কথা বিবৃত করতে দ্বিধা করেননি। গ্রামে কারুর কুটুম্ব এলে এই চণ্ডীমণ্ডপেই বসানো হত। ক্রিয়া-কর্ম, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ সবই অনুষ্ঠিত হত এখানে। তখনও গাঁয়ে ব্যক্তিগত বৈঠকখানা বা বাহিরের ঘর কারুর ছিল না। সামাজিক ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে তারাশঙ্কর বলেছেন, জগন ডাক্তারের পূর্বপুরুষ জগনের পিতামহই কবিরাজ হয়ে বাইরের ঘর বৈঠকখানার পত্তন করেছিলেন। প্রথমে সে অবিশ্যি চণ্ডীমণ্ডপে বসেই রোগী দেখত। তারপর অবস্থার পরিবর্তনের জন্যই ও বটে, জমিদারের গোমস্তার সঙ্গে কয়েকটা কথান্তরের জন্যও বটে, সমস্ত ব্যবস্থাটা পাল্টে গেল। অর্থাৎ চণ্ডীমণ্ডপের সেই প্রভাবশালী সামাজিক ভূমিকাটা আর থাকল না। শোষণব্যবস্থার রূপান্তর ঘটার জন্যই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দেখা দিল, এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এসে সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ির বৈঠকখানা সৃষ্টি করল। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূলে হঠাৎ কবি-রাজের পেশায় পশারও বলা যেতে পারে, আবার জমিদারী চক্রান্তের ফলও বলা যেতে পারে। কেননা এই সব কারণগুলো বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকে ক্রিয়া করে থাকে। এখানে অবিশ্যি জমিদারের গোমস্তার একটি শোষকের ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এদিকে বৈঠকখানার মজলিসে ভাঙন ধরল। জগন ডাক্তার দাম্ভিক বটে, তবু দেবদাস ঘোষ এত বিরূপতা সত্ত্বেও

তারই বৈঠকখানায় যায়। এবং সে-ই চীৎকার করে খবরের কাগজ পড়ে। এতদিন পরে বিচারের নামে, অর্থাৎ অনিরুদ্ধর বিচারের নামে, চণ্ডীমণ্ডপ আবার হেসে উঠল।

দেবু ভাবছে, এই চণ্ডীমণ্ডপের জীবন্ত দশায় কি-ই না ছিল। চণ্ডীমণ্ডপেই পাঠশালা বসত। এককালে কালী ও শিবের নিত্য পূজোর ব্যবস্থা ছিল। এবং সে পূজক ব্রাহ্মণ ছিল পাঠশালার পণ্ডিত। এই পূজো-পার্বণ সূত্রে কিছু-কিছু অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা হত দেবোত্তর সম্পত্তি দিয়ে। সেকালের ধর্মীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এটি একটি বিশেষ দিক। কিন্তু এই ধর্মাশ্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও শোষকের খপ্পর থেকে রেহাই পায়নি। পূজক ব্রাহ্মণের দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ করারই কথা। কেননা পূজার পরিবর্তে তাকে সম্পত্তি ভোগের অধিকার দেয়া হয়েছে। কিন্তু শোষক শ্রেণীর শোষণের সূক্ষ্ম জাল এমনি ভাবে বিস্তার করা যে তার ফাঁস থেকে কারুর রেহাই নেই। বড়-বড় রাঘব বোয়াল তাতে পড়ে যায়, গ্রামের পাঠশালার নিরীহ পণ্ডিত-মশাই ত নিতান্ত তুচ্ছ জীব। লোক বলে, জমিদারের পূর্ববর্তী এক গোমস্তা দেবোত্তর জমিকে নাম মাত্র খাজনায় বন্দোবস্ত করে, নিজের জোতের সামিল করে নিয়েছে। এমন কৌশলে নিয়েছে যে, তাকে আর ফিরে পাবার কোন উপায় নেই। ধনতন্ত্রী সমাজে এমন লোপাটের কাজ হামেশাই হয়ে থাকে।

রবীন্দ্রনাথও 'কালান্তর' প্রবন্ধে এই চণ্ডীমণ্ডপের বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। গ্রামসর্বস্ব জীবন যাত্রার মুখ্য প্রতিচ্ছবি, এই জীবন যাত্রার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করল গ্রামের কামার অনিরুদ্ধ। চণ্ডীমণ্ডপ আশ্রয়কারী শাসকরা একে ঔদ্ধত্য বলে ধরে নিয়েছে। সে যে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বিদ্রোহ করেছে একথা গ্রামের মাতব্বরেরা কিছুতেই বুঝতে চায় না।

এই বিদ্রোহকে গ্রামের মাতব্বরা সহজ ভাবে গ্রহণ করেনি। গ্রাম সামিলে অনিরুদ্ধর পূজো বন্ধ করেছে। এ সমস্যার হাস্যকর পরিণতি হল এই যে, এত সব করেও অনিরুদ্ধর বিদ্রোহ দমন করা যায় নি। কিন্তু নিষ্ফল আক্রোশে সমস্ত শাসক শ্রেণী যেন ফেটে পড়ছে। কিন্তু এর মধ্যে দেবুর চরিত্রই লক্ষ্য করার মত।

'গণদেবতা'র নায়ক দেবু দেবসেবার অধিকারে আঘাত হানতে প্রস্তুত নয়। অবিশ্যি মনের মধ্যে অনিরুদ্ধর প্রতি একটা মমতাও আছে। সে তার সহপাঠী অতএব কিছু করুণার পাত্র। দেবু ঘোষের এই মমত্ববোধ, এই করুণামিশ্রিত প্রেম কোন বিশেষ আদর্শসঞ্জাত নয়। মানসিক চেতনার অনুসঙ্গ হিসেবে সামাজিক জীবের অভ্যাসের বসে কতগুলো ভাব সমষ্টি মনের ওপর ক্রিয়া করে। এই মমতা ও করুণা সেই ভাব সমষ্টি ক্রিয়ার ফল মাত্র। কেননা, অনিরুদ্ধর ধর্মাচরণের বাধা দেবু ঘোষকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেনি। বরং জোড়াতাড়া দেয়া এক মীমাংসার অনুসন্ধান করেছে, বরং কার্য-কারণ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, যে-অপমান সমাজ অনিরুদ্ধকে করেছে, অনিরুদ্ধর পুণ্যবতী স্ত্রী পদ্মকে করেছে, দেবু ঘোষ তার দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিল। এটা দেবু ঘোষের ব্যক্তিত্বের বড় কলঙ্ক। অথচ এই দেবু ঘোষই একদিন অমনি একটা সামাজিক অপমান বোধে মরিয়া হয়ে প্রতিবাদ করেছে।

'দেবুকে দেখিয়া সাইকেল হইতে নামিয়াই (কানুনগো) সম্ভাষণ করিল "এই! ওরে! এই!"

দেবু এ-জাতীয় সম্ভাষণ শুনে প্রায় ক্ষেপে উঠল, তার শিক্ষিত মনে ঘা লাগল। তার তিক্ত কটু স্মৃতিও সজাগ সচকিত হয়ে উঠল। কিন্তু সরকারী কর্মচারী জেনে করে-চুপ করেছিল।

"এই ইডিয়ট!" (কানুনগোর সম্ভাষণ)

এবার দেবুর অন্তর সত্তা খানিকটা বিরক্তির রূপ ধরে বিকশিত হল। ভ্রূ কুঁচ্‌কে লোকটার দিকে তাকাল। দেবুর মনে তখনও তুষ্ণীভাব, উত্তর দেবে না। কথাগুলোও শুনবে না। অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের সঙ্গে বিরোধের পথটা যাতে স্পষ্ট হয়ে না-ওঠে তার একটা চেষ্টা করবে। কিন্তু তা ত হবার নয়। কেননা, এ ত পরম শক্তিশালী ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র। কানুনগো হঠাৎ এক গ্লাশ জল খেতে চেয়ে দেবুকে অতীব মহৎ আতিথ্যবোধ ও নীতির কাছে দায়বদ্ধ করে ফেলল।

"………কানুনগো বলিল, 'এক গ্লাশ জল আন দেখি। বেশ ঠাণ্ডা জল।' "

দেবুর আজন্ম সংস্কারলব্ধ পুণ্যজ্ঞান হঠাৎ খাড়া তলোয়ারের মত হয়ে উঠল। তৃষ্ণার জল দিতে সে না বলতে পারল না।

গ্রাম্য পাঠশালার দেবু পণ্ডিত তার স্বকীয় মর্যাদা নিয়ে সে যে গ্রামের চৌহদ্দীর মধ্যে প্রিয় সম্মানিত ব্যক্তি ছিল, একথাটা সে কি করে ভুলবে? ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের কাছে সে যে শুধু ছোট, সামান্য ও উপেক্ষার বস্তু তাই নয়, অপমানেরও বস্তু বটে। দেবুর অপমানের জ্বালাটা অতি ধীরে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল। তার সমস্ত সৌজন্যকে পদদলিত করে যখন সেই আমলাতন্ত্র ক্ষুদ্র, রুক্ষ পাষাণ্ড উৎপীড়ক মূর্তি ধারণ করল তখন দেবু ঘোষ অনিরুদ্ধর মতই রুদ্র মূর্তি ধারণ করল। এখানে কানুনগোকে আমরা ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের প্রতিভূ হিসেবে দেখছি। কানুনগো একটা নিছক কানুনগো নয়, একদা বিদেশী সরকারী অত্যাচারের আসল প্রতিমূর্তি। চণ্ডীমণ্ডপের বিচার ব্যবস্থাকেও আমরা একটা ধনতন্ত্রী ব্যবস্থার শ্রেণী বিচারের প্রতিভূ-হিসেবে ধরে নিচ্ছি। এবং অবিচার, শোষণ, উৎপীড়ন অর্থে এদের মধ্যে মৌলিক কোন প্রভেদ নেই। বরং গ্রাম্য পণ্ডিত

দেবুর স্বপক্ষে জনমত ছিল. অনিরুদ্ধর ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। স্ত্রী পদ্ম থানা পুলিশের ভয়-এ অস্থির, অনিরুদ্ধ খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত, কেননা পয়সাওয়ালা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নালিশ করে কোন সুবিচার পাওয়া যায় না। এটা নিপীড়িত শোষিত শ্রেণী বহু দুঃখের পোড় খেয়ে উপলব্ধি করেছে।

"ঠিক এই সময়ে বাহির হইতে ডাক আসিল—'ওরে! এই!'

দেবু আর সহ্য করিতে পারিল না। পানের পাতাটা সেখানেই ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া সে বলিল—'কি বলছিস্?'

তৎকালীন বিটিশ যুগের আমলাতন্ত্রের সঙ্গে দেবুর এই সাক্ষাৎকার নানা দিক থেকে ঐতিহাসিক গুরুত্ব পেয়েছে। প্রথম হল, সে পল্লীজীবনের শিক্ষিত সমাজের মানুষ, তার শিক্ষা-দীক্ষা খুব উঁচু দরের না হলেও গ্রামের দশজন তাকে যে পণ্ডিত মশায় বলে ডাকে তাতে তার মনে একটি পবিত্র ভাব, পরহিতব্রত, সদ্‌চিন্তাজাত সাহস সৃষ্টি হয়েছে।

দ্বিতীয় হল, সেই সদ্‌চিন্তাশীল পরপোকারধর্মী মানুষের মধ্যে আত্মাভিমান না থাকলেও, জাতীয় মর্যাদাবোধ আছে। নব্য মানবতা বোধও বেশ প্রখর বলতে হবে। বিদেশী আমলাতন্ত্রের সংস্পর্শে এসে জাতীয়তা বোধটাই সবার আগে তীব্রভাবে দেখা দেয়। পাঠশালার পণ্ডিত দেবদাস ঘোষ কানুনগোকৃত অপমানে সেই জাতীয় মর্যাদা বোধ নিয়েই তীব্র প্রতিবাদে জবাব দিয়েছিল।

দ্বন্দ্বটি প্রথম থেকেই আমলাতান্ত্রিক শ্রেণীর অত্যাচারের রূপ নিয়েছিল। সেকালের এবং একালেরও বটে, আমলাতন্ত্র সাধারণ মানুষকে এইভাবে অপমান করেই নিজেদের শ্রেণী স্বার্থের গৌরব ও স্বার্থ জাহির করত এবং করে থাকে। এরা মানবিক অমর্যাদা করে সাধারণ মানুষকে কীট পতঙ্গের পর্যায় এনে ফেলেছিল। আবার কীট

পতঙ্গের সামান্যতম আহারের সংস্থানের ওপরও ভাগ বসাত। অর্থাৎ জমি জরীপ বা অন্য কোন কার্যাদি উপলক্ষে এই শ্রেণীর সংস্পর্শে এলেই প্রথমে সেলামী তবে অন্য কাজ, টাকাটা সিকিটা আগে ফ্যালো তবেত অন্য কাজ। এই ব্যবস্থার মধ্যেই সেটেলমেণ্টের বাবুদের জমি জরীপ, ধানের ওপর নিয়ে শিকল টেনেটেনে ফসল নাশ। এও এদেরই কাজ। দেবদাস ঘোষ সামান্য জমির মালিক, সে-ও এই ফলন্ত ধানের ওপর দিয়ে শিকলটানা আমলাতান্ত্রিক সর্বনাশা কারবারের একজন নিরীহ শিকার। কাজেই দেবু ঘোষের মনটা আগেই থেকেই হয়ত খানিকটা তৈরী হয়েছিল। প্রথম ইতরজনিত ব্যবহারের ঘোর কাটিয়ে উঠেই মানবিক মর্যাদা (এখানে জাতীয় মর্যদার রূপ বলা বোধ হয় ভাল। কেননা আমলাতন্ত্রের এই সব ইতরজনিত ব্যবহারের পেছনে সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা পৃষ্ঠপোষকের কাজ করত।) পরিবর্তে দেবুর মনে এনে দিল জাতীয়তাবোধ! এবং দেবু প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল।

“কানুনগো……বলিল ‘আমায় তুই-তুকারি করিস?’

নির্ভয়ে দেবু উত্তর দিল—‘সে তো তুইই আগে করেছিস।’

‘কি নাম তোর?’

দেবু তাহার (কানুনগোর) মুখের দিকে চাহিল, তারপর নির্ভয়েই বলিল—আমার নাম দেবদাস ঘোষ।

এর পরবর্তী যে-সব ঘটনা ঘটেছে এবং তা থেকে যে-সব মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে সে সবই জাতীয় আন্দোলনের ফল। দেবদাস ঘোষকে এই আন্দোলনের নির্ভীক স্পষ্ট বক্তা করে গড়ে তোলা হয়েছে। তার জীবেন পর্যায় ক্রমে যে-সব দুঃখ বন্যার মত নেমে এসেছে তাকে সে (দেবু ঘোষ) প্রবল ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। কারাবাস, পত্নী বিয়োগ, সন্তান বিয়োগ

—এক-একটি ঘটনা দেবুকে গড়ে-পিঠে ইস্পাতের মত ঝকঝকে তকতকে উজ্জ্বল তেজস্বী মানুষ করে তুলেছে। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক শক্তির একটা অংশের সঙ্গে দেবদাস ঘোষের সাক্ষাৎ হয়েছে মাত্র। তাকে সাহসিকতার সঙ্গে সে মোকাবিলা করেছে সত্য। এসব দ্বন্দ্বের ভূমিকায় দেবু চরিত্র বটে, এবং তার চারিত্রিক দৃঢ়তা তারাশঙ্করের কলমে ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। কিন্তু মানবের শোষণ মুক্তির প্রেরণার সঙ্গে যে সাম্রাজ্যবাদের লৌহ চক্রের সংঘাত অনিবার্য তা তিনি বলতে চান নি। অনি (অনিরুদ্ধ) ভাইয়ের খবর কি বৃহত্তর সমাজ, অথবা ধনতন্ত্রী সমাজ ব্যবস্থা রেখেছে ? তাকে শোষণের যাঁতাকলে ফেলে অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে দিয়েছে। সে মানুষটা যে পৃথিবীর সবার ওপরে একটি বৈপ্লবিক চেতনা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং তার সেই বৈপ্লবিক চেতনা সহজাত সিদ্ধির পথ খুঁজে না পেয়ে শ্রেণী অবনমনের প্রশস্ত পথে কোথায় হারিয়ে গেল, বর্তমান সমাজব্যবস্থা তার অনুসন্ধান করবে না। শত সহস্র, লক্ষলক্ষ মানুষের মত তার ঠিকনা আজ কলে কারখানায় পাওয়া যাচ্ছে। এ যুগের মানুষ তাদের ঠিকানা খুঁজতে কলকারখানা চুরেচুরে মরছে, তাদের মধ্যে বৈপ্লবিক যজ্ঞের নতুন প্রেরণায় বীজ বপন করছে।

"এই পর্যন্ত সংবাদ মিলিয়াছে যে, কলে কাজ করিবার জন্য সে কলিকাতা বা বোম্বাই বা দিল্লী বা লাহোর গিয়াছে। অন্তত সে কথাই সে বলিয়া গিয়াছে—কলে কাজ করবত এখানে কেনে করব ? বড় কলে কাজ করব।"

এই সংবাদের অন্তরালে অনিরুদ্ধের জীবন, তার সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, অসীম দুঃখ ভোগ, পদ্মর মত সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি অবহেলা ও ঔদাসীন্য সবই গুপ্ত থেকে গেল। শুধু সবাই জানল, সমাজ কান পেতে নির্বিকার চিত্তে শুনতে পেল অনিরুদ্ধ শ্রেণী অবনমনের পথে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে।

Bibliography

1. The Meaning of Contemporary Realism : *by* Georg Lukacs : Merlin Press. 11 Fitzory Sq. London. W. 1.

2. The Theory of the Novel *by* Georg Lukacs : Merlin Press. 11 Fitzory Sq. London W. 1.

3. Writer and Critic and other Essays *by* Georg Lukacs : Merlin Press. 11 Fitzory Sq. London W. 1.

4. Goethe and His Age *bv* Georg Lukacs : Merlin Press. 11 Fitzory Sq. London W. 1.

5. Meaning in the Visual Arts *by* Erwin Panofsky : Penguin Books Ltd. Harmondsworth, Middesex, England.

6. The Social History of Art-1.
From Prehistoric Times to the Middle Ages. *by* Arnold Hauser : Routledge & Kegan Paul, London.

7. The Social History of Art-3 Rococo, Classicism and Romanticism *by* Arnold Hauser Routledge & Kegan Paul, London.

8. An Introduction to the Study of Literature *by* W. H. Hudson : Kalyani Publishers, 1/1, Rajendra Nagar, Ludhian.

9. Principles of Literary Criticism *by* I. A. Rechards : Routledge & Kegan Paul. London.

10. The Greek Myths vol. one *by* Robert Graves, Penguin Books Ltd. Harmondsworth Middlesex, England.

11. The Naked Society *by* Vance Packard : Penguin Books Ltd. Harmondsworth, Middlesex, England.

12. Psychology : The study of Behaviour *by* Willam McDougall : Oxford University Press.

13. On Literature and Art *by* A. Lunacharsky : Progress Publishers, Moscow.

14. Literature and Reality : *by* Howard Fast. Peoples Publishing House. Delhi.

15. A Review of Soviet Literature *by* Katherine Hunter Blair : Siddhartha Publications (P) Ltd. 35 Netaji Subhas Marg. Delhi-6.

16. Problems of Modern Aesthetics. (collection of articles) Progress Publishers, Moscow.

17. Lenin On Literature and Art : Progress Publishers, Moscow.

18. Dialectical Materialism (vol. 11 Historical Materialism) Maurice Cornforth : National Book Agency Ltd. 12 Bankim Chatterji Street, Cal.